সূচীপত্র

প্রথম পর্ব
রেভ্‌স্ক

দ্বিতীয় পর্ব
আরাবাত স্ট্রিটের উঠোন

তৃতীয় পর্ব

নতুন বন্ধুদের দল

চতুর্থ পর্ব

সতেরো নম্বর দল

পঞ্চম পর্ব

সপ্তম শ্রেণী

ষষ্ঠ পর্ব

পুশকিনের কুটির

প্রথম পর্ব

রেভ্স্ক

১.

সাইকেলের ছেঁড়া টিউব

এখন ভোরের কাঁচা রোদ্দুর। সুনসান রাস্তায় কেউ নেই। সোফা ছেড়ে গায়ে জামাটা গলিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মিশা। কোথায় মোরগ ডাকছে। বাড়ির ভেতর থেকে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছে কেউ। সেটুকুই যা শব্দ এখন।

শীতে কাঁপছিল মিশা, চোখ কুঁচকে উঠছে ঠাণ্ডায়। ইচ্ছে হচ্ছিল আবার গিয়ে গরম বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিন্তু গেঙ্কা যে গুলতি দেখিয়ে সবাইকে একহাত নিচ্ছে মনে পড়তেই চনমন করে উঠল সে। কাঠের মেঝেতে শব্দ করতে করতে সে এগিয়ে গেল গুদামঘরটার দিকে।

ছাদের ঘুলঘুলি দিয়ে আলো এসে পড়েছে গুদামঘরে। মান্ধাতা আমলের একটা সাইকেল রয়েছে দেয়ালে দাঁড় করানো। চেইনে মরচে, স্পোকগুলো ভাঙা, টায়ার-দুটো লেপটে আছে মাটিতে। আর ঠিক ওপরেই দেয়ালে ঝুলছে ফাটা একটা রবারের টিউব, যেটাতে একশো তালি মারা রয়েছে। টিউবটাকে নীচে নামিয়ে পছন্দমতন পাতলা একটা ফালি কেটে নিল মিশা। কাটা দিকটা দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে টিউবটা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখল সে। কেউ দেখতে পাবে না।

গুদামঘরের দরজাটা খুলতে যাবে এমন সময় চোখে পড়ল পলেভয় খালি পায়ে উস্কোখুস্কো চুলে মাঝপথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দরজা খোলা হল না মিশার। দরজা ভেজিয়ে একটা ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল পলেভয় কী করে। পলেভয় উঠোনে ঢুকে একটা অযত্নে পড়ে থাকা কুকুরের ঘরের সামনে দাঁড়াল। তারপর এদিকে ওদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল পাছে কেউ দেখে ফেলে।

মিশা ভাবছিল, এত্তো সকালে ঘুম থেকে উঠেছেই বা কেন পলেভয়? পাড়ার সকলে ওকে 'কমরেড কমিসার' বলে ডাকে। একসময়ে জাহাজে কাজ করত। শক্তপোক্ত চেহারা, কটা চুল, হাসি হাসি মুখ, চোখে বুদ্ধির ছাপ। চওড়া পাতলুন কুর্তা পড়ে থাকে। কোমরে রিভলভার গোঁজা থাকে সবসময়। জামায় তামাকের গন্ধ। ওদের বাড়িতে পলেভয় থাকে বলেই পাড়ার, বেপাড়ার ছেলেরা সবাই ওকে বেশ হিংসেই করে।

মিশা মুশকিলে পড়ে গেল। রাস্তা আগলে রয়েছে পলেভয়, বেরুবে কী করে! উঠোনে রাখা কাঠের একটা গুঁড়িতে বসে পড়েছে পলেভয়। আর একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে হঠাৎ কুকুরের বাক্সটার নীচে হাত ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল আঁতিপাতি করে। পেল কী পেল না কে জানে। হঠাৎই আবার উঠে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। ঘরের দরজায় খর খর আওয়াজ হল। বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্য চৌকিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হল, তারপর আবার সুনসান, যে কে সেই।

মিশার ইচ্ছে গুলতিটা এক্ষুনি বানিয়ে ফেলবে। কিন্তু চুম্বকের মতন কুকুরের বাক্সটা ওকে টানছে। এগিয়েও গেল ওটার দিকে। তারপর আবার থেমে ভাবতে লাগল, দেখবে না কী! কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে। ভাবল নাঃ, এতটা কৌতূহল ভাল না। ভাবল বটে কিন্তু ততক্ষণে হাত চলে গেছে বাক্সটার নীচে। না কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না তো। শুধু মাটি, শ্যাওলা ধরা স্যাঁৎস্যাঁতে কাঠের টুকরো। না, কিছু হাতে ঠেকলেও দেখবে না সে। শুধু জানতে চায় পলেভয় কী খুঁজছিল। নাড়াচাড়া করতে করতে হাতে যেন কী একটা ঠেকল। তা থাকুক, বের করবে না সে। ভাবতে ভাবতে, এদিকে ওদিকে তাকাতে

তাকাতেই পুঁটলিটায় মারল এক টান। পুঁটলিটা হাতের মধ্যে উঠে এল মিশার। মাটি ঝেড়ে দেখে, ওরে বাবা, রোদ্দুর লেগে ঝকমক করছে একটা ছোরা, হাতলটা ইস্পাতের। আরে এরকম ছোরা তো জাহাজিরা কাছে রাখে। ওটার তিনটি দিকই ধারালো। খাপটা নেই। ইস্পাতের বাঁটটা একটু হলদেটে হয়েছে। বাঁটে একটা সাপ, ব্রোঞ্জের, লকলক করছে মুখটা, তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকেই। সাধারণ একটা জাহাজি ছোরা। এটা লুকিয়ে রাখার কী হল কে জানে। যাকগে সে যাই হোক। ভাল করে আর একবার দেখে নিয়ে মিশা ওটা আবার যেমনটি ছিল তেমনটি বেঁধে বাক্সর নীচে মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে দিল। তারপর বাইরে সদর দরজার দিকে এগোল ধীরে সুস্থে।

অন্য বাড়িগুলোর সদর দরজা খুলতে শুরু করেছে হাট হাট করে। দরজা দিয়ে লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল গরুর পাল, সার বেঁধে চলতে শুরু করল রাস্তা দিয়ে। একটা ছেলে, গোড়ালি পর্যন্ত নামানো তস্য পুরনো একটা কোট গায়ে দিয়ে গরুগুলোকে চাবুক হাতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, হুম হাম করতে করতে। ছেলেটার মাথায় ভেড়ার লোমের টুপি। মাটিতে পড়তে চাবুকের ছিলাটা সাপের মতন দাগ কেটে চলল রাস্তা ধরে।

বাইরের রকে বসে গুলতি বানাতে আরম্ভ করল মিশা। মাথায় কিন্তু একটা চিন্তা লেগেই রয়েছে, ছোরাটার চিন্তা, হাতলে আঁকা ব্রোঞ্জের সাপটার কথা। পলেভয় ওটা লুকোতেই বা গেল কেন। গুলতিটা বানানো শেষ হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একবার। গেঙ্কার গুলতিটার চাইতে বেশি ভাল হয়েছে তো বটেই। আচ্ছা দেখা যাক ভেবে একটুকরো পাথর নিয়ে ছুঁড়ল রাস্তায় ঝাঁক বেঁধে বসে থাকা চড়ুইগুলোর দিকে। তাকটা ফসকে গেল। চড়ুইগুলো উড়ে গিয়ে বসল পাশের চালাটার ছাদে। আর একবার মারতে যাবে এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে পায়ের শব্দ পেল মিশা। চুল্লির ঢাকনাটা খুলল কেউ। জলের টবে জল পড়তে শুরু করল ছপ ছপ করে। জামার নীচে গুলতিটা গুঁজে ভাল ছেলের মতন বাড়ির ভেতরে রান্নাঘরের দিকে চলল মিশা।

দিদিমা উঠে পড়েছেন। বেঞ্চি জোড়া চেরির ঝুড়িগুলো টেনে সরাচ্ছেন একপাশে। তেল চিটচিটে অ্যাপ্রন পড়েছেন একটা। অ্যাপ্রনের পকেট ঝুলে পড়েছে চাবির গোছায়। গোলগাল ফোলা ফোলা মুখ। কপালে ভাঁজ। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। ছোট ছোট ট্যারা চোখের দৃষ্টি কম তাই পিট পিট করছেন।

মিশা একটা ঝুড়িতে হাত দিতে না দিতেই দিদিমা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'অ্যাই, হাত সরা। আস্পদ্দা কম না তো। নোংরা হাতে ছুচ্ছে দেখ।'

'কী কিপটে রে বাবা। খেতেই তো নিচ্ছিলাম দুএকটা, না কি?'

'যা তো, আগে হাত মুখ ধুয়ে নে, তারপর পাবি।'

ছুটে চৌবাচ্চার কাছে চলে যায় মিশা। একটু জল হাতে ছুঁল কী ছুঁল না,

জলে ভেজা হাতে তেলোয় নাকটা একটু ঘষে নিয়েই ফের ঢুকল খাবার ঘরে। খাবার ঘরে ফুলকাটা বাদামি অয়েলক্লথ পাতা লম্বা টেবিলটার একপাশে তার বাঁধা জায়গায় বসে আছেন দাদামশাই। ধপধপে সাদা চুল, লাল গোঁফ, হালকা দাড়ি। এক্ষুনি একটিপ নস্যি নিয়ে হাঁচছেন। হলদেটে একটা রুমালে নাক ঝাড়ছেন। দাদামশাইয়ের চোখ সবসময়ই ঝলমলে, হাসি লেগেই আছে মুখ জুড়ে সবসময়, ঝকমক করছে চোখ। সারাক্ষণ একটা মিষ্টি গন্ধ দাদামশাইয়ের শরীরে, একেবারে নিজস্ব সেই গন্ধ।

টেবিলে সকালের খাবার এখনও আসেনি। অয়েলক্লথের ওপরের একটা ফুলছাপের ঠিক মাঝখানটায় টেনে আনল মিশা ওর প্লেটটা। তারপর একটা কাঁটা দিয়ে প্লেটের চারপাশে গোল করে একটা বৃত্ত আঁকল। দাগ পড়ল অয়েলক্লথে। পলেভয় হই হই করে ঢুকল খাবার ঘরে, বলল, 'শুভদিন মিখাইল গ্রেগোরিয়েভিচ মশাই।' মিশা উত্তর দেয় — 'শুভদিন সের্গেই ইভানোভিচ'। মিশা জানে পলেভয় ভাবতেই পারবে না যে ছোরার খবরটা মিশা জেনে গেছে।

দিদিমা সামোভার নিয়ে ঘরে ঢোকার সময় মিশা কনুই দিয়ে ঢেকে রাখে অয়েলক্লথের ওপরে আঁচড়ের দাগটা। দাদামশাই জিজ্ঞাসা করেন, 'সোনিয়া কোথায়'? দিদিমা জবাব দেন — 'গুদামঘরে। বাইসাইকেলটা নাকি সারাবেন তিনি। আর সময় পেল না সারাবার।'

এই রে। দিদিমার কথা শুনে আঁতকে ওঠে মিশা। কনুই উঠে টেবিলের দাগটা যে দেখা যাচ্ছে খেয়ালই নেই আর। বাইক সারাতে গেছে মানেই মিশার কৃতকর্মটি ধরে ফেলবে। তাহলেই গেছি ভাবল মিশা। আশ্চর্য, গরমকালটা ধরে বাইকটা পড়ে আছে যেমন কে সেই, আর আজই কিনা সারানোর দরকার পড়ল মামার। দিদিমার কাছে দোষ করার একটা মানে হয়। বড়জোর বকুনি, ওটা গা সওয়া। কিন্তু সোনিয়ামামা — তিনি তো সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে লম্বা বক্তৃতা শোনাবেন। কথা বলার সময় হরদম চশমা খুলবেন পরবেন, কোটের গিলটি করা বোতামগুলো টানবেন খুলবেন, তার সব কথা ঠায় দাঁড়িয়ে শুনতে হবে। কেন যে স্কুলের জামাটা এখনও পরেন কে জানে। কবে স্কুল থেকে 'গোলমাল বাধানোর' দায়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে কে জানে। শান্ত শিষ্ট মানুষটা কী আর এমন গোলমাল করতে পারে মিশার মাথাতেই ঢোকে না। খাওয়ার সময়েও সোনিয়ামামা বই পড়েন। ভাবতে না ভাবতেই গুদামঘরে সাইকেল নাড়াচাড়া করার ঝনঝনানি শোনা যায়। একটু পরেই সোনিয়ামামা সেই ছেঁড়া টিউবটা হাতে করে খাওয়ার ঘরের দরজায় হাজির। মিশা সেটা দেখামাত্র চেয়ার ছেড়ে ভোঁ ভাঁ দৌড়, একছুটে বাড়ির বাইরে।

২.

বেপাড়ার ছেলেরা

দুটো পাড়া — এক মিশা যেখানে থাকে আলেক্সেয়েভস্কায়া পাড়া আর অন্যটা পাশের অগরোদনায়া পাড়া। দুটোর দূরত্ব একশো গজও না। কিন্তু তাহলে কী হবে, দুপাড়ার রেষারেষি কম না। মিশাকে দেখতে পেয়েই হই হই করে ছুটে এল ওরা চারদিক থেকে। পেয়েছে একটা বেপাড়ার মুরগি, আচ্ছাসে পেটান যাবে, তারপর আবার মস্কোওয়ালা, সোনায় সোহাগা। মিশাও একলাফে বেড়ার ওপরে উঠে বসে, তারপর ভ্যাংচাতে থাকে, 'কী রে হতচ্ছাড়ার দল, ধরতে পারলি, সবজি বাগানের কাকতাড়ুয়া সব।' অপমানকর কথায় গা জ্বলে গেল ওদের। দমাদম ঢিল পড়তে লাগল ওর দিকে তাক করে। মিশা দেরি না করে ঝুপ করে অন্যদিকে নেমে পড়ল বটে কিন্তু ততক্ষণে একটা ঢিল লেগে কপালটা ফুলে ঢোল হয়ে গেল। বৃষ্টির মতন ঢিল পড়ছে ওর দিকে, পড়ছে আসলে ওদের বাড়ির উঠানে। শব্দ শুনে দিদিমা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন, দেখে শুনে ডাকেন কাউকে বাড়ির ভেতর থেকে। সোনিয়ামামাকে নিশ্চয়। মিশার এখন দুদিকেই শমন।

অগত্যা মিশা চেঁচিয়ে বেপাড়ার ছেলেদের বলল, 'আরে, থাম একটু। শোন না একটা কথা বলি।'

বেড়ার ওপাশ থেকে ওরা বলে, 'আবার কী কথা বলবি?'

— 'আগে ঢিল ছোঁড়া থামা, তারপর বলব।' বলে আবার বেড়ার ওপরে উঠে বসল মিশা।

— 'দল বেঁধে একজনের পিছনে লেগেছিস, সেটা কি কোনও কাজের কথা হল। একজন করে আয়, লড়াই করি, দেখি কে জেতে?'

— 'ঠিক আছে। তাই হবে' — বলে পেৎকা জামার আস্তিন গোটায়। বড়সড় চেহারা, লোকে মোরগ বলে ডাকে, বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা।

মিশাও রাজি হয়। কিন্তু সাবধান করে দিতে ভোলে না যে ওদের সঙ্গে যখন লড়াই হবে তখন তৃতীয় কেউ যেন আবার বিরক্ত না করে। এরপর মিশা 'তাহলে নেমে আয়' বলতেই বেড়ার ওপর থেকে ঝুপ করে নেমে আসে। সবাই গোল হয়ে ঘিরে ধরে ওদের। মুখোমুখি দাঁড়ায় ওরা দুজন। পেৎকা ওর চাইতে দ্বিগুণ লম্বা। মিশা দেখল পেৎকার পরনে লোহার বকলস দেওয়া কোট। মিশা তাতে আপত্তি জানায়, 'এটা কী? লড়াইয়ের পোষাকে লোহা থাকার নিয়ম নেই।' অগত্যা পেৎকা বেল্টটা খুলে ফেলতেই ঢলঢলে প্যান্টটা নেমে যায় আর কী। বাঁহাতে প্যান্টটা আটকে পেৎকা কারও কাছে দড়ি আছে কিনা খোঁজ

করতে থাকে। মিশা গোল হয়ে দাঁড়ান ছেলেদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে লড়াইয়ের বৃত্তটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। — 'এই সর একটু, লড়াইয়ের জায়গা করে দে।' বলতে বলতে একটা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ভোঁ দৌড়। ছেলেরাও হই হই করতে করতে ওর পিছু নিল। বাঁহাতে পড়ে যেতে থাকা প্যান্টটা আটকে ধরে পেৎকাও ছুটল ওদের পেছন পেছন। প্রাণপণ দৌড়ে মিশা ওদের গলিতে ঢুকে পড়তেই পাড়ার ছেলেরা ছুটে এল ওকে উদ্ধার করতে। কিন্তু ততক্ষণে বেপাড়ার ছেলেরা পিঠটান দেয়।

বন্ধুরা মিশাকে ঘিরে দাঁড়ায়। লাল চুল গেঙ্কা বলে, 'কী হয়েছে রে মিশা। এলি কোত্থেকে?' মিশা দাঁড়িয়ে একটু দম নেয়। তারপর হাওয়ায় হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'অগরোদনায়া পাড়া থেকে। মোরগের সঙ্গে একহাত লড়াই করে জিতছি তখন সবাই একসঙ্গে ঝাঁপাল আমার ওপর।'

গেঙ্কা অবাক হয়ে সন্দেহের চোখে বলল, 'সে কি রে মোরগের সঙ্গে লড়াই করে জিতলি তুই।'

'হ্যাঁ জিতলাম, কিন্তু ছোকরার গায়ে জোর খুব। দেখ না কপালটা ফুলিয়ে দিয়েছে কেমন।' বলে কপালে হাত বোলাল মিশা। সবাই দেখতে থাকে হিরোর কপালের কালশিটে পড়া জায়গাটা। মিশা আরও বলে, 'তবে আমিও দিয়েছি কয়েক ঘা, ভুলতে সময় নেবে। তাছাড়া ওর গুলতিটাও কেড়ে নিয়েছি দেখ।' বলে জামার ভেতরে গুঁজে রাখা সকালের গুলতিটা বের করল মিশা। চোখের সামনে সেটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'তোরটার চাইতে কয়েক গুণ ভাল বুঝলি গেঙ্কা।' তারপর ঠাট্টা করে আবার বলে, 'আর তোরা, তোরা এখানে লুকোচুরি আর চোর চোর খেলে যাচ্ছিস অ্যা। বাঘ দেখে কে ভয় পেয়েছে — বাঘ দেখে কে ভয় পেয়েছে — যত্ত সব।'

কপালে এসে পড়া লাল চুলগুলো এক ঝাঁকিতে পেছনে নিয়ে গেঙ্কা বলে ওঠে, 'কী সব বলছিস — আয় চাকু খেলি', রাগে লাল হয়েছে ওর মুখ।

'ঠিক আছে', মিশা বলে, 'তবে আঙুলে পাঁচটা টোকা দিয়ে, থুতু দিয়ে ভিজিয়ে অবশ্যই।'

'বেশ তাই সই।'

একটা পেন্সিল কাটা ছুরি মারতে হবে মাটিতে। সোজাসুজিভাবে, হাতের তালু দিয়ে, দূর থেকে, কাঁধের ওপর দিয়ে, নানারকমভাবে মারতে হবে ছুরিটা। দুজনেই মার শুরু করল। কিন্তু প্রথম দান শেষ করল মিশা। অগত্যা গেঙ্কাকে হাত বাড়িয়ে দিতে হল মিশার দিকে। মিশা প্রথমে টোকা দিল না, পাঁয়তারা কষছে সে। গেঙ্কার অসহ্য মনে হচ্ছে অপেক্ষা করার সময়টা। মিশা মারতে গিয়েও হাতটা নামিয়ে নিল, বলল, থুতু শুকিয়ে গেছে। তারপর আঙুল থুতু দিয়ে ভিজিয়ে টোকা দিতে লাগল একটার পর একটা। প্রত্যেকবারই থুতু দিয়ে

আঙুল ভিজিয়ে নিচ্ছে। শেষমেষ পাঁচটা ঢোকা শেষ করল মিশা। গেঙ্কার হাত নীল হয়ে গেছে, চোখ ফেটে জল পড়ে আর কী। চেষ্টা করে চোখের জল চেপে রাখল সে।

সূর্য যত উপরে উঠছে, ছায়া তত ছোট হচ্ছে। ছায়াগুলো যেন বেড়ার গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে। গরম বাড়ছে, রাস্তাঘাটে কেউ নেই, সুনসান। গুমোটে দম আটকে আসছে। তখন সবাই ঠিক করল জলে নেমে সাঁতার কাটা যাক। যেমন ভাবা তেমন কাজ, সবাই দুদ্দার ছুটল নদীর দিকে।

নদীর দিকে রাস্তাটা সরু, চাকার দাগ বসে গেছে কোথাও কোথাও। আল বাঁধা চারচৌকো জমিতে সবুজ রং, হলুদ রং। কখনও জমিগুলো নেমে গেছে নীচে, কখনও পাহাড়ের মতন উঠে গেছে উঁচুতে, তারপর ধনুকের মতন চওড়া বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে দূরে। সেই বাঁকে ঘন বনজঙ্গল, অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে ছড়ানো ছিটোন গোলাঘর, আকাশে থমথমে মেঘ। জমিতে গমের গাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ওরা গম ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবোতে থাকে, ছিবড়েগুলো থু থু করে ছিটোয়। ওদের সাড়া পেয়ে পাখির ঝাঁক খর খর করে উড়ে যায়, ওদের হাত পা ছুঁয়েই উড়ে যায় পাখিগুলো।

নদীতে পৌঁছে ওরা বালি আছে এমন একটা জায়গা বেছে নিল। জামাকাপড় খুলে যে যার ঝাঁপাল নদীর জলে। ফোয়ারার মতন জল ছলকে ওঠে। নড়বড়ে একটা কাঠের পোল থেকে ওরা ডাইভ দেয়। সাঁতার কাটে, জলের মধ্যে কুস্তি লড়ে। তারপর ক্লান্ত হয়ে পাড়ে এসে গরম বালিতে গা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে।

গেঙ্কা জিজ্ঞাসা করে, 'মিশা, তোদের মস্কোতে নদী আছে?'

— 'কতবার যে তোকে বললাম। হ্যাঁ, আছেই তো, মস্কো নদী।'

— 'শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে বলছিস।'

— 'হ্যাঁ।'

— 'তাহলে সাঁতার কাটিস কেমন করে?'

— 'জাঙ্গিয়া পড়ে, সব খুলে নদীর কাছে যেতে পারবি না। মিলিশিয়ারা কড়া নজর রাখে।'

গেঙ্কা বিশ্বাস করল না ওর কথা। মুখ বেঁকাল। মিশা গেল চটে।

— 'মুখ বেঁকাচ্ছিস কেন রে হাঁদারাম। রেভস্ক ছাড়া কিছুই তো দেখিসনি। তবে হাসছিস কেন রে তুই!'

দুজনেই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। দেখা গেল নদীর দিক থেকে একপাল ঘোড়া এগিয়ে আসছে। মিশা আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বলত, কোন ঘোড়া সবচেয়ে ছোট?'

গেঙ্কার চটপট জবাব, 'কেন ঘোড়ার বাচ্চা।'

— 'আজ্ঞে না।' মিশা বলল, 'সবচেয়ে ছোট্ট ঘোড়াকে বলে টাট্টু।

শেটল্যান্ডের টাট্টুগুলো কুকুরের মতন ছোট ছোট দেখতে। আর জাপানের গুলো এত ছোট যে প্রায় বিড়ালই বলা যায়।'

— 'দূর, গুল মারছিস।'

— 'আমি? সার্কাসে তো যাসনি কখনও, গেলে নিজেই দেখতে পেতিস। গেছিস কোনওদিন সার্কাসে? যাসনি তো, তবে, জানিস না তবু তর্ক করছিস কেন।'

গেঙ্কা মনে মনে কী ভেবে নিল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তোর কথামত টাট্টুগুলো যদি অত ছোটই হয়, তাহলে তো কোনও কাজেই লাগে না, না ঘোড়সওয়ারির কাজে, না সেপাইদের কাজে।'

— 'ঘোড়সওয়ারদের কী কাজে লাগবে ওদের! শুধু ঘোড়ায় চড়েই সবাই যুদ্ধ করে না কি। একজন নাবিক তিনজন ঘোড়সওয়ারের সমান সেটা জানিস।'

গেঙ্কা আপত্তি জানায়, 'আরে নাবিকদের কথা কে তুলছে। তাছাড়া ঘোড়া ছাড়া যুদ্ধ হয় না কি? নিকিৎস্কির গোটা দলটাই তো ঘোড়ায় চড়ে আসে।'

মিশা দমে না। বলে, 'হলই বা তাই, তাতে কী। ওই এক পলেভয়ই ওই নিকিৎস্কিটাকে গ্রেপ্তার করবে দেখে নিস।'

গেঙ্কাও দমবার পাত্র নয়, বলে, 'অত সোজা নয় বুঝলি। এক বছর ধরে তো কতই চেষ্টা করছে। পারছে ওকে ধরতে?'

মিশা আশ্বাস দেয়, 'ও ঠিক পারবে খুব শিগগিরই, দেখে নিস।'

গেঙ্কার বিশ্বাস হয় না, বলে, 'অত সোজা নয়। রোজই ট্রেন ওড়াচ্ছে এখানে ওখানে। বাবাও ট্রেন চালাতে ভয় পাচ্ছে এখন।'

— 'ও ঠিক ধরা পড়বে একদিন, ঘাবড়াস না।'

মিশার ঘুম পাচ্ছিল। নিজেকে গরম বালির মধ্যে আরও একটু ঢুকিয়ে নিল। ঝিম মারল চোখ বুঁজে। গেঙ্কাও ঝিমোতে লাগল। যা গরম পড়েছে না, ঝগড়া করতেও ভাল লাগছে না একটুও। ঝাপসা চোখে ওরা দেখতে থাকে সবুজ আর হলুদ স্তেপভূমির বিস্তীর্ণ মাঠ ক্রমশ সরে সরে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। বোধহয় কাঠফাটা রোদের উত্তাপ থেকে নিজেদের বিছিয়ে নিতে চাইছে সুশীতল আকাশের বিশাল পটভূমি, আর তার ছায়ার নিবিড়তার মধ্যে।

৩.

ঘটনা আর কল্পনায় উধাও

গেঙ্কা বাড়ি চলে গেল খেতে। মিশা ছুটল উক্রেনি বাজারের হই হট্টগোলের মধ্যে। বাজারের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল সে। বাজারে ঠেলা গাড়ির ওপরে সাজান রয়েছে শশা, লাল টমাটো আর বেতের ঝুড়ি ভর্তি

চেরিফল। এককোণে বাচ্চা গোলাপি শুয়োরগুলো চিৎকার করেই যাচ্ছে; গাদা করে রাখা রাজহাঁসগুলো ডানা ঝাপটিয়ে চলেছে অবিশ্রাম; ছোট ছোট বলদগুলোর কাজ নেই, কেবল জাবর কেটে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, মুখ থেকে চটচটে লালা গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। মিশা সব দেখছে, সব শুনছে মনোযোগ দিয়ে। ওর মনে পড়ছিল মস্কোর টক রুটির কথা, আলুর খোসার বদলে পাওয়া জোলো দুধের কথা। মস্কোর জন্য ওর মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ে যাচ্ছিল মস্কোর রাস্তায় চলা ট্রামগাড়ির কথা। সন্ধে হলেই টুক টুক করে বাতি জ্বলে উঠছে, আর তার আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে।

পঙ্গু একজন একধারে বসে পুঁতির মালা গাঁথছিল। লাল, সাদা আর কালো তিনটি পুঁতি নিয়ে তার খেলা। সামনে এসে দাঁড়াল মিশা। দস্তানা দিয়ে ঢেকে রাখা পুঁতিগুলো যে ঠিক মতন বলতে পারবে তারই জিত। কিন্তু ঠিক রংটা কেউ বলতেই পারছে না। পঙ্গু লোকটা কথায় খুব দড়, সে বলছে, 'আরে, তোমরা সবাই যদি বাজি জিতে যাও, তাহলে তো আমার বাকি পাটাও বেচে দিতে হবে, তা না কি?' মিশা পুঁতিগুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ওর কাঁধে ভারী একখানা হাত পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখে দিদিমা স্বয়ং।

— 'কোথায় ছিলি তুই সারাদিন?'

— 'সাঁতার কাটছিলাম নদীতে' — বিড়বিড় করে উত্তর দেয় মিশা।'

— 'সাঁতার কাটছিলাম নদীতে! ঠিক আছে, চল এখন বাড়িতে, তখন দেখা যাবে।'

দিদিমা বাজারের থলিটা ওর হাতে দিলেন। তারপর দুজনেই বাড়ির দিকে পা চালাল। দিদিমার গায়ে রান্নাঘরের সবরকমের গন্ধ। মিশা ভাবছে, 'বাড়িতে গেলে কী করবে আমাকে নিয়ে, কে জানে।' দিদিমার সঙ্গে সোনিয়ামামা বিপক্ষে আর ওর পক্ষে শুধু দাদামশায় আর পলেভয়। দাদামশায় যদি ঘুমিয়ে থাকেন আর পলেভয় যদি বাইরে গিয়ে থাকে, তাহলেই তো হয়ে গেল, ওর পক্ষে কথা বলার কেউ থাকবেই না। সোনিয়ামামা আর দিদিমা দুজনে মিলে পালা করে একজনের পরে আর একজন জিরিয়ে নিয়ে ওকে বকে যাবে। ওদের বকাঝকা করার ভাষা একইরকম : ভদ্রতা জ্ঞান নেই, কোনও কাজের যোগ্য নয়, মায়ের জীবন অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে, এতদিন মেরে ফেলতে পারেনি মাকে, খুব শিগগিরই সে কাজটা সারতে পারবে (অথচ মা এখন মস্কোয়, আর দুমাসের ওপর হল তাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই সব্বাই জানে), মিশা বেঁচে আছে কী করে সেটাই আশ্চর্য — ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দিদিমার সঙ্গে গুটি গুটি বাড়িতে ফিরল মিশা, বাজারের থলেটা নামিয়ে রাখল রান্নাঘরে, তারপর মাথা নীচু করে ঢুকল খাওয়ার ঘরে।

সোনিয়ামামার সঙ্গে গল্পে মশগুল দাদামশাই, জানলার ধারে বসে সিগারেট ফুঁকছেন। মিশার দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাল না কেউ, যেন সেটুকুও নষ্ট করার সময় ওদের নেই। ভালই হয়েছে, সোনিয়ামামা তার বক্তৃতা শুরু করতে করতে পলেভয় এসে পৌঁছে যাবে। মিশা একটা চেয়ারে বসে ওদের কথা শুনতে লাগল। সোনিয়ামামার কথা মানেই আতঙ্ক ছড়ানো, কে এক মাখনো ডাকাত বেশ কয়েকটা শহর দখল করে ফেলেছে, আর এক ডাকাত আন্তোনভ একেবারে তামবভ শহর দখল করল বলে। খবরগুলো সত্যি কি না মিশা জানে না। আবার সত্যি যদি হয়ও, তাহলেও ভয় পাওয়ার কী হল কে জানে। গতবছরও তো শ্বেতরক্ষীদের দল দনবাস এলাকায় ঢুকে কিয়েভ দখল করে ভরাঙ্গেলে ঢুকে পড়েছিল। সোনিয়ামামা তখনও ভয় দেখাতে ছাড়েনি। কিন্তু কী হল। লাল ফৌজ তো ওদের ভেঙে গুঁড়ো করে দিল। আরও কত শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদের নাম সে শুনেছিল — দেনিকিন, কলচাক, ইয়ুদেনিচ সবাই তো লাল ফৌজের দাপটে খতম হয়ে গেছে। ওরাও যাবে। এরপর সোনিয়ামামা নিকিৎস্কির কথা বলল। সোনিয়ামামার ভাষায় নিকিৎস্কিকে ঠিক ডাকাত বলা যায় না। সে নাকি লেখাপড়া জানা মানুষ, একটা সময় নৌ ফৌজের অফিসারও ছিল না কি। সোনিয়ামামা বলে কী — নিকিৎস্কি ডাকাত নয়! গা জ্বালা করে মিশার। যে ব্যাটা গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে কমিউনিস্টদের, কমসমোলের সদস্যদের, নিরীহ চাষী মজুরদের নির্বিচারে খুন করে যাচ্ছে, সে ডাকাত নয় তো কী! সোনিয়ামামার কথা শুনে গা জ্বালা করে ওঠে। ভারী বিরক্ত হয়। এরই মধ্যে পলেভয় এসে হাজির। মিশা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক শাস্তিটা ওর পেছিয়ে গেল অন্তত একদিন।

পলেভয় জামা জুতো ছেড়ে আসলেই সবাই খেতে বসে যায়। দিলখোলা পলেভয়ের হাসিতে বাড়ি গমগম করে ওঠে। পলেভয় আবার দাদামশায়কে বাবা আর দিদিমাকে মা বলে ডাকে। মিশাকে ডাকে মিখাইল গ্রেগোরিয়েভিচ বলে। খাওয়া শেষ করে ওরা বাড়ির দরজায় গিয়ে সিঁড়িতে বসে পড়ল। সেখানে আর এক চোট আড্ডা হবে। একটু ঠাণ্ডার আমেজ আসে সন্ধ্যা হলেই। দূরে কোথায় কয়েকটি মেয়ে গান গাইছে। একটা দুটো গানের কলি শোনা যাচ্ছে। সবজির বাগান জুড়ে কুকুরের ডাক থামছেই না কেন কে জানে।

পাইপ ধরিয়ে আমেজ করে পলেভয় গল্প শুরু করে। দেশের বিদেশের ভ্রমণের গল্প, জাহাজি বিদ্রোহের গল্প, ক্রুজার আর সাবমেরিনের গল্প, কালো, লাল, সবুজ মুখোশ পরা নামকরা কুস্তিগিরদের গল্পও বলছিল পলেভয়। তিন তিনটি ঘোড়া সমেত গাড়ি মাথায় তুলে নিতে পারত সেই সব পালোয়ানরা। খালি গাড়ি নয়, প্রত্যেকটি গাড়িতে বসে রয়েছে অন্তত দশ দশজন আরোহী। মিশা অবাক হয়ে শোনে। নিঃঝুম রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। জমাট অন্ধকারের মধ্য থেকে

দুএকটি আলো টিমটিম করে জ্বলছে। পলেভয় 'রানী মারিয়া' নামের জাহাজটার গল্প বলছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে ঐ জাহাজেই কাজ করত সে।

জাহাজটি ছিল বিশাল। কৃষ্ণসাগরের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ। ১৯১৫ সালের জুন মাসে জাহাজটা প্রথম জলে ভাসে। বছর খানেকের মধ্যেই ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে সেভাস্তোপোলের কাছে ডাঙার আধ মাইল দূরে বিস্ফোরণের ফলে ডুবে যায়। পলেভয় বলছিল — 'আসলে বিস্ফোরণের পিছনে ষড়যন্ত্র কাজ করেছিল। মাইন কিংবা টর্পেডোর আঘাতে ডোবেনি। এক নম্বর বুরুজে ছিল প্রায় ৪৮ টন বারুদ। সেটাই প্রথমে ফাটে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব জায়গার বারুদে বিস্ফোরণ হতে শুরু করে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জাহাজটা জলের তলায় তলিয়ে যায়। নাবিকদের মধ্যে অনেকেই মারা যায়। বাকিরাও ভীষণভাবে জখম হয়।' মিশা হাঁকপাঁক করে জিজ্ঞাসা করে, 'জাহাজটা তাহলে কারা উড়িয়ে দিয়েছিল?' চওড়া কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে পলেভয় উত্তর দেয়, 'কে জানে। অনেক চেষ্টা করেও কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি যে। আর তারপরই তো এল বিপ্লব। তবে কৈফিয়ৎ যদি চাইতেই হয় তাহলে চাইতে হয় জার-এর নৌ সেনাপতিদের কাছে।'

মিশা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা সের্গেই ইভানোভিচ, বলুন তো জার বড় না সম্রাট বড়।'

পলেভয় হলদে থুতু ফেলে উত্তর দেয়, 'দূর ও দুটোই সমান।'

— 'অন্যসব দেশেও কি জার আছে এখনও?'

— 'হ্যাঁ, দু একটা দেশে আছে বৈকি।'

ততক্ষণে ছোরাটার কথা মনে পড়ে গেল মিশার। ভাবল একবার জিজ্ঞাসা করে। তারপর ভাবল না বলাই ভাল। পলেভয় হয়তো ভাববে আমি ইচ্ছে করেই ওর পিছু নিয়েছিলাম।

অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হলে সবাই বাড়ির ভেতরে ঢোকে। প্রত্যেকদিনের মতন দিদিমা জানলার খড়খড়ি টেনে দিতে থাকেন। লোহার ছিটকিনিগুলো ঝনঝন করে আপত্তি জানাতে থাকে। খাবার ঘরে ঝোলান কেরোসিন বাতিটা নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে থাকা আলোর পোকা হঠাৎই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে থাকে মিশা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর ফালি ঘরের ভেতরে এসে পড়ে। একটা উচ্চিংড়ের গায়ে সেই আলো চকচক করে ওঠে।

মস্কোতে উচ্চিংড়ে নেই। সেখানে বড় বড় ঘর, হই হট্টগোল, দরজায় দড়াম দড়াম শব্দ হচ্ছে। কলিং বেল বাজছে — সেখানে উচ্চিংড়ের জায়গা নেই। মিশা দাদামশায়ের বাড়িতে বিছানায় বসে শুয়ে কল্পনা করতে করতে উচ্চিংড়েদের শব্দ শুনতে পায়। মিশা ভাবে পলেভয় ওকে ছোরাটা যদি দিয়ে দিত তাহলে কী

ভালই না হত। মিশার এখন কোনও অস্ত্র নেই, দেশে অরাজকতা চলছে, এখানে ওখানে লড়াই চলছে, ছোরাটা পেলে মন্দ হত না। ইউক্রেনের গাঁয়ে গঞ্জে ডাকাত ছেয়ে গেছে, শহরগুলোও শান্তিতে নেই। স্থানীয় আত্মরক্ষা বাহিনী পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সারা রাত। বুলেট নেই, মরচে পড়া পুরনো কাঠের রাইফেলই ওদের একমাত্র হাতিয়ার। মিশা স্বপ্ন দেখে সে বড় হয়ে গেছে, ঢোলা উর্দি পাৎলুন পরছে, খাকি রঙের চোস্ত ফৌজি পট্টি বেঁধেছে পায়ে, কাঁধে থাকছে রাইফেল, হাতে হাত বোমা, মেশিনগানের বেল্ট ঝুলছে বুকে, চামড়ার কোমরবন্ধে গোঁজা থাকছে পিস্তল। মিশা যে ঘোড়াটায় চড়ছে তার রং হবে দাঁড়কাকের পালকের মতন কালো, পাগুলো পরিষ্কার, চোখা নজর, পেছনটা তাগরাই, গলাটা খাটো, সারা গা চকচক করছে যেন মাছিও পিছলে যাবে। মিশা জোর কদমে ছুটে ধরে ফেলবে নিকিৎস্কি ডাকাতটাকে, নিকিৎস্কির গোটা দলটাকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে সে। সেই লড়াইতে মিশা সব সময় পলেভয়ের পাশে থাকবে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করবে। বীরের মতন শেষ মুহূর্তে পলেভয়ের প্রাণ বাঁচাবে, তারপর ও প্রাণ দেবে। আজীবন ওর জন্য শোক করবে ওর বন্ধুরা। কিন্তু মিশার মতন বন্ধু আর খুঁজে পাবে না কেউ কোনওদিন। এইসব ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল মিশা।

৪.

শাস্তি

সকালের খাবার খেতে খেতে দাদামশাই বললেন, 'কাল সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েছিস। সপ্তাহ খানেকের মতন শখ মিটেছে নিশ্চয়ই। তো বাছাধন আর কিন্তু ঘরের বাইরে পা বাড়াতে পারছ না।' শাস্তি শুনে মিশা গুম হয়ে যায়। শাস্তিটা নির্ঘাৎ সোনিয়ামামার মাথা থেকেই বেরিয়েছে। দুঃখের কথা দাদামশাইও শত্রুপক্ষে চলে গেল। দিদিমা বললেন, 'অত গোমরা মুখের কারণ কী, অ্যা, ভারী দুষ্টু হয়ে যাচ্ছিস দিনের পর দিন।' দাদু খাওয়ার টেবিল ছেড়ে চলে যেতে যেতে বললেন, 'থাকগে ছেড়ে দাও। যা শাস্তি পাওয়ার সে তো পেয়েই গেল, তাই না।' কোনও মতে খাওয়া শেষ করে এঘর ওঘর করে বেড়াল মিশা কিছুক্ষণ। দূর জায়গাটা পচার হদ্দ একেবারে, থাকা যায় না।

খাবার ঘরের দেয়াল জুড়ে ছবি। তেলরঙের জলুস এখন নেই। একটা ছবিতে বিরাট একটা গাঙচিল নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর একটাতে লম্বা শিং হরিণ, সোজা দাঁড়ানো পাইনগাছের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে। একটাতে একপায়ে পানকৌড়ি দাঁড়িয়ে, অন্য একটাতে উঁচু বুট পরা শিকারি, মাথায় পালক গোঁজা টুপি, কাঁধে বন্দুক, গলায় কার্তুজের বেল্ট,

শিকারিদের সামনে শিকারি কুকুর কয়েকটা। সোফার পেছনে দাদু আর দিদিমার বয়সকালের ছবি। দিদিমার গায়ে লম্বা গলাঢাকা কালো কোট, গলায় একটা পদক ঝোলানো। দাদুর বিরাট গোঁফ, পরিষ্কার করে কামানো গাল, কলপ দেওয়া কলার। দিদিমার উঁচু করে বাঁধা চুল ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায় আর কী।

মিশা ঘর থেকে বাইরে চলে আসে। কাঠ কাটছে দুজন উঠোনে। করাত দিয়ে কাটার পর পরই হলদে কাঠের গুঁড়ো জমে যাচ্ছে দুপাশে। মিশা কুকুরের বাক্সর কাছাকাছি কাঠের গুঁড়িটাতে বসে দেখতে লাগল ওদের কাজ। দুজনের একজন একটু বয়স্ক, বছর চল্লিশেক বয়স হবে। মাঝারি চেহারা, বেশ গাট্টাগোট্টা। কপালের ঘামে চুল লেপটে আছে। অন্যজন কমবয়সি, লাল চুল, মুখে বসন্তের দাগ, সাদা ভুরু, থলথলে ভোঁতা চেহারার।

মিশা বাক্সটার নীচে হাত ঢুকিয়ে পুঁটলিটা খোঁজে। ভাবে বের করবে। তাই আড়চোখে লোকদুটোর দিকে তাকায়। লোকদুটো কাজ থামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। একজন একটা কাগজে তামাক ঠেসে সেটা পাকিয়ে ধরিয়ে সুখটান টানছে, অন্যজন ঝিমুচ্ছে, লোকটা হঠাৎ চোখ খুলে হাই তুলে বলে, 'দুত্তোর খালি ঘুম পাচ্ছে।' প্রথমজন হাসল, বলল, 'ঘুম পেলে তো তোর আর স্থান কাল জ্ঞান থাকে না।' তারপর দুজনেই চুপ করে গেলে চারদিক হঠাৎই নিঃঝুম হয়ে পড়ল। একপাল মুরগি শুধু এককোণে রাখা কাঠের গামলাটায় খাবার ঠোকরাচ্ছে, আর লাল লাল ঝুঁটি নিয়ে মাথা হেলাচ্ছে। লোকদুটো হঠাৎই আবার উঠে কাজে লেগে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মিশা পুঁটলিটা বের করে ফেলল। ছুরিটার ধারালো ফলাটা নেড়েচেড়ে দেখে — একদিকে আবছা একটা নেকড়ে বাঘের মূর্তি, অন্যদিকে একটা কাঁকড়াবিছে, আর একটা পদ্মফুল। নেকড়ে বাঘ, কাঁকড়াবিছে আর পদ্ম — এগুলোর মানে কী। ছিটকে একটা কাঠের টুকরো ওর পাশে এসে পড়ল। চমকে উঠল মিশা। তাড়াতাড়ি ছোরাটা বুকের কাছে নিয়ে দুহাত দিয়ে আড়াল করে নিল।

বয়স্ক লোকটা বলল, 'এই খোকা, সরে যাও, চোট লাগবে।'

মিশা চটপট জবাব দেয়, 'আমি খোকা নই।'

লোকটা হেসে ফেলে, বলল, 'বাব্বা, জিভের ধার তো কম নয়। তা, তুমি কে শুনি, কমিসারের ছেলে নাকি?'

'কমিসার কে?'

'পলেভয়', বলে লোকটা ওদের বাড়ির দিকে তাকায়।

'না, ও আমাদের বাড়িতে থাকে।'

'এখন বাড়িতে আছে?' কুড়াল নামিয়ে লোকটা মিশাকে লক্ষ্য করে।

'না, খাওয়ার সময় হলে আসে। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

কাঠগুলো কাটা শেষ হলে দিদিমা ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসেন। চর্বির টুকরো, রুটি আর ভদকা। কমবয়সি লোকটা চুপচাপ ভদকাটুকু খেয়ে নিল। বয়স্কজন একচুমুকে শেষ করে হাঁক পাড়ল, 'জয় ভগবান।' তারপর দুজনে মিলে চর্বি দিয়ে রুটি খেতে লাগল। খুব আস্তে ধীরে ওরা খাওয়া শেষ করে জল খেয়ে চলে গেল। দিদিমা উঠোনেই থেকে গেছেন। আলগা উনুনের নীচে কাঠ গুঁজে দিলেন কয়েকটা। তারপর একটা বিরাট পেতলের গামলা রাখলেন উনুনের ওপরে। ইট সাজিয়ে হাওয়া আড়াল করলেন। তার মানে তিনি এখন মোরব্বা বানাবেন। অর্থাৎ বেশ কিছুক্ষণ এখানেই থাকবেন এখন। দিদিমার চোখ এড়িয়ে ছোরাটা তার নিজের জায়গায় রেখে দেওয়ার উপায় নেই। মিশা ছোরাটা জামার হাতার ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

পাশ-দিয়ে যাওয়ার সময়ই দিদিমা ফিসফিস করে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস রে, দেখিস, শব্দ করিস না, দাদামশাই ঘুমোচ্ছে কিন্তু।' মিশাও ফিসফিস করে উত্তর দেয়, 'না আস্তে আস্তেই যাব।' ঘরে এসে সোফার গদির তলায় ছোরাটা লুকিয়ে রাখে মিশা। দিদিমা উঠোন ছেড়ে চলে এলেই কিংবা অন্ধকার হলেই ছোরাটা ঠিক জায়গায় রেখে আসবে সে।

নিঃঝুম বাড়িটাতে শুধু দেওয়ালঘড়ির টক টক আওয়াজ। একটা মাছি জানলার কাচে ভোঁ ভোঁ শব্দ করছে। মিশার সময় যেন আর কাটতেই চায় না। সোনিয়ামামার ঘরের দরজায় এসে কান পাতল মিশা। সোনিয়ামামা কাশছে, বইয়ের পাতা ওলটানোর শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল মিশা। জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা সোনিয়ামামা, জাহাজিরা সঙ্গে ছোরা রাখে কেন বলুন ত?'

সোনিয়ামামা হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করে, 'কোন জাহাজি, কিসের ছোরা?'

— 'সেকি, আপনি জানেন না, জাহাজিরাই এক বিশেষ ধরনের ছোরা সঙ্গে রাখে।' বলে গ্যাট হয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ইচ্ছে, খাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে।

সোনিয়ামামা বিরক্ত হয়, বলে, 'জানি না বাপু, হয়ত নৌ পোযাকের সঙ্গে ছোরা রাখতে নিয়ম আছে। পেলে তোমার উত্তর!' অর্থাৎ কথা হয়েছে, এবারে কেটে পড়।

'একটু থাকি না এখানে। একদম চুপচাপ বসে থাকব।'

'ঠিক আছে, বিরক্ত করবে না কিন্তু একটুও', বলে সোনিয়ামামা আবার বই তুলে নেন হাতে।

মিশা চুপটি করে বসে থাকে। সোনিয়ামামার ঘরটা ছোট, তার মধ্যেই বিছানা, আলমারি, লেখার টেবিল, টেবিলের ওপরে পিস্তলের মতন দেখতে দোয়াতদানি। দোয়াতটা খুলতে হলে পিস্তলের ঘোড়াটা টিপতে হবে। মিশার বড়

লোভ জিনিসটার ওপরে। একবার হাতে পেলে ইস্কুলের বন্ধুদের ওপরে একহাত টেক্কা দেওয়া যেত। ঘরের দেয়াল জুড়ে ছবি আর ছবি। কবি নেক্রাসভের ছবি। ওদের ইস্কুলের শুরা ছেলেটা যে কোনও উৎসবই হোক না কেন, সেখানে নেক্রাসভের কবিতা আবৃত্তি করবেই করবে। নেক্রাসভের ছবির পাশেই শিল্পী রেপিনের 'অপ্রত্যাশিত অতিথি' ছবিটা রয়েছে। ছবিটিতে একজন রাজবন্দি হঠাৎ ফিরে এসেছে বাড়িতে। ওকে দেখে বাড়িশুদ্ধ লোক একেবারে হতভম্ব। ওর ছোট মেয়েটা তো ভুলেই গিয়েছিল তার বাবাকে। মিশার বাবার কথা মনে পড়ে। জারের বন্দি হয়ে মারা গেছেন। কোনওদিন ফিরবেন না আর। বাবার চেহারা মিশারও ঠিক মনে পড়ে না।

সোনিয়ামামার ঘর ভর্তি শুধু বই আর বই। আলমারি, আলমারির মাথায়, বিছানায়. টেবিলে, বসার জায়গা — সবখানে বই ছড়ানো ছিটানো এলোমেলো। মিশাকে কিন্তু কোনওদিন একটা বইও পড়তে দেন না তিনি। মিশাদের মস্কোর বাড়িতেও বই আছে প্রচুর। ওর নিজেরই একটা লাইব্রেরি আছে। ওর 'অ্যাডভেঞ্চারের জগৎ' বইটা তো সোনিয়ামামাব সব বইয়ের চাইতেও বড়। মিশার দিকে না তাকিয়ে সোনিয়ামামা একমনে বই পড়তে থাকেন। মিশা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়েও একটা কথা বলা দরকার মনে করলেন না।

বড্ড একঘেয়ে লাগছে মিশার। খাওয়ার সময়টাও তাড়াতাড়ি চলে এলে ভাল হত। জানলার কাচে ছাই রঙের পাখাওয়ালা একটা বড় সবুজ মাছি উঠছে আর নামছে। যখন ও নীচে পড়ছে ভন ভন আওয়াজ করে ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। মিশা ঠিক করল নিজের মনের জোর পরীক্ষা করবে এবার। মাছিটা দেখবে কিন্তু ধরবে না, নিজেকে সংযত রাখবে। এভাবেই মনের জোর বাড়বে ওর। কিন্তু একটু পরেই মনে হল মাছিটার শব্দে দাদামশাইয়ের ঘুম না ভেঙে যায়। তাই তাড়াতাড়ি ওটাকে ধরে ফেলল এক ঝটকায়। তারপর জানলা খুলে ওটাকে ছেড়ে দেবে কি দেবে না ভাবছে তখন হঠাৎ লক্ষ্য করল গেঙ্কা জানলাটার ঠিক নীচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'এই মিশা —'

'কী বলছিস?' আস্তে উত্তর দিল মিশা।

'অনেকগুলো মাছি ধরলি নাকি আজ?'

'যে কটা দরকার ধরেছি।'

'বাইরে আসবি না?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'না কি, তোকে বেরোতে দিচ্ছে না।'

'ভারী বুঝিস, ইচ্ছে হলেই যেতে পারি।'

'তাহলে একটু ইচ্ছে কর।'

'না বেরোব না আজ।'

'তার চেয়ে বল, বেরোতে পারবি না।'

'তাহলে দেখ', বলে একলাফে জানালা গলে নীচে নামে মিশা।

সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার চিৎকার শোনা যায়, 'এই মিশা, এক্ষুণি ফিরে আয় বলছি।'

মিশা মাথা নিচু করে বলে, 'দৌড়ো।'

ছুটল ওরা, পাশের গলিতে গিয়ে পড়ল। তারপর বাগানের বেড়া টপকে লুকোল গাছের নীচে আড়াল করা একটা কুঁড়েঘরে।

৫.

ডালপালার কুঁড়েঘর

কুঁড়েঘরটা কয়েকটা তক্তা আর ডালপালা পাতা দিয়ে তৈরি। তিনটে গাছের আড়ালে প্রায় লুকোনই থাকে। কুঁড়েঘরটা মাটি থেকে চার পাঁচ হাত উঁচুতে তৈরি। ওটাতে উঠলে গোটা শহরটাই যেন দেখা যায়। স্টেশন, দেসনা নদী, এমনকি নোসভ্কা গাঁয়ের সড়ক অব্দি। ভেতরটা শীতল, পাইন গাছের গন্ধ ঘরটাতে। জুলাই মাসের পড়ন্ত রোদে পাতাগুলো কাঁপছে।

একটু জিরিয়ে গেন্কা বলল, 'বাড়ি ফিরবি কী করে, দিদিমা দেবেখন আচ্ছা ধোলাই।'

'দূর বাড়িই ফিরব না আর।'

'মানে?'

'মানে, যাব না, ব্যস। যাবই বা কেন। কাল পলেভয় ওর ফৌজি দলকে নিয়ে যাচ্ছে নিকিৎস্কির গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে। আমাকেও সঙ্গে নেবে বলেছে।'

'ফৌজি দলে গিয়ে তুই কি করবি শুনি, ছাগলের চামড়ার ঢাক বাজাবি?' বলে হো হো করে হাসতে লাগল গেন্কা।

'হাসতে চাস হেসে নে। তবে পলেভয় আমাকে স্কাউট বানিয়ে নেবে বুঝলি। যুদ্ধের সময়ে স্কাউটের কাজ ছেলেরাই করে জানিস না! পলেভয় আরও দু একজন ছেলে জোগাড় করে দিতে বলেছে আমাকে। কিন্তু তেমন জুৎসই ছেলে কোথায় বল। মনে হচ্ছে আমাকে একাই যেতে হবে।'

গেন্কা করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর মিশা বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমার জন্য খাবার কিছু নিয়ে আয় তো। তারপর ভেবে দেখা যাবে। তবে শোন ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলিস না যেন। খুবই গোপনীয় ব্যাপার।'

গেন্কা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী মজা আমরা স্কাউট হব।'

মিশা ক্ষেপে লাল, 'বারণ করলাম আর তুই চেঁচাতে শুরু করলি। নেব না তোকে যা।'

গেঙ্কা ফিসফিস করে বলে, 'ঠিক আছে বাবা, আর কথা বলব না।' তারপর গাছ বেয়ে নেমে বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মিশা কাঠের তক্তায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে অগত্যা অপেক্ষা করতে থাকে। এখানে ঘুমোনরও উপায় নেই। বাড়িতে ফিরতেও লজ্জা। হঠাৎ ওর ছোরাটার কথা মনে পড়ল। এই রে, ওটা যদি আর কারও হাতে পড়ে তাহলে ভারী গণ্ডগোল বাঁধবে। গাছের আড়াল থেকে মিশা বাগানের দিকে তাকায়। নিচু আপেলের গাছ, নাসপাতির গাছ, র‍্যাস্পবেরির বেত লতা আর গুজবেরির ঝোপ। মিশার মনে প্রশ্ন জাগে — আচ্ছা একই জমিতে কত রকমের গাছ, কত রকমের ফুল ফল — কেন এমনটা হয়। মিশার হাতের ওপরে একটা ছোট্ট পোকা উড়ে এসে বসে, ছোট্ট গোল একটা পোকা, লাল গা, কালো আলপিনের মতন মাথা, পোকাটাকে হাতের তেলোয় তুলে নিয়ে মিশা ছড়া কাটে —'ছোট্ট পোকা, ছোট্ট পোকা, ঘর যে তোর গেল পুড়ে, খোকা রইল একা।' বলতেই পোকাটা হুস করে উড়ে গেল। একটা বোলতা ভোঁ ভোঁ করতে করতে উড়ে এল ঘরের মধ্যে, বসল একেবারে মিশার পায়ের ওপর। কামড়াবে নাকি। স্থির হয়ে থাকলে ওরা কামড়ায় না, জানে মিশা। ঠিক তাই, পা বেয়ে বেয়ে একটু উঠল তারপর আবার বোঁ করে উড়েও গেল।

মিশাকে ঘিরে রয়েছে এখন আশ্চর্য এক প্রাণীজগৎ। একটা পিঁপড়ে পাইনকাঁটা বয়ে নিয়ে চলেছে। মাটিতে ওর ছায়া পড়েছে। পিঁপড়েটার সঙ্গে ওর ছায়াটাও চলছে। সবুজ ঘাসের ডগায় লাফাচ্ছে গঙ্গাফড়িং। ওদের বাঁকানো লম্বা লম্বা পা দেখলে মনে হবে বুঝি পাগুলো ভাঙা। বাগান জুড়ে লাফালাফি করছে একঝাঁক চড়ুই। আধবোঁজা ঢুলুঢুলু চোখে চড়ুইটাকে লক্ষ্য করছে একটা বেড়াল। চারপাশ থেকে বাতাস জুড়ে ভেসে আসছে ঘাসের গন্ধ, ফুলের সুবাস। মিশার ঘুম পেয়ে যায়। চোখের পাতা বুঁজে আসে। সব অসুবিধার কথা বিস্মৃত হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে দুরদার করে কুঁড়েঘরটায় উঠে এল গেঙ্কা। কাছে এসে জামার তলা থেকে বের করল এক টুকরো বেশ বড় সাইজের আধসেদ্ধ মাংস। বলল, 'এই দেখ রান্নার কড়াই থেকে তুলে নিয়ে আসছি একেবারে।'

—'সর্বনাশ', মিশা বলে, 'বাড়ির আর কারও খাওয়াই হবে না, সে কথা ভেবেছিস?' বেপরোয়া ভঙ্গিতে পিছনে মাথা ঠেলে দিয়ে গেঙ্কা উত্তর দেয়, 'তাতে আর কী এসে যায় বল। স্কাউট হয়ে তো চলেই যাচ্ছি আমি —। দরকার হলে নতুন করে রান্না করে নিক না আরও কিছুটা মাংস।'

দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংসটা তারিয়ে তারিয়ে খেল মিশা। গেঙ্কাটা আস্ত

গাধা সন্দেহ নেই। ওর বাবা পিটিয়ে লাশ করে দেবে ওকে। ওর সৎমাও ছেড়ে কথা কইবে না। বাবা লম্বা চওড়া চেহারার মানুষ, পাকা গোঁফ আছে, ইঞ্জিনের ড্রাইভার।

গেঙ্কা বলল, 'খবর শুনেছিস?'

— 'কী খবর?'

— 'হ্যাঁ, তোকে বলে দিই আর কী।'

— 'তোর খুশি, আমার কাছেও লুকোবি নাকি, কী করে স্কাউট হবি তাহলে।'

মিশার ধমকানিতে কাজ হল। গামলা থেকে মাংস চুরি করার পর গেঙ্কার সামনে একটাই রাস্তা খোলা, স্কাউট তাকে হতেই হবে। তার মানে বাধ্য হয়ে থাকতেই হবে।

বলল, 'নোসভ্কা থেকে একজন লোক এসেছিল বাড়িতে। শুনলাম নিকিৎস্কির দল নাকি খুব কাছেই এসে পড়েছে।'

মাংস চিবোতে চিবোতে মিশা বলে, 'তাতে কী হল।'

— 'আবে ওরা রেভস্ক আক্রমণ করতে চলেছে যে।'

— 'তুইও বিশ্বাস করছিস', হেসে ফেলে মিশা, 'দূর বোকা, তুই আবার স্কাউট হতে চাস।'

— 'কেন, বিশ্বাস না করার কী হল?'

— 'কারণ, নিকিৎস্কি আছে চের্নিগভ্ শহরে, ওখানে আমাদের একটা গোটা গ্যারিসন রয়েছে।'

— 'গ্যারিসন, সেটা আবার কী!'

— 'গ্যারিসন কি তাও জানিস না, মানে, কী করে যে বোঝাই তোকে . .'

— 'চুপ, চুপ, শুনতে পাচ্ছিস!'

মাংস চিবোন বন্ধ করে কান খাড়া করল মিশা। গুলির আওয়াজ কানে এল। রেল স্টেশনে সাইরেন বেজে উঠল, সঙ্গে মেশিনগানের কটকট শব্দ। ভয়ে জমে যায় গেঙ্কা আর মিশা। পাতার আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে থাকে।

নোসভ্কার রাস্তায় 'ধুলোর ঝড় উড়িয়ে একদল ঘোড়সওয়ার তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল রেভস্ক শহরে, ওদের মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপি, লাল চুল। ছেলে দুজন কিছু বুঝতে না বুঝতেই সাঁই সাঁই চাবুক হাঁকিয়ে ওরা এসে পড়ল শহরের বুকের ওপরে।

৬.

হামলাবাজি

ডালপালার আড়ালে কুঁড়েঘরটায় অনেকক্ষণ লুকিয়ে রইল মিশা। তারপর গোলাগুলির শব্দ থেমে যেতেই রাস্তাটা একবার দেখে নিয়েই বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে ছুটল বাড়ির দিকে। দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন দরজার সামনে, হতভম্ব ফ্যাকাশে মুখ করে। বাড়ির সামনে কসাকদের জিন পরানো কয়েকটা ঘোড়া, ঘেমে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। দরজার কাছে দৌড়ে যেতেই ভেতরে চোখ পড়তে পা আটকে গেল ওর। খাবার ঘরে গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে মরীয়া হয়ে লড়ছে পলেভয়। ছজন ওকে একসঙ্গে চেপে ধরেছে। পলেভয় প্রাণপণ চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াতে। পারছে না। ধাক্কা খেয়ে টেবিল চেয়ার পর্দা সব খসে পড়ছে এদিক ওদিক। আর একজন শ্বেতরক্ষী, দলের সর্দার মনে হয়, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চুপচাপ পলেভয়কে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। র‍্যাকের ওপর ঝোলান একগাদা কোটের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মিশা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল কখন পলেভয় সবার ঘাড় মটকে উঠে দাঁড়াবে। কতবার যে স্বপ্ন দেখেছে সে এই দৃশ্যের। কিন্তু ওর স্বপ্ন বাস্তবে ফলল না। পলেভয় গুণ্ডাগুলোর হাত ছাড়িয়ে দাঁড়াতে পারল না। গুণ্ডাগুলো ওকে কাবু করে, হাত দুটো পিছমোড়া করে ঠেলে নিয়ে চলল জানলায় দাঁড়ান সেই শ্বেতরক্ষীর সামনে। হাঁপাচ্ছে পলেভয়, মাথা চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে, খালি পা, ডোরাকাটা গেঞ্জি পরনে। মিশা বুঝল, আচমকা ঘুম থেকে ঠেলে তোলা হয়েছে ওকে। গুণ্ডাগুলোর হাতে কারবাইন, পিস্তল আর তলোয়ার। মেঝের ওপরে ওদের জুতোর নালের কাঁটাগুলো আওয়াজ তুলছে।

সর্দারটি সোজা তাকাল পলেভয়ের দিকে। লোকটির ডান গালের ওপরে দগদগে লাল কাটা দাগ। ফারের টুপির তলা থেকে কালো চুল বেরিয়ে এসেছে কপাল ছাপিয়ে। সবাই চুপচাপ, শুধু ঘড়িটার টকটক শব্দ আর ওদের জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

সর্দারটা হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, 'ছোরাটা', তারপর একটু থেমে বলল, 'ছোরাটা কোথায়?' কোনও জবাব দিল না পলেভয়। শ্বেতরক্ষীটা চাবুক তুলে পলেভয়ের মুখে জোরে এক ঘা কষাল। শিউরে উঠে মিশা চোখ বুঁজল।

— 'নিকিৎস্কির কথা ভুলে গেছিস! তাহলে আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোকে।'

তাহলে এই হল ডাকাত নিকিৎস্কি, আর পলেভয় এরই ছোরাটা লুকিয়ে রেখেছে।

নিকিৎস্কি গলা নরম করে বলল, 'দেখ পলেভয়, তোমার পরিত্রাণ নেই। ছোরাটা বের করে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। নাহলে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে আমার লোকজনরা।'

পলেভয় তবু চুপ করে আছে। নিকিৎস্কি বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে মরো এবার।' তারপর দুটো গুণ্ডাকে কী ইশারা করল। ইশারা করতেই লোকদুটো পলেভয়ের কামরার দিকে ছুটে গেল। আরে এদুটো তো সকালের সেই কাঠ কাঠুরে দুটো! সারা ঘর ওলট পালট করল, বন্দুকের বাঁট দিয়ে আলমারি ভাঙল। মিশার বুকে হাপর লাফাচ্ছে। ওরা যদি ওর ঘরেও ঢোকে। আড়াল ছেড়ে ও চুপিসাড়ে হল ঘরে গেল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্ধকারে সোফায় গদির নীচে ছোরাটার ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলাটা চেপে ধরল ও, তারপর টেনে বের করে জামার আস্তিনে লুকিয়ে ফেলল। হাতের মুঠোয় আস্তিন আর বাঁট দুটোই চেপে ধরে আবার লুকোল কোটগুলোর আড়ালে। গুণ্ডাগুলো পলেভয়ের ঘর তছনছ করে ফেলেছে, আর পলেভয় শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে হাতদুটো পিছমোড়া করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। বারান্দা পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন এসে নিকিৎস্কির কানে কানে কী বলল। নিকিৎস্কি চাবুক হাঁকিয়ে হুকুম দিল — 'ঘোড়ায় চাপো।' গুণ্ডাগুলো পলেভয়কে টানতে টানতে নিয়ে চলল রাস্তা আর খিড়কির উঠোনে অন্ধকার সরু গলিটার মধ্যে। পলেভয় একটু কাছে আসতেই মিশা ওর হাত ধরে মুঠোটা খুলে ছোরাটা ওর হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। এক লহমায় পলেভয় এক পা এগিয়ে সামনের গুণ্ডাটার ঘাড়ের ওপরে বসিয়ে দিল ছোরাটা। সেই সঙ্গে মিশাও আর একটা গুণ্ডার পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুণ্ডাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মিশার গায়ের ওপর। ততক্ষণে পলেভয় লাফিয়ে উঠোনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশ্য মিশা এর বেশি কিছু দেখতেও পেল না। কারণ রিভলভারের বাঁটের এক মোক্ষম ঘায়ে ও ছিটকে পড়ে গেল র‍্যাকে ঝোলানো একটা ক্যানভাসের বর্ষাতিকাঠের নীচে।

৭.

মা

মিশা চুপচাপ শুয়ে আছে বিছানায়। মাথা জুড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। দরজায় লেসের পর্দা দুলছে। কানে আসছে রাস্তার শব্দ। লোকজন চলাফেরা করছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে গাড়ি চলছে। আবছা স্বপ্নের মতন টুকরো কত কী যে মনে পড়ছে — শ্বেতরক্ষীদের সর্দারের বরফের মতন চোখ, নিকিৎস্কি, ছোরা, পলেভয়ের

রক্তাক্ত মুখ, ওর মুখেও চটচটে গরম রক্ত ...। সব কিছু অবশ্য দাদামশায়ের কাছেই শুনল মিশা। রেল মজুরদের একটা ফৌজিদল শহরটাকে ঘিরে ফেলেছিল। জোরে ঘোড়া চালিয়েও ডাকাতরা পালাতে পারেনি। তবে নিকিৎস্কি পালিয়ে যেতে পেরেছে। গুরুতর জখম হয়েছে পলেভয়। সে এখন হাসপাতালে।

দাদামশাই মাথায় চাপড় মেরে আদর করে বলে, 'বাহাদুর ছেলে তুই মিশা।' কিন্তু মিশার মন মানে না। বাহাদুর আর কোথায় হতে পারল সে, বাহাদুর হলে তো সবকটা ডাকাতকেই সাবাড় করে নিকিৎস্কিকে গ্রেপ্তার করত সে। যাকগে। দেখা হলে পলেভয় ওকে কী বলবে কে জানে। হয়ত ওর পিঠ চাপড়ে বলবে — 'এই যে মিখাইল গ্রেগোরিয়েভিচ, হালচাল কী?' কিংবা খুশি হয়ে ওকে একটা রিভলবার দেবে, কার্তুজ রাখার বেল্টও একখানা। ওরা দুজনে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে, ঠিক পল্টনি কায়দায়। হ্যাঁ দেখবার মতন হবে অবশ্যই দৃশ্যটা। ওই ওপাড়ার পেৎকাটা ওকে আর ভয় দেখাতে সাহসই পাবে না।

দাদামশাই মাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন। কয়েকদিন হল মা এসেছে মস্কো থেকে। মা এসে ঘরে ঢুকল। বিছানার চাদরটা ঠিকঠাক করে প্লেট আর রুটির গুঁড়ো সব পরিষ্কার করল মা।

— 'মা, সেই সিনেমাটা চলছে এখনও?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কী ছবি হচ্ছে এখন?'

— 'মনে পড়ছে না। তুই চুপ করে শুয়ে পড়তো।'

— 'শুয়েই তো আছি। আমাদের ঘন্টাটা সারানো হয়েছে।'

— 'না। তুই বাড়িতে গিয়ে ঠিক করবি।'

— 'তা তো করবই। ছেলেদের কাউকে দেখেছ। শ্লাভাকে।'

— 'হ্যাঁ।'

— 'আর শুরাকে।'

— 'হ্যাঁ। ওদের সবাইকে দেখেছি। এখন শুয়ে থাক চুপ করে।'

ব্যান্ডেজ খোলার পর মস্কোতে যেতে হবে। ব্যান্ডেজ নিয়ে যেতে পারলে দারুণ মজা হত। সকলে কী হিংসেটাই না করত। তাছাড়া স্নান করতে হত না। মা জানলার সামনে বসে কী সেলাই করে চলেছে।

— 'আর কতদিন বিছানায় থাকতে হবে মা।'

— 'যতদিন না ঠিকমত সেরে ওঠ।'

— 'ভালই তো আছি এখন। একটু বাইরে যাব, মা?'

— 'হাঁদার মতন কথা বলিস না তো, চুপ করে শুয়ে থাক এখন।'

মিশার মন খারাপ হয়। একটু হাঁটব তাতেও দোষ। বিছানার মধ্যে সবাই ওকে আটকে রাখতে চায়। ঠিক আছে, উঠে না পালিয়েছি দেখো, তোমরা।

মনে মনে কল্পনা করতে থাকে মিশা। মা ঘরে ঢুকে দেখছে মিশা নেই। খুব দুঃখ পাবে। কাঁদবে খুব। কিন্তু কেঁদেও লাভ হবে না। মিশার সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে না মায়ের। আড়চোখে মাকে দেখে মিশা। দাঁত দিয়ে সুতো কাটছে। না, মিশা না থাকলে মায়ের খুব কষ্ট হবে। একেবারে একা। কাজের শেষে বাড়িতে এসে দেখবে অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে বসেই কেবলই ভাববে মিশার কথা। ভাবতেই মিশার গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে উঠছে। মা রোগা পাতলা মানুষ, একটু বেশি গম্ভীর, অসম্ভব পরিশ্রমী, চোখদুটো উজ্জ্বল। কারখানার কাজ সেরে ফিরতে দেরি হয়। ফিরে বাড়ির সব কাজকর্ম একা করে। মিশার হোমটাস্কটাও মা করতে সাহায্য করে। কিন্তু যখনই মা ওকে কোনও কাজ করতে বলে — রুটি আনা, খাবার গরম করা বা কাঠ কাটা — ও কিন্তু কোনও না কোনও ছুতোয় বাড়ি থেকে বাইরে চলে যায়। কখনও করে না মায়ের কোনও কাজ। ভাবতেই মিশার মন খারাপ হয়ে যায়।

মা কত ভাল মানুষ। ইস্কুলে মাস্টারমশাইদের অবাধ্য হয়ে খারাপ ব্যবহার করে মায়ের মনে কত কষ্ট দিয়েছে। ইস্কুল থেকে মাকে ডেকে পাঠিয়েছে। মিশার জন্য হেডমাস্টারের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। কত যে জিনিস নষ্ট করেছে মিশা। বই নষ্ট করেছে, জামাকাপড় ছিঁড়েছে। এতসবের জন্য মাকেই কষ্ট পেতে হয়েছে। সব মা সহ্য করে মুখ বুজে। সেলাই করে, রিপু করে ওর জামাকাপড়, সব। মিশা মায়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরোতে চায় না। পাছে লোকে বাচ্চা ছেলে ভাবে ওকে। কোনওদিন জড়িয়ে ধরে চুমু খায়নি মাকে। মিশার ধারণা ওসব ন্যাকামি। আর আজ ও কিনা মাকে কিভাবে কষ্ট দেওয়া যায় সেই কথাই ভাবছে! অথচ দাদামশাইয়ের কাছে খবর পেয়েই মা বাড়ি, কারখানা সব ফেলে মালগাড়িতে চেপে পুরো এক সপ্তাহ ট্রেনের ধকল সহ্য করে পৌঁছেছে এখানে। ওর জন্য সব দরকারি জিনিস কাঁধ বোঝাই করে নিয়ে এসেছে। এসে অবধি মিশার বিছানার ধারটি ছেড়ে নড়েননি এক পা। মিশা প্রায় অন্ধকার ঘরে চোখ অর্ধেক বুজল। মা যেখানটাতে বসে আছে, জানলা দিয়ে শুধু সেইখানটাতেই সোনালি রোদ্দুর এসে পড়েছে। মা সেলাই করছে, আর ঝুঁকে খুব আস্তে গলায় গুনগুন করে গান গাইছে :

'শোনো,
বেইমানির চেয়ে কালো,
অত্যাচারীর মনের চেয়ে কালো
শরৎকালের রাত,
আর সেই রাতের চেয়েও কালো কয়েদখানা
দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশায়।'

ওই 'শোনো' কথাটা যেন ডুকরে ডুকরে উঠছে। গানটা একজন জোয়ান

সুপুরুষ বন্দির গাওয়া গান। কয়েদখানার লোহার গরাদ দু হাতে চেপে ধরে এই গান সে গেয়েছিল, তাকিয়ে দেখেছিল বাইরের পৃথিবী, যে পৃথিবী জুড়ে কত সুখ। যে সুখের জগতে ঢোকার তার কোনও অধিকার নেই। মা গানটা বারবার গেয়েই চলেছে। মিশা চোখ খুলল। অন্ধকারে মায়ের মুখখানা কেমন ঝাপসা আবছা মনে হল। একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে মা। সবকটি গানই বিষাদে ভরা, করুণ। মিশা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। মা ছুটে এসে ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, — 'কী রে মিশা, কী হয়েছে?' কোনও উত্তর না দিয়ে মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল মিশা। কতদিনের চেনা উষ্ণ জামাটার মধ্যে মাথা গুঁজল সে। ফিসফিস করে বলল, 'মা, মা আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।'

৮.

রোগীর শুভার্থীরা

কয়েকদিনের মধ্যেই মিশা পুরোপুরি সেরে উঠল। মাথার ব্যান্ডেজটা অবশ্য আরও কিছুদিন রাখতে হবে। এখন একটু আধটু বিছানায় উঠে বসতে দেওয়া হচ্ছে ওকে। তারপর একসময় গেঙ্কাকেও দেখা করতে দেওয়া হল ওর সঙ্গে। গেঙ্কা খুব সন্তর্পনে ওর ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকে। মিশা মাথা ঘোরায় না। তারপর চিঁ চিঁ করে বলে 'বস না গেঙ্কা।' চেয়ারের একটা কোণায় আলগোছে বসল গেঙ্কা। হাঁ করে দেখতে লাগল মিশাকে। ওর নোংরা পা দুটো বৃথাই ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। সিলিংয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মিশা। মুখে যন্ত্রণার ছাপ, মাঝেমাঝে ব্যান্ডেজটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ব্যথায় নয়। গেঙ্কাকে ব্যাপারটার গভীর গুরুত্ব ভালভাবে বোঝানোর জন্যই।

– 'কেমন আছিস?' গেঙ্কা জিজ্ঞাসা করে।

— 'ভাল।' ক্ষীণ গলায় উত্তর দেয় মিশা। কিন্তু সেই সঙ্গে গভীর একটা যন্ত্রণার নিঃশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দেয় যে সে বীরের মতন অসহ্য ব্যথা সহ্য করছে।

— 'মস্কোতে ফিরে যাচ্ছিস!'

— 'হ্যাঁ।' আর একবার নিঃশ্বাস ফেলে মিশা।

— 'শুনলাম প্যারেডের ফৌজি ট্রেনের সঙ্গেই যাচ্ছিস।'

– 'কোথায় শুনলি. কে বলেছে?' শশব্যস্ত হয়ে উঠে বসল মিশা।

— 'এই, কেউ একজন।' চুপ করে যায় গেঙ্কা।

— 'তুই নিজে কী ঠিক করলি।'

— 'কী ব্যাপারে?'

— 'মস্কোতে যাওয়ার।'

— 'জানিসই তো, বাবা যেতেই দেবে না।' চটে যায় গেঙ্কা।

— 'কিন্তু তোর পিসি তো যেতে লিখেছে। মার হাত দিয়েও চিঠি পাঠিয়েছে। গেলে আমাদের বাড়িতেই থাকতিস।'

— 'দূর, বাবা যেতে দেবে না। মাও না।'

— 'কিন্তু নিউরা মাসি তো তোর নিজের মা না।'

— 'তাহলেও তিনি ভাল লোক।'

— 'পিসি তার চাইতেও ভাল।'

— 'কিন্তু যাব কেমন করে।'

— 'কেন, গাড়ির তলায় লুকিয়ে থাকবি। ট্রেন ছাড়লে উঠে আসবি আমাদের কাছে।'

— 'আর বাবা যদি ট্রেনটা চালায়।'

— 'তাহলে বাখ্‌মাচে ইঞ্জিন বদল হওয়ার পরে উঠে আসবি।'

— 'মস্কোতে গিয়ে কী করব বল।'

— 'কেন স্কুলে ভর্তি হবি। কারখানায় কাজও করতে পারিস।'

— 'কারখানার কাজ কী জানি বল।'

— 'শিখে নিবি। ভেবে দেখ। সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয় একেবারেই।'

— 'হ্যাঁ, তোর কথা, সেই স্কাউট হওয়ার কথা মনে আছে। যা মার খেয়েছি মাংস চুরি করার জন্য।'

— 'তার জন্য আমাকে দায়ী করছিস। নিকিৎস্কি হঠাৎ হামলা করবে কে জানত। নাহলে কবে আমরা স্কাউট হয়ে যেতাম। মস্কোতে পৌঁছেই স্বেচ্ছাসেবক হব শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়াই কবার জন্য। যাবি তো?'

— 'কোথায়?'

— 'প্রথমে মস্কোতে, তারপরে শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়তে।'

— 'শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়তে হলে নিশ্চয়ই যাব।'

গেঙ্কা চলে গেল। মিশা আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পলেভয়ের কথা ভাবতে লাগল। একবারও এল না তো, ছোরাটার কী হল। ছোরাটার হাতলে পদ্ম আর নেকড়ে আর কাঁকড়াবিছের ছাপ — এগুলোর অর্থ কী, কিংবা ব্রোঞ্জের সাপটার।

সোনিয়ামামা ঘরে ঢুকল। ঢুকেই চশমাটা খুলে ফেলল। চশমাটা খুললে চোখদুটো লাল লাল মনে হচ্ছে।

— 'কেমন আছ মিখাইল।'

— 'ভাল, ইচ্ছে করলে উঠতে পারি।'

— 'না না উঠতে হবে না।' হাঁ হাঁ করে ওঠে সোনিয়ামামা। তারপর সারা ঘর জুড়ে চক্কর মারে। তারপর আবার এসে বিছানার পাশে দাঁড়ায়।

— 'মিখাইল, একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

মিশা ভয় পেয়ে গেল। এইরে, সেই টিউবটার কথা নয় তো।

— 'তুমি তো বড় হয়েছ, আমার কথা বুঝতে পারবে নিশ্চয়, সিদ্ধান্তও নিতে পারবে কি বল।'

এই সেরেছে, মিশা ভাবে আবার সোনিয়ামামার বক্তৃতা শুরু হবে নাকি।

সোনিয়ামামা বলে, 'এই কাণ্ডটা ঘটে গেল, এটা কিন্তু ছেলেখেলা মোটেই নয়। দেশের রাজনীতি নিয়ে তোমার ভাবনাটা একটু আগে হয়ে যাচ্ছে না।'

— 'মানে, কী বলছেন আপনি।' মিশা অবাক হয়।

— 'বুঝতে পারছ না। তাহলে বোঝাই শোন। একটা রাজনৈতিক লড়াই হল, তুমি সেটা দেখলে। তুমি ছেলেমানুষ হঠাৎ সেখানে মাথা গলাতে গেলে কেন। দরকার ছিল না।'

— 'সে কি, ডাকাতগুলো পলেভয়কে খুন করতে যাচ্ছে, আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব, আপনি তাই বলছেন?'

— 'বিবেকের জ্ঞান থাকলে অবশ্য যে কোনও বিপদে পরা মানুষকেই তুমি সাহায্য করতে পার। কিন্তু কখন। ধর, পলেভয়কে যদি ডাকাতরা রাস্তায় আক্রমণ করত। কিন্তু এখানে তেমন কিছু ঘটেনি। লালরক্ষীরা লড়ছে শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে। এটা রাজনীতি। আর সেই রাজনীতিতে তুমি নিতান্ত নাবালক, মাথাই বা গলাচ্ছ কেন। তোমার কাজ ওসবের থেকে বাইরে থাকা।'

মিশা খুবই আঘাত পেল সোনিয়ামামার কথায়। বলল, 'আমি লালবাহিনীর পক্ষে, আপনি জানেন।'

— 'লাল সাদা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। তবে বড় বলে সাবধান করতে চাই। তোমার পক্ষে রাজনীতির বাইরে থাকাই ভাল।'

— 'তার মানে ধনীরাই রাজত্ব চালাবে, আমরা চুপচাপ থাকব। না মামা আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না আমি।'

সোনিয়ামামা বিরক্তবোধ করে, বলে, 'একমত হতে পারছ কিনা সেটাতে কারও মাথাব্যথা নেই। বড়রা যা বলে, সেটা শোনাই তোমার কাজ।'

— 'হ্যাঁ, সেটাই তো করছি আমি। পলেভয়, আমার বাবা, লেনিন সবাই আমার বড়। ওরা ধনীদের বিরুদ্ধে, আমিও তাই ওদের শত্রু।'

সোনিয়ামামা ভীষণ রেগে যান। আঙুল তুলে শাসিয়ে বলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলাও অসম্ভব।' বলেই গটগট করে চলে যান ঘর ছেড়ে।

৯.

'রানি মারিয়া' যুদ্ধজাহাজ

মিশাব মা মস্কোতে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। সবারই কেমন মন খারাপ হয়ে গেছে। মিশা সেরে উঠলেও বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই ওর। শুধু জানলায় বসে বন্ধুদের খেলা দেখে সে। সকলেই খুব সমীহ করছে ওকে। এমনকি বেপাড়ার পেৎকাও দেখতে এসেছিল ওকে, একটা নানান নকশা কাটা ছড়ি উপহার দিয়ে গেছে। বলেছে —'আমাদের রাস্তায় যখন খুশি আসবি যাবি মিশা, কেউ তোর গায়ে আঁচড়ও কাটবে না।' কিন্তু মিশা ভাবছে পলেভয় এল না কেন। ওর মনে পড়ে গেল বারান্দায় বসে পলেভয়ের কাছে ও গল্প শুনত, দূর সমুদ্রের গল্প, মহাসমুদ্র আর চলমান পৃথিবীটার কথা। মিশা ভাবছিল একছুটে হাসপাতালে গিয়ে পলেভয়কে দেখে আসবে সে। কিন্তু তার আগে পলেভয়ই এল ওর সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তা থেকে ওর ভরাট গলার উচ্ছ্বাস শোনা যেতেই বুকটা উত্তেজনায় দুর দুর করে ওঠে ওর। উঁচু বুট আর ফৌজি টুপি পরে এসেছে পলেভয়। বাইরের রোদ ঝলমলে তাজা ভাবটা যেন ও সঙ্গে করে নিয়ে এল মিশার অন্ধকার ঘরে, একরাশ গ্রীষ্মের সুবাসে ছেয়ে গেল চারদিক। বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটা পলেভয়ের শরীরের চাপে আর্তনাদ করে উঠলেও সামলে নিল কিছুটা। হেসে ফেলল দুজনেই।

— 'তারপর, কেমন আছ হে মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ। শিগগিরই উঠে পড়বে তো?'

মিশা হেসে চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'মা বলেছে কাল বাইরে যেতে দেবে।'

— 'শুনে খুশি হলাম। তা দুনম্বরটাকে মোক্ষম ল্যাং মেরেছিলে কিন্তু। খুব বিপদ থেকে বেঁচেছি। তোমার কাছে ঋণ রইল হে, লড়াই থেকে ফিরে সেই ঋণ শোধ করে দেব।'

— 'লড়াই থেকে! আমাকে সঙ্গে নিন না। বলুন, সঙ্গে নেবেন।'

— 'তার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমাদের ফৌজি ট্রেনে বাখ্‌মাচ জংশন পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকে মস্কো পাঠিয়ে দেব। ঠিক আছে।'

— 'শুধু বাখ্‌মাচ পর্যন্ত', হতাশ গলায় বলে মিশা।

— 'আরে এখনই দুঃখ করার কী হল। বড় হয়ে অনেক বড় লড়াই লড়তে পারবে, যত খুশি। যাকগে, বল তো ছোরাটা কীভাবে পেলে।'

লজ্জায় লাল হয় মিশার মুখ।

সেটা লক্ষ্য করে পলেভয় বলে, 'আরে বলেই ফেল না, খেয়ে ফেলব না তোমাকে আমি।'

— 'হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিল, তাই বের করে দেখছিলাম। কিন্তু দিদিমা সামনে ছিল বলেই আর লুকিয়ে ফেরৎ রাখতে পারিনি। নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই ছোরাটা সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

— 'আর কেউ কি জানে ছোরাটার কথা?'

— ' না তো, কাউকেই বলিনি আমি। আচ্ছা নিকিৎস্কি ছোরাটা খুঁজছে কেন বলুনতো।'

পলেভয় সরাসরি জবাব দিল না কথাটার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'তোমাকে 'রানি মারিয়া' জাহাজটার গল্প বলেছিলাম না, মনে আছে?'

— 'হ্যাঁ, খুব মনে আছে।'

— 'তাহলে শোন, নিকিৎস্কি ছিল ওই জাহাজের একজন লেফটেনেন্ট। খাঁটি বদমাশ যাকে বলে ও ছিল তাই। জাহাজটাতে বিস্ফোরণ ঘটার আগে নিকিৎস্কি জাহাজেরই একজন অফিসারকে খুন করেছিল, বিস্ফোরণের মিনিট তিনেক আগে। সেই ঘটনার আবার একমাত্র সাক্ষী ছিলাম আমি। অফিসারটিকেও আমি চিনতাম না। তবে ঘটনাটা ঘটার সময় আমি কাছেই ছিলাম। নিকিৎস্কির সঙ্গে আমার নিজের কিছু বোঝাপড়া করার ছিল। আমি ওদের ঝগড়া শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় অফিসারটি পড়ে আছে আর নিকিৎস্কি একটা স্যুটকেসের ভেতর থেকে ছোরাটা টেনে বের করছে। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল বটে কিন্তু গুলিটা আমার গায়ে লাগল না। আমাদের দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হল ঠিকই, কিন্তু তেমন কিছু ঘটার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জাহাজটা। তারপর পর পর বিস্ফোরণ ঘটে যেতে লাগল। ছোরাটা আমার হাতে, ছোরার খাপটা নিকিৎস্কির কাছে, ততক্ষণে সে উধাও হয়ে গেছে। বিস্ফোরণে জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল। আমি আহত হয়ে হাসপাতালে ছিলাম বেশ কিছুদিন। তারপর তো দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল গৃহযুদ্ধ। নিকিৎস্কি ততদিনে শ্বেতরক্ষীদের সর্দার হয়েছে। আমার নাম শুনে রেভস্ক আক্রমণ করেছিল ও। ছোরাটা ওর খুবই দরকার বোঝা যাচ্ছে। সে আর কী করা যাবে। লড়াই তো আগে থামুক, তারপর দেখা যাবে।' কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল পলেভয়। ধড়মড় করে উঠে বলল, 'আরে কথা বলতে গিয়ে কতটা সময় কেটে গেল। মাকে বল সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। দিন দুয়েকের মধ্যেই আমরা রওনা হব, বুঝলে।' মিশার ছোট্টহাতে একটু আদরের চাপ দিয়ে পলেভয় চলে গেল।

১০.

ছাড়াছাড়ি

স্টেশনে থেমে থাকা ফৌজি ট্রেনটা দিনের মধ্যে কতবার যে মিশা আর গেঙ্কা এসে দেখে যাচ্ছিল তার হিসেব নেই। মালগাড়ির পাটাতনে ফৌজিরা বিছানাপত্তর পেতে নিয়েছে। ওই গাড়িতেই রয়েছে ঘোড়ার আস্তাবল। যাত্রীদের জন্য কামরার নীচে দুটো লোহার বাক্স ওরা আবিষ্কার করল। একটা বাক্সতে জম্পেস হয়ে বসে মিশা গেঙ্কাকে বলল, 'দেখছিস কেমন খাসা জায়গা। ঘুমোন, শোওয়া, বসা সবই নিজের মত করে করা যাবে। একটা তো রাত্তির, সকালেই আমাদের কাছে উঠে আসবি।' গেঙ্কা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে, 'ছোট বোনটাকে ফেলে কী করে আসি বলত।' মিশা ঠাট্টা করে, — 'দূর, তিন বছর তো ওর বয়স, থোরাই কেয়ার করবে তুই যাচ্ছিস না থাকছিস। গেলে বরং কত মজা হবে বলত। মস্কোতে যেতে পারবি। চৌখস সব বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে তোর আলাপ করিয়ে দেব। পিয়ানো বাজাতে পারে, নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে নাটক করতে পারে। ওখানে সার্কাস আছে, আর্ট সিনেমা হল আছে। তবে তুই যদি যেতে না চাস তাহলে যাস না, এসব কিছুই দেখতে পাবি না, ভেবে দেখ।'

গেঙ্কা মনস্থির করে ফেলে, 'ঠিক আছে যাব আমি।'

মিশা খুশি হয়, বলে, 'হ্যাঁ, এই তো চাই। বাখ্‌মাচ থেকে চিঠি লিখে দিস যে মস্কো যাচ্ছিস, ওরা যেন চিন্তা না করে।' ট্রেনটার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে ঠায় হাঁটাহাঁটি করতে থাকে। একটা কামরায় লেখা — 'সদর দপ্তর'। কামরাটার গায়ে সাঁটা রয়েছে অনেকগুলো পোস্টার। মিশা পোস্টারগুলোর অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করে গেঙ্কাকে। — 'বুঝলি ওই মুকুট আর জোব্বা পরা লোকটা হচ্ছে জার। সাদা কুর্তা গায়ে লোকটা হল পুলিসের সার্জেন্ট। খড়ের টুপি, চশমা পরা মেনশেভিক দলেরও একজন রয়েছে আর ওই তিন মাথাওয়ালা সাপের চিত্র দিয়ে বোঝান যাচ্ছে দেনিকিন, কলচাক, আর ইয়ুদেনিচ নামের তিনজন সেনাপতিকে।'

পোস্টারে আঁকা আর একটা ছবি দেখিয়ে গেঙ্কা জিজ্ঞাসা করে, 'ও লোকটা কে?' ছবিটায় একটা লোক মাথায় টপ হ্যাট, মোটা ভুঁড়ি, শিকারী বাজের মতন বাঁকা ঠোঁট, লোকটা বসে আছে সোনার বস্তার ওপর। ওর লম্বা লম্বা নখ দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। মিশা বকুনির সুরে ধমকে ওঠে, 'ওটা একটা পুঁজিপতি, চিনতে পারছিস না নাকি। ওরা ভাবে টাকা দিয়ে দুনিয়া কিনে নিতে পারে।'

— 'আর ওই আঁতাত কথাটার মানে কী।'

— 'একই কথা। পুঁজিপতিদের জোট। সবাই একজোট হয়েছে ওরা।'

— 'আর আন্তর্জাতিক কথাটা? ওই যে ছবিটা, গোটা পৃথিবীটা শেকল দিয়ে বাঁধা, আর একজন মজুর হাতুড়ি দিয়ে সেই শেকলটা ভাঙছে।'

— 'হ্যাঁ, এটা একটা প্রতীক। দুনিয়ার সব মজুররা মিলে বানিয়েছে এই 'আন্তর্জাতিক'। ওই মজুরটা হল 'আন্তর্জাতিক', আর ওই শেকলটা হল 'আঁতাত'। শেকলটা ভেঙে ফেললেই দুনিয়ার সব মজুররাই মুক্ত হবে।'

কয়েকদিন পেরোতেই ওদের যাওয়ার দিন এল। গাড়িতে সব জিনিসপত্র তোলা হল। দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে মা। দাদামশাই পড়েছেন ফ্রককোট, দিদিমার গায়ে সেই তেলঝোল মাখা ড্রেসিং গাউন — ওদের দুজনকে যেন আরও বুড়ো দেখাচ্ছে, মুখের কোঁচকানো চামড়া চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। নস্যি নেওয়ার ফাঁকে চোখের জল ছাপিয়ে দেখা যাচ্ছে দাদামশাইয়ের নির্মল হাসি। তিনি শুধু বলছেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস, সব ঠিক হয়ে যাবে।' একটা স্যুটকেসের ওপরে বসে মিশা গাড়িতে দুলুনি খেতে খেতে চলল স্টেশনে। পাড়া ছাড়াতেই মিশার চোখে পড়ল তিনটি উইলো গাছে ঘেরা ওদের কাঠের বাড়িটা, যার খড়খড়িগুলো সবুজ।

১১.

ফৌজি ট্রেন

ট্রেনের জানলায় কাচে মুখ গুঁজে বসে থাকে মিশা। বাইরে অন্ধকার, ছোট ছোট তারা ফুটেছে আকাশে। স্টেশনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আবছা কয়েকটি বাতি। স্টেশন জুড়ে ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁস শব্দ, গাড়ি জুড়বার ঘটাং ঘটাং শব্দ, গার্ড আর ইঞ্জিন বরদারদের ছোট ছোট আলো নিয়ে ছোটাছুটি করা — সব মিলিয়ে একটা অপার রহস্যময় পরিবেশ, কেমন যেন একটা চাপা উদ্বেগ চেপে বসে আছে সকলের ওপরে। জানলার কাচে যত জোরে মুখ চেপে ধরছে সে, তত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাইরের সবকিছু। ঘটাং করে একটা শব্দ তুলে ট্রেনটা পেছনের দিকে চলল একটু। তারপর আর একবার ঝাঁকুনি দিয়ে সশব্দে ছুটে চলল সামনে। ক্রমে স্টেশনের বাতিগুলো পিছনে চলে গেল, মেঘের আড়াল থেকে ঝপ করে বেরিয়ে এল চাঁদ। একটা চলমান ফিতের গতিতে সব পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে ট্রেন। বিদায় রেভস্ক, মনে মনে বলল মিশা।

রাত্তিরে মিশা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল একবারে সকালে। ট্রেনটা তখন থেমে গেছে। ঘুম ভাঙতেই মিশা লাফিয়ে নামল প্ল্যাটফর্মে, গেন্কা কেমন আছে কে জানে। গাড়ির নীচের বাক্সটার দিকে ছুট লাগাল মিশা। একটা স্টেশনের সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। একটা কামরার সামনে ঝিমোচ্ছে একজন সান্ত্রী, তাছাড়া গোটা জায়গাটাই জনশূন্য। গাড়ির দেয়ালে দেয়ালে গুঁতো মারছে

ঘোড়াগুলো, তার শব্দ। বাক্সটার গায়ে আঙুল দিয়ে টোকা মারল মিশা, বলল, 'এই গেঙ্কা, বেরিয়ে আয় এখন।' কিন্তু কোথায় গেঙ্কা, বাক্সটা খালি। অবাক কাণ্ড, কোথায় গেল গেঙ্কা। হঠাৎ বিউগিল বেজে উঠল। সারা স্টেশন জুড়ে হই হুল্লোর লেগে গেল। মালগাড়ি থেকে সৈনিকরা লাফিয়ে নেমে হাত মুখ ধুতে লাগল। বাসনকোসন কেতলি নিয়ে সবাই ব্যস্ত। বাতাসে পরিজের গন্ধ ভেসে এল। এ ওকে ডাকছে, সে তাকে ডাকছে — ওর মধ্যেই সবাই ট্রেনের সামনে দুলাইন করে দাঁড়াল। নাম ডাকা হবে সবার।

সৈনিকদের জীর্ণ মলিন পোষাক। রং বেরঙের টুপি — কোনওটা জাহাজি, কোনওটা ঘোড়সওয়ার টুপি, আবার কোনওটা ছাই রঙের পদাতিক টুপি, আবার কেউ পরেছে কসাকদের গোল লোমের টুপি। পায়ে কারও উঁচু বুট, কেউ পরেছে ফেল্ট বুট, গালোশ, কেউবা জুতো, কারও আবার জুতোই নেই, খালি পা। সৈনিক রয়েছে, জাহাজিরা রয়েছে, মজুর রয়েছে, চাষীও আছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব বুড়ো, জোয়ান, বয়স্ক, নাবালক — সবাই। যে কামরাটার সামনে 'সদর দপ্তর' লেখা আছে তার সামনে যেতেই লক্ষ্য করল মিশা যে গেঙ্কা একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। টেবিলে ফৌজি একজন বসে। উর্দিটার আড়াআড়ি বেল্ট বাঁধা, লাল ডোরাকাটা, মুখে পাইপ। মাঝেমাঝেই থুতু ফেলছে গেঙ্কার পাশ ঘেঁষে এমনভাবে যাতে গেঙ্কা চমকে চমকে উঠছে যেন ওকে কেউ গুলি করছে। লোকটা গেঙ্কাকে জিজ্ঞাসা করছে, — 'নাম কী।' — 'পেত্রোভ।' — 'ঠিক বলছিস তো।' — 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন এটাই আমার নাম।' আবার শুরু থেকে জেরা করতে থাকে লোকটা গেঙ্কাকে। মিশা বুঝল গেঙ্কা গ্রেপ্তার হয়েছে। ভাবামাত্র একলাফে ছুটে গেল পলেভয়ের কাছে। খোলা গাড়িতে কামানের তদারকি করছিল পলেভয়। একদল অফিসারের সঙ্গে। মিশা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'সের্গেই ইভানোভিচ, গেঙ্কাকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে। আমাদের সঙ্গেই তো মস্কো যাচ্ছিল। ওকে ছাড়িয়ে দিন না।'

পলেভয় অবাক হয় শুনে, 'সে কী। কে আবার গেঙ্কাকে গ্রেপ্তার করল।'

— 'ওই তো ওখানে, সদর দপ্তরে। নীল ঘোড়সওয়ারি পাতলুন পরা একজন।'

অন্য অফিসারদের সঙ্গে চোখাচোখি করে হেসে ফেলল পলেভয়। একজন অফিসার হো হো করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ত্তিওপা অফিসার বটে।'

পলেভয় বলল, 'ঠিক আছে, চল দেখি। হয়তো আমার কথা শুনে ছেড়ে দেবে।'

গেঙ্কাকে জেরা করছিল যে, সে অফিসারদের আসতে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। পাইপ পকেটে গুঁজে জোর সেলাম করে পলেভয়ের সামনে কাঠ

হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'কমরেড কম্যান্ডার। রিপোর্ট করছি। সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছি। গাড়ির নীচে বাক্সে লুকিয়েছিল। জেরায় কবুল করেছে যে ওর পদবি পেত্রোভ, নাম গেন্নাদি, বাবা মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে মস্কো যাচ্ছে। বাবা ইঞ্জিন ড্রাইভার। অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেছে, চারটে খালি কার্তুজ। ঘুমোন অবস্থায় গাড়ির নীচের বাক্স থেকে হাতে নাতে ধরা পড়েছে।' রিপোর্ট করেই আবার অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায় সে। সবাই ওর চারপাশে মস্করা করছে যে সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই।

চোখ পাকিয়ে পলেভয় জিজ্ঞাসা করে, 'গাড়ির নীচে লুকিয়েছিলে কেন?'

— 'মস্কোতে যাব বলে, মিশা জানে।'

পলেভয় বলল, 'যাকগে। সেসব আমি দেখে নিচ্ছি। স্তিওপা, যাও তো সার্জেন্টকে বল আমার কাছে আসতে।' স্তিওপা আদেশ পেয়েই ছুট লাগাল একটা।

এবারে ছেলেদের তাকিয়ে পলেভয় বলে, 'যাও তোমরা এখন। কুইক মার্চ।' গেঙ্কা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে গেল। মিশা একটু অপেক্ষা করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করে, 'ওই লোকটা কে?'

পলেভয় হাসল, 'ওরেব্বাস, ও এক জাঁদরেল লোক। স্তেফান ইভানভিচ রেজনিকভ। সদর দপ্তরের চিফ মেসেঞ্জার বয়।'

১২.

রেলগার্ডের গুমটি ঘর

নিজ্‌কভ্‌কাতে ট্রেনটা আটকে গেল দু সপ্তাহ। গেঙ্কা জানিয়ে গেল, — 'বাখ্‌মাচ হয়ে যাওয়া বন্ধ। ইঞ্জিন নেই।' বাবা রেলে কাজ করে বলে গেঙ্কাও নিজেকে রেলগাড়ি সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল বলে মনে করে। ফৌজি ট্রেনে গেঙ্কা এখন নিয়মমতনভাবে যাত্রী হয়ে গেছে। বাবা অবশ্য খুঁজে ঠিক বের করেছিল ওকে। কষে কান মলে দিয়েছিল গেঙ্কার। রেভস্কে নিয়ে যেতে চাইলেও পলেভয় আর মিশার মায়ের জন্য পারেনি। পলেভয় নিজের কামরায় গেঙ্কার বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কীসব বোঝাল কে জানে। বাবা সেখান থেকে ফিরে বললেন, না গেঙ্কাকে এখন আর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করছেন না তিনি। পরের দিনই গেঙ্কার জন্য কিছু জামা কাপড় দিয়ে গেলেন। মস্কোর পিসির নামে লেখা একটা চিঠিও দিয়ে গেলেন। ভালভাবে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে গেঙ্কাকে বুঝিয়ে, পিসির কাছে পৌঁছন পর্যন্ত সব দায়িত্ব মিশার মায়ের রইল এইরকম কথা আদায় করে তিনি চলে গেলেন।

ফৌজি ট্রেনটা কবে যে আবার চলতে শুরু করবে কেউই ঠিক বলতে পারছে না। লাল ফৌজের সৈন্যরা রেললাইনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করতে লাগল। সেই আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে সন্ধ্যা হলেই। কামরার মধ্যে থেকে কেউ বাজায় অ্যাকর্ডিয়ান, কেউ বালালাইকা, কেউ বা গায় লোকসঙ্গীত। সৈনিকরা কাঠের স্লিপারে, রেললাইনে কিংবা স্রেফ মাটিতেই বসছে। রাজনীতির আলোচনা করছে। রেলওয়ের গোলমাল কিংবা ভগবানের আলোচনা ছাড়া সবচেয়ে বেশি যে আলোচনায় মশগুল থাকছে ওরা সেটা হল খাদ্যবস্তু নিয়ে রসাল আলোচনা। খাঁবারে টান পড়েছে বেশ ভালরকমই। একদিন মিশা গেস্কাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গল থেকে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করবে বলে খুব ভোরে রওয়ানা হল, শুধু ওরা দুজনই। তার কারণ স্টেশন থেকে বন পাঁচ ভার্স্ট দূরে। ওরা ভেবেছিল সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ফিরে আসবে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেল সম্পূর্ণ অন্যরকম। অচেনা জায়গা। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে ওরা এগোচ্ছিল। মাঝখানে কে একজন সম্পূর্ণ ভুল পথ বাতলে দেওয়ার জন্য পাঁচ ভার্স্টেরও অনেক বেশি পথ হাঁটার পর ওরা বুঝতে পারল যে রাস্তা ভুল হয়েছে। যাই হোক শেষমেশ বনে গিয়ে পৌঁছল ওরা। ঝুড়ি বোঝাই করল ব্যাঙের ছাতায়। যখন ফেরার জন্য তৈরি হল তখন ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে এল। আর সেই সঙ্গে গোটা আকাশ ঢেকে গেল মেঘে, বৃষ্টি নামল অঝোরে। ওরা রেল লাইনে পা ফেলে পা ফেলে ফিবতে লাগল। মিশা বলল, 'দূব ছাই, রেলের স্লিপারগুলো এমন এলোমেলোভাবে পাতা কেন কে জানে। ঠিকমত পা ফেলে চলাই মুশকিল। এর চেয়ে বরং রাস্তা দিয়ে চলাই বেশি সুবিধের।' ওদের সামনে এখন একটা ধূ ধূ মাঠ। এপার ওপার জুড়ে একটা বাঁধ, বাঁধেব ওপরে রেললাইন। ঝাপসা বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হঠাৎই নজরে পড়ে দূরেব একটি গ্রাম। সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল গরুর হাম্বা ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কুয়োর ধারে হাঁসকলের কাঁাচ কাঁ্যাচ শব্দ। আসলে বৃষ্টির মধ্যে দূরের কোনও জনপদ চোখে পড়লে এই সব শব্দই সকলের কানে বাজতে থাকে। ওরা দুজনে হাঁফাতে হাঁফাতে আর বৃষ্টিতে পুরো ভিজে যখন রেলগুমটি ঘরটায় পৌঁছাল তখন ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। সেখান থেকে নিজ্‌কভ্‌কা আরও প্রায় আড়াই ভার্স্ট দূরে। গেস্কা বলল, 'চল না মিশা, ভেতরে যাই।'

— 'কেন রে। শুধু শুধু সময় নষ্ট।'

— 'বৃষ্টিতে ভিজে কী লাভ। রাতটা এখানে কাটিয়ে সকাল সকাল চলে যাব না হয়।'

— 'না রে মা চিন্তা করবে। তাছাড়া ট্রেনটাও তো ছেড়ে দিতে পারে তাই না!'

— 'দূর, এক সপ্তাহের আগে ট্রেন ছাড়ল আর কী! আর ছেড়েও যদি যায়

তাহলেও বাখমাচে যাওয়ার এটাই তো রাস্তা। আমরা ঠিক ধরে ফেলব। অন্তত এক গ্লাস জল তো খাওয়া যাবে, চল না।'

দরজায় ঘা দিল ওরা। বেড়ার কাছে বেঁধে রাখা একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। দরজার ওপাশ থেকে মেয়েলি গলায় কে জিজ্ঞাসা করল, 'কে, কী দরকার।'

গেঙ্কা টি টি করে বলল, 'ও পিসিমা, দু গ্লাস জল শুধু চাই আমাদের।'

কুকুরটা আরও ক্ষেপে উঠেছে। শেকল টানাটানি করছে। টুক করে খিল খোলার শব্দ শোনা গেল। সরু দরজা দিয়ে ওরা দুজন মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল। চুল্লির ধারে কে একজন উশখুশ করে নড়ে উঠল। ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে, মাত্রিওনা, কে ওখানে।'

গা চুলকে হাই তুলে দরজা খুলে দেওয়া মহিলাটা বলল, 'জানি না, দুটো ছেলে, জল চাইছে।' তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে বেরিয়েছিলে বুঝি।'

— 'হ্যাঁ, পিসিমা, তাই।'

— 'কোথায় যাবে তোমরা?'

— 'নিজ্‌কভ্‌কা।'

— 'সে তো অনেকটা দূরে। এই বৃষ্টিতে, রাত্তিরে ঘুরে বেড়াতে ভয় করে না?'

গেঙ্কা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমিও তাই বলছিলাম পিসিমা, আজকের রাতটা একটু থাকতে দেবেন? কাল সকালে উঠেই চলে যাব।'

— 'তা থাকো না, অঢেল জায়গা রয়েছে। যেরকম জোর বৃষ্টি পড়ছে, তোমরা রাস্তাই দেখতে পাবে না। রেলে কাটাও পড়তে পার, তাছাড়া অনেক গুণ্ডা বদমাস তো ছেয়ে রয়েছে চারদিকে।' বলে একটা বড় ভেড়ার লোমের কোট ওদের দিয়ে বলল, 'নাও, শুয়ে ঘুমিয়ে পড ভোর পর্যন্ত, তারপর স্টেশনে চলে যেও।'

দরজা বন্ধ করে, মোমবাতি নিভিয়ে চুল্লির ধারে উঠে গেল মহিলাটি। ভেড়ার চামড়ার কোটে নিজেদের জড়িয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

১৩.

ডাকাতের দল

ঘুমের মধ্যে মিশা এলোমেলো স্বপ্ন দেখে। একটা কালো ঘোড়ার বাচ্চা যেন ছোট্ট লেজটা দোলাতে দোলাতে খেলা করছে, চাট মারছে, তারপর মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে গেল খাড়া পাহাড়ের নীচে। সবাই হেসে উঠল — পলেভয়, দাদামশাই, দিদিমা, শ্লাভা, নিকিৎস্কি — সবাই। ঘোড়ার বাচ্চাটা একটু দাঁড়াল, মাথা নিচু করল, তারপর আবার ছুটে চলে গেল মাঠের ভেতর দিয়ে। মিশা দেখল হঠাৎ

সেটা বদলে হয়ে উঠল বিশাল একটা ঘোড়া; উঁচু পাহাড়টার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে সেটা উঠে যেতে লাগল ওপরে। উঠতে উঠতে দূর থেকে একটা কালো মাছির মতন দেখাচ্ছে ওটাকে। আর নিকিৎস্কি ওর চাবুকের হাতলটা একটা গাছের গায়ে ঘষছে আর চিৎকার করছে, 'ধর তো, ঘোড়াটাকে ধরে ফেল।' ঘোড়াটাও জোরে ছুটতে পারছে না। হঠাৎ ওটার পা হড়কে যায়, আর অতল খাদের মধ্যে পড়ে যায় ঘোড়াটা ভীষণ ছটফট করতে করতে। শেষ পর্যন্ত একটা বালতি ঠং ঠং করতে করতে এসে পড়ে মিশার পায়ের কাছে। তারপর চুপ করে যায়। বাড়িটার ভেতর থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসে, 'ঘোড়াটাকে ধর।' তারপর গালাগালি দিয়ে কেউ বলল, — 'চুলোয় যাক, বালতিটা ওখানে কে রেখেছে।' কে যেন একটা দেশলাই জ্বালল। আবছা দেখা গেল ঘোড়ার লোমের জোব্বা পড়া একটা লম্বা লোক। উঠানে কুকুরটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে, ঘোড়াগুলোও চিহিঁ চিহিঁ শব্দ করছে। লোকটা চাবুক হাঁকিয়ে কোণের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওরা কারা?' রেলগার্ড ভুরু কুঁচকে উত্তর দিল — 'ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে এসে বৃষ্টি আর অন্ধকারে পড়ে গিয়েছিল, স্টেশন থেকে এসেছিল। তবে ওরা তো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে, 'চোপ।' তারপর ওদের কাছে এসে ভালভাবে লক্ষ্য করতে থাকে ওদের। ওরা ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। তারপর লোকটা সরে গেছে মনে হতেই মিশা আড়চোখে একটা চোখের একটু খুলে দেখে, জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আছে স্বয়ং নিকিৎস্কি। ভয়ে কাঠ হয়ে যায় মিশা।

গার্ডটার দিকে এগিয়ে গেল নিকিৎস্কি। ধমকের সুরে বলল, 'নিজ্‌কভ্‌কার ইঞ্জিন কি চলে গেছে এর মধ্যে?'

— 'হ্যাঁ।' গম্ভীরভাবে জবাব দিল রেলের বুড়ো গার্ডটা।

— 'বুড়ো শয়তান, আমাকে ঠকাতে চাইছিস।' বলে বুড়োর কলার খামচে ধরল সে। বুড়োটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয় আর কী। তার মধ্যেই সে উত্তর দেয়, 'পাপ, পাপ করব না আমি।'

— 'পাপ করবি না, না। এক ঘন্টার মধ্যে ট্রেনটা পাস করার কথা, আর সেকথা তুই বলিসনি আমাদের কাছে।' বলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বুড়োটাকে কয়েকবার মুখে বুকে মেরেই ছুটল বাইরের দিকে। বুড়োটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। বাইরে ঘোড়ায় চড়ার আওয়াজ উঠল, ছুটে গেল ঘোড়াগুলো, তারপর আবার চুপচাপ চারিদিকে। শুধু কুকুরটাই বিকট চিৎকার করতে থাকল।

আহত বুড়োটাকে ঘিরে বাড়ির মেয়েছেলে দুজন কেঁদে কেটে অস্থির। মিশার মাথার মধ্যে একটা কথাই ঘুরছে। এক ঘন্টার মধ্যে ট্রেনটা পাস করার কথা। ওদের ট্রেনটা নয়তো। হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল মাথাটা। ডাকাতগুলো ওই ট্রেনটার জন্যই ওঁৎ পেতে বসে নেই তো! তাহলে কী হবে। পলেভয়কে খবর

দেবে কীভাবে। একঘন্টার মধ্যে নিজ্‌কভ্‌কার স্টেশনে পৌঁছনো তো অসম্ভব ব্যাপার। লাফিয়ে উঠল মিশা, ঠেলে জাগিয়ে তুলল গেঙ্কাকে। বলল, 'এই ওঠ। ডাকাতরা ফৌজি ট্রেনটাকে উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে।' বলেই দুজনে চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। ছুটতে লাগল রেল লাইন বরাবর স্টেশনের দিকে। একটু দূরে যেতেই ওরা দেখল কালো কালো কয়েকজন মিলে রেললাইনে কী যেন সব করছে। বৃষ্টিটা থেমেছে। মাটি থেকে একটা সোঁদা গন্ধ উঠছে। পাতলা হয়ে আসা মেঘের মধ্য থেকে পূর্ণিমার চাঁদের ছোঁয়ায় চকচক করছে রেলের লাইন। কুকুরটার বিষম ভুতুড়ে কান্নায় ছেলেদুটোর গা যেন শিরশির করে উঠছে। ভয়ে আতঙ্কে ওরা আরও জোরে ছুটতে থাকে।

রেল বাঁধের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটিতে ওরা কাজ হাসিল করছে। পাশেই গভীর খাদ। তার ওপরে ছোট্ট পুল। খাদটার পাশে ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঘোড়ার চিহিঁ চিহিঁ ডাক, ডালপালার মড় মড় শব্দ আর চাপা গলার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। বাঁধের ঢাল থেকে নিঃশব্দে ওরা নেমে গেল নীচে, ঝোপের পাশ দিয়ে প্রাণপণে ছুট লাগাল। শীতল, ঠাণ্ডা ভোর নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দিগন্ত সরে সরে গিয়ে আশপাশের সবকিছু ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রচণ্ড জোরে দৌড়তে দৌড়তে ওরা একসময়ে স্টেশনের আলো দেখতে পেল। ওরা এতজোরে ছুটছে যে কাঁকরে, পাথরে পা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে কানের পর্দা যেন ফেটে যাবে মনে হচ্ছে। হঠাৎ ওরা শুনতে পায় ইঞ্জিনের হুইস্‌লের শব্দ। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর আবার মরীয়া হয়ে ছুটতে থাকে সামনে। ইঞ্জিনের বাঁকা লোহার হাতল — দাঁড়গুলোর পাশ দিয়ে সাদা সাদা বাষ্পের কুণ্ডলী উঠছে। মিশা পাগলের মতন তীরের বেগে ছুটে গিয়ে একটা হাতল ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই, একটা ভারী হাত ওর কাঁধটা চেপে ধরে। সামনে দাঁড়িয়ে পলেভয়। কড়া গলায় পলেভয় জিজ্ঞাসা করে — 'সারাদিন কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ তোমরা?'

মিশা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'সের্গেই ইভানভিচ, নিকিৎস্কি ওখানে।'

পলেভয় চমকে উঠে বলে, 'কোথায়, কোথায়!'

— 'ওখানে, রেলগার্ডের গুমটিঘরে। এখন সবাই খাদের পাশে এসেছে।'

— 'খাদের পাশে!'

— 'হ্যাঁ।'

এক সেকেন্ড কী ভেবে নিল পলেভয়। তারপর বলল, 'ও, তাহলে এই মতলব কষছে ওরা। আর আমরা ওদের অপেক্ষায় বসে আছি। ঠিক আছে, সাবাস স্কাউটরা। এবারে চটপট চলে যাও নিজেদের গাড়িতে, আর খবরদার গাড়ি ছেড়ে বেরিও না কোথাও। নাহলে তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখে দেব কিন্তু।'

১৪.

বিদায়

লড়াই খতম হতে দেরি হল না। ডাকাতদের বেশির ভাগই মারা গেল। পালাতে পারল দুএকজন। ছাড়া পাওয়া ঘোড়াগুলো সব মাঠের মধ্যে ছোটাছুটি করতে থাকে। সৈনিকরা জিন রেকাব খুলে তক্তা পেতে ঢুকিয়ে নিল ঘোড়ার ওয়াগনে। রেলের লাইন দ্রুত মেরামতি করে ট্রেন আবার চলল। বাখমাচ জংশনে পৌঁছে যাত্রীবাহী কামরাটা ফৌজি ট্রেন থেকে কেটে আলাদা করা হল। মস্কোগামী কোনও ট্রেন এলে তার সঙ্গে জুতে দেওয়া হবে কামরাটাকে। আর ফৌজি ট্রেনটা যাবে সোজা যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে।

ফৌজি ট্রেনটা ছেড়ে যাওয়ার আগে পলেভয় ডেকে পাঠাল মিশাকে। একটা গুদামঘরের ছায়ায় ওরা দুজনে বসল। মিশা মাটিতে, আর খালি একটা প্যাকিং বাক্সের ওপরে পলেভয়। দুজনে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ, যেন যে যার নিজের চিন্তাতেই বিভোর। কে জানে হয়ত ওরা দুজনেই একই বিষয় নিয়ে ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে পলেভয় মিশার দিকে তাকিয়ে হাসল।

— 'তাহলে মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ, বিদায় নেওয়ার সময় কী কথা বলবে বল।'

মিশা জবাব দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

— 'হ্যাঁ, মিশা, এবারে তো আমাদের বিদায় দিতে হবে। কবে যে আবার দেখা হবে কে জানে। তাই। এই দেখ ...।' বলে সেই ছোরাটা বের করে বাঁ হাতের তেলোর ওপরে রাখল পলেভয়। ছোরাটার কোনও অদলবদল ঘটেনি। একই রকম হলদে হয়ে যাওয়া বাঁট, আর সেটাকে ঘিরে ব্রোঞ্জের সেই সাপ। ডানহাত দিয়ে সাপের মাথার দিকে ছোরার বাঁটটা মোচড়াতে থাকে পলেভয়। সাপের শরীরের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে ঠেলে উঠতে লাগল বাঁটটা। তারপরই আলগা হয়ে বেরিয়ে এল। সাপ থেকে বাঁটটা আলাদা করে একটা টান দিতেই খুব পাতলা ধাতুর পাতে তৈরি একটা ছোট্ট নলচে বেরিয়ে এল। নলচেটোতে দুর্বোধ্য সব চিহ্ন। ফুটকি, ড্যাশ আর গোল গোল দাগ আঁকা। পলেভয় প্রশ্ন করে, 'এটা কি বলতে পার মিশা?'

— 'সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা,' একটু ইতস্তত করে বলে ফেলে মিশা।

— 'ঠিক। সাঙ্কেতিক লেখাই বটে। তবে এই লেখাটার অর্থ বুঝতে হলে দরকার ছোরাটার খাপটা, যার মধ্যে কিছু কিছু সমাধান সূত্র দেওয়া আছে। কিন্তু সেটা তো আবার নিকিৎস্কির দখলে। এখন বুঝলে নিকিৎস্কি কেন ছোরাটা হাতাতে চাইছে।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল মিশা। ধাতুর নলচেটা ঠিক জায়গায় ঢুকিয়ে বাঁটটাকে পাক দিয়ে দিয়ে ঠিক করে পলেভয় বলল, 'এটার জন্য একজনের মৃত্যু হয়েছে। তার মানে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে এর মধ্যে। আমি ভেবেছিলাম সমাধান করে ফেলব। কিন্তু এখন যা অবস্থা তা আর হওয়ার নয়। আবার ছোরাটাও সঙ্গে রাখা চলে না। বিশেষ করে লড়াইয়ের সময়। তাই বরং তুমিই রাখো ছোরাটা। নাও। যদি ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসি তাহলে নাহয় এটা নিয়ে নতুন করে ভাবা যাবে। আর যদি না ফিরি তাহলে এটাই তোমাকে আমার কথা মনে করিয়ে দেবে।' বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল পলেভয়। ছোরাটা নিল মিশা। চুপ করে আছে সে।

— 'আরে, চুপ করে আছ কেন। ভয় পেলে নাকি!'

— 'না, ভয়ের আর কী আছে।'

— 'তাহলে যখন তখন জিভ নাড়া বন্ধ রাখতে হবে তোমার। বিশেষ করে একজনের সম্পর্কে খুবই সাবধান।'

— 'কে, নিকিৎস্কি?'

— 'হ্যাঁ, তবে তুমি যে আবার এটার ব্যাপারে আছ, সেটা নিকিৎস্কি কল্পনাও করতে পারে না। কোনওদিন আবার তোমাদের দেখা হবে কী না সন্দেহ। আর একজন লোক আছে, তোমাদের গাঁয়ের, রেভস্কে। হয়ত তুমি তার সামনাসামনি পড়ে যেতে পারো। তাই সাবধানে থাকতে হবে কিন্তু তোমাকে। খুব সাবধানে।'

— 'লোকটা কে?'

প্রশ্ন শুনে মিশার দিকে তাকায় পলেভয়। — 'লোকটার নাম ফিলিন। তবে তুমি যে এই ব্যাপারে আছ সেটা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানতে পারে। লোকটা সম্পর্কে খুবই সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে।'

— 'ফিলিন, ফিলিন। এক ফিলিন তো মস্কোতে আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে।'

— 'তার পুরো নাম আর পদবিটা কি তুমি জানো?'

— 'না সেটা জানি না। তবে তার ছেলেকে চিনি। তার নাম ?রকা। ছেলেরা তাকে হাড়কিপটে বলে ডাকে।'

— 'ফিলিন তো রেভস্কের বাসিন্দা।'

— 'তা তো জানি না।'

— 'নামটা খুবই সাধারণ। রেভস্কের অর্ধেক লোকেরই ওই নাম বলে মনে হয়। আমার মনে হয় না লোকটা মস্কোতে আছে। কোনও দূর গাঁয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে বলেই আমার বিশ্বাস। তুমি তবু সবসময়েই খুব হুঁশিয়ার থাকবে। ওদের দলবলও খুব বিপজ্জনক, বুঝলে।'

— 'হ্যাঁ।' খুব আস্তে জবাব দিল মিশা।

পলেভয় ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। বলে, 'ভয় কি মিশা, তুমি তো যথেষ্ট লায়েক হয়ে উঠেছ দেখছি। যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তোমার। এখন শুধু মনে রেখো ...।'

বলতে বলতে পলেভয় উঠে দাঁড়াল। সেইসঙ্গে মিশাও।

— 'বুঝলে এখন শুধু মনে রেখো জীবনটা একটা সমুদ্দুরের মতন। যদি কখনও ভাবো যে শুধু নিজেরটা নিয়েই থাকবে সবসময়, তাহলে তোমার অবস্থা হবে ভাঙা ফুটো নৌকার মাঝির মতন। চিরটা কাল পাড়ের কাছেই থাকতে হবে। একই ডাঙার দিকে দিনরাত তাকিয়ে থাকতে থাকতে জীবন কাটাবে, আর ছেঁড়া পাৎলুন দিয়ে খালি ফুটোই ঢাকবে। আর যদি সব মানুষের জন্য বাঁচো তাহলে সেটা হবে প্রকাণ্ড জাহাজে পাল খাটিয়ে পাড়ি দেওয়ার মতন, তোমার সামনে খোলা সমুদ্রের ঢেউ, তোমার মনে সাহস। ঝড়ে বৃষ্টিতেও তোমার মন দুরদুর করবে না। তখন গোটা দুনিয়াটাই তোমার। তুমি দেখবে সেই সুন্দর জগৎ, তোমার সঙ্গীসাথীদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তুমি সেই জগৎকে দেখবে। প্রাণভরে উপভোগ করবে। বুঝলে? সাবাস ভাই।' বলেই মিশার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল পলেভয়। আবার হাসল। তারপর রেল লাইনের এবড়োখেবড়ো স্লিপারগুলোর ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে চলে গেল ওই উন্নত চেহারার সবল মানুষটা। কাঁধের ওপরে ছাই রঙের ফৌজি ওভারকোটটা ঝুলিয়ে ওর যাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগল তার ওভারকোট, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে ডাকতে চলে গেল।

ট্রেন ছাড়ার আগে সকলে জমায়েত হল একটা জায়গায়। স্টেশনে জড়ো হল শহরের বাসিন্দারা, ডিপোর মজুররা। মেয়েরা সূর্যমুখীর বীচি চিবোতে চিবোতে সার বেঁধে ঘুরে বেড়াতে লাগল স্টেশন জুড়ে। হাসল পল্টনদের দিকে তাকিয়ে। পল্টনরাও ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। পলেভয়ই শুরু করল সভার কাজ। সদরদপ্তর লেখা কামরাটার ছাদে টাঙানো, 'আর্ন্তজাতিক' প্রতীক আঁকা বিশাল ঢালটার একধারে দাঁড়াল সে। পলেভয় বলল, 'সোভিয়েত রাশিয়ার সামনে এখন খুব বড় বিপদ। পৃথিবীর সব পুঁজিপতিরা একজোটে আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করছে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। তবু একথা সত্যি যে সোভিয়েতের মজুর আর চাষীদের মিলিত শক্তি সমস্ত ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে শত্রুকে চূর্ণবিচূর্ণ করবে। আমাদের মাতৃভূমির আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়বেই।' এই বলে পলেভয় বক্তৃতা শেষ করতেই সবাই 'হুররে' করে চেঁচিয়ে সমর্থন জানাল ওকে। পলেভয়ের পরে বলতে শুরু করল একজন সাধারণ সৈনিক। সে বলল — 'সৈনিকদের সামনে রসদ যথেষ্ট নেই। শুধু অটুট মনোবল আর ন্যায্য উদ্দেশ্যের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসই তাদের অপরাজেয় করে তুলেছে।' ওর বক্তৃতাও

সবাই তারিফ করতে থাকে। গাড়ির ছাদে বসে মিশা আর গেঙ্কা দুজনেই খুব জোরে হাততালি দিতে থাকল, চিৎকার করে হুররে বলতে থাকল। সভা শেষ হলে ফৌজি ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। মালগাড়ির খোলা দরজাগুলোর সামনে লাল ফৌজের সৈনিকরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকল। কেউ বসে পা দোলাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তাদের ছেঁড়া জুতো আর ছেঁড়া পট্টি। আর সবাই গান গাইছে 'আন্তর্জাতিক'। গানে গানে গমগম করে ওঠে স্টেশনটি। ক্রমে সেই সুর ছড়িয়ে যেতে থাকল দিগন্তজোড়া স্তেপের মাঠে। সীমাহীন প্রান্তর পেরিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকল দূরে দূরান্তরে। সৈনিকদের দেখাদেখি স্টেশনের লোকজনরাও 'আন্তর্জাতিক' গানে গলা মেলাল। পরিষ্কার গলায় মিশাও গান ধরল। গাইতে গাইতে ওর সারা বুকটা যেন ভরে উঠল। শিরদাঁড়া জুড়ে গর্বের শিহরন জাগল, আবেগে গলা বুঁজে আসতে চাইল। চোখের জল আর ধরে রাখতে পারছিল না। আর ট্রেনটা ক্রমে ছোট হতে হতে তার লম্বা বাঁকা লেজ দুলিয়ে সবুজ স্তেপভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্ল্যাটফর্ম ক্রমশ ফাঁকা হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আকাশে মিটমিট করে তারা ফুটে উঠতে থাকে। কিন্তু মিশা নড়ল না সেখান থেকে। যেদিক দিয়ে ট্রেনটা মিলিয়ে গেছে, মিশা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেই দিকে। চকচকে জট পাকানো রেলের লাইনগুলো সেখানে একটা সরু ইস্পাতের রেখায় মিশে কুয়াশাভরা টিলার মতন হয়ে দিগন্ত ভেদ করে গেছে। মিশা চোখের সামনে দেখতে পায় লাল ফৌজের সৈনিকদের। ছাই রঙের ফৌজি ওভারকোট পরা পলেভয় আর সবল পেশিবহুল দেহের সেই মজুর — ওরা যেন ভারী হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে পৃথিবীর সব শেকলগুলিই ভেঙে ফেলছে।

দ্বিতীয় পর্ব

আরাবাত স্ট্রিটের উঠোন

১৫.

এক বছর বাদে

বারান্দায় চলাফেরার শব্দে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় মিশার। একবার চোখ খুলেই অবশ্য আবার চট করে চোখ বুঁজল। ওর ঘরে একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে, আশেপাশের উঁচু উঁচু বাড়ির ধার ঘেঁসে। ওই রোদের ফালিতে অসংখ্য ধুলোর কণা নেচে বেড়াচ্ছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখমুখ কুঁচকে গালিচার বাঘটাও ঘুমোচ্ছে অসাড়ে; বাঘটার মাথাটা ওর থাবার ওপরে রাখা। বাঘটা বুড়ো, জরাজীর্ণ। নেহাতই নিরীহ সন্দেহ নেই। রোদ্দুরের রেখাটা সরু হয়ে হয়ে ক্রমশ সরে আসে গালিচা ছেড়ে টেবিলের ওপরটাতে। মায়ের খাটের নিকেলের

অংশগুলোতে পড়ে রোদ ঝকমক করে ওঠে, তারপর সরে যায় সেলাইয়ের কলটায়, তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন মনে হয় কোনওকালেই বুঝি রোদ্দুর আসেনি এই ঘরে। ঝাপসা হয়ে যায় ঘরটা। একটা খোলা জানলা বেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। নীচের রাস্তায় ট্রামগাড়ি চলার আওয়াজ, ট্রামের ঘন্টা, মোটরের হর্ন আর ছেলেমেয়েদের হই হল্লার শব্দ। ফেরিওয়ালাদের হাঁক শোনা যায়, ছুরি কাঁচি শানওয়ালা, পুরনো কাপড়ের ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা যায়। সবকিছু মিলেমিশে বসন্তদিনের আবহাওয়া তৈরি করে ফেলে।

মিশা ঝিমোতে থাকে। ইচ্ছে হয় আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ছুটির প্রথম দিনেই নিত্যকারের রুটিনমতন ওঠার কোনও মানে হয় না। আজ ইচ্ছে করলেই সারাটা দিন সে কুঁড়েমি করে কাটিয়ে দিতে পারে। কী মজা।

মা একটা ইস্ত্রি হাতে ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ওপরে রাখা ভাঁজ করা কম্বল বিছিয়ে ওলটানো, সামোভারের আংটার ওপরে রাখেন ইস্ত্রিটা। মায়ের পাশে একটা চেয়ারে রয়েছে এক গাদা শুকনো খড়খড়ে কাচা কাপড়।

— 'ওঠ, মিশা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়।'

মিশা উত্তর দেয় না, চোখ বুঁজে থাকে। কিন্তু তাহলে কী হবে। ও ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে মা কী করে যেন সবসময় ধরে ফেলে। বিছানার কাছে এসে মা বলেন, 'আর ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকতে হবে না। উঠে পড়।' মায়ের হাত কম্বলের নীচে ঢোকা মাত্র মিশা হাঁটুজোড়া থুতনি অবধি গুটিয়ে নেয়। কিন্তু মায়ের ঠাণ্ডা হাতটা ঠিক ওর গোড়ালি ছুঁয়ে ফেলে। মিশা আর হাসি চাপতে পারে না। হি হি করে হাসতে হাসতে এক লাফে বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচে নামে।

চটপট গায়ে জামা চড়িয়ে ও ছুটল হাত মুখ ধুতে। রান্নাঘরের সাদা টাইলের মেঝেটা আবছা আলোয় চকচক করছে। মাঝে মাঝে ফেটে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়ার দাগ। গত শীতে জলের পাইপটা ফেটে যাওয়ার জন্য দেওয়ালে কালো কালো দাগ এখনও রয়েছে। অনেকদিন আগেই মিশা মনে মনে ঠিক করেছিল যে ঠাণ্ডা জলে যেমন করেই হোক গা হাত পা ধোবে প্রত্যেকদিন, অবশ্য শুরু করবেই স্কুল ছুটি হওয়ার দিন থেকে। কল খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলের ছুরি ওর কপালে মুখে এসে পড়তে লাগল। নাঃ, বড্ড ঠাণ্ডা জল। সারানোর জন্য ওদের ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল দুসপ্তাহ আগেই। হওয়ার কথা ছিল পয়লা জুন থেকে, হয়ে গেল আজ পনেরোই মে তারিখে। না, যা ঠিক করেছে সেই পয়লা জুন থেকেই ঠাণ্ডা জলে গা হাত পা ধোবে সে। মাথায় একটু জল ছিটিয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াল সে। তারপর আয়নায় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল নিজেকে। থুতনিটা ওর বিচ্ছিরি; একটু সামনের দিকে বাড়ানো হলে ভাল দেখাত, মনের জোরও হত খুব বেশি। জ্যাক লন্ডন তো তাই লিখেছেন। মিশার এখন মনের জোর বাড়ানো খুবই দরকার। এই তো কয়েক মিনিট আগেই ঠাণ্ডা জলে গা হাত

ধুতে পারল না। সবসময়েই কিছু করবে বলে মনে মনে ঠিক করলেও প্রত্যেকবারই ওই একই ব্যাপার। কথা ছিল ডায়েরিটা রোজ লিখবে। শুরুও করেছিল একটা ছোট নোটবইতে। কিন্তু প্রথম পাতার পর আর এগোতেই পারেনি। ধৈর্যেই কুলোয়নি। তারপর ওই ভোরবেলায় উঠে ব্যায়াম করার কথা ছিল। সেটাও দুচারদিন পরেই বন্ধ করে দিয়েছে। আর কতরকমের অজুহাত যে তৈরি করে মনে মনে তার কোনও হিসেবই নেই। আসল কথা হল কুঁড়েমি, স্রেফ আলসেমি, তা ছাড়া কিচ্ছু না। কথায় কথায় কাল হবে, কাল হবে, সেটাই বা কীরকম। সোমবার থেকে করব, মাসের প্রথম থেকে করব, ইস্কুলের নতুন টার্মটা শেষ হলেই শুরু করা যাবে, সে কত রকমের সব টালবাহানায় ঠেলে ঠেলে দেবেই ওই বার, ওই তারিখের ওপারেই। ভাবলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। মিশা মনে মনে নিজেকে বলে — 'তুমি একটা মিনমিনে ছোকরা, শিরদাঁড়া বলে তোমার কিচ্ছু নেই, এসব বন্ধ করার সময় হয়েছে এবার।' সামনের দিকে থুতনিটা ঠেলে দেয় মিশা। হ্যাঁ, এইরকম থুতনিই হওয়া দরকার, মনের জোরওয়ালা মানুষের এরকম থুতনিই দরকার। বরাবর দাঁতটা এইরকমভাবে চেপে রাখতে হবে, তাহলেই আস্তে আস্তে থুতনিটা এগিয়ে আসবেই।

টেবিলে ছাড়ানো আলুসিদ্ধ থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে। কালো রুটির দুটো টুকরো পাশের প্লেটে, সারাদিনের খাবার। নিজের টুকরোটা তিন ভাগ করে কাটল মিশা, সকাল দুপুর সন্ধে তিনবেলাই চলবে। একটুকরো রুটি মুখে পুরে দিল ও। এত ছোট যে কখন গলে গেল পেটে বুঝতেই পারল না। ভাবল দ্বিতীয় টুকরোটা খাবে কি না। রুটি ছাড়াই সন্ধের খাবার চালাতে পারা যায় হয়ত। তারপর ভাবল না, সেটা ঠিক হবে না। ও যদি সবটা খেয়ে ফেলে তাহলে মা নিশ্চয়ই নিজে না খেয়ে তার ভাগটা ওকেই দিয়ে দেবে। মিশা দ্বিতীয় টুকরোটা রেখে দিল। তারপর দাঁতে চেপে থুতনিটা সামনে বাগিয়ে রাখল। কিন্তু কোন ফাঁকে একটা গরম আলুও চিবিয়ে ফেলেছে খেয়ালই করতে পারেনি। যন্ত্রণায় কোঁকিয়ে উঠল সে।

১৬.

বইয়ের আলমারি

মিশার ইচ্ছে ছিল খাবারটা খেয়েই টুক করে বাইরে চলে যাবে সে। কিন্তু মা ধরে ফেলল ঠিক বেরুনোর মুখে।

— 'কোথায় যাচ্ছিস।'

— 'বাইরে।'

— 'আর তোর বইগুলো। সেগুলো কে গুছিয়ে রাখবে শুনি।' বলে গরম ইস্তিরিটা হাত ভিজিয়ে ধরল মা।

— 'কিন্তু সময় নেই যে, খুব তাড়া আছে আমার।'

— 'তার মানে আমাকে গুছিয়ে দিতে হবে বইগুলো।' আংটার ওপরে ইস্তিরিটা নামিয়ে রেখে ঘুরে তাকায় মা ওর দিকে।

— 'ঠিক আছে, গুছিয়ে রাখছি। তোমার তো সব সময়ই এই, যখনই আমার তাড়া থাকে তখনই এসে বাগড়া দাও তুমি।' বিড়বিড় করে বলে মিশা।

বইয়ের আলমারির দ্বিতীয় তাকটা মিশার। আলমারিটা তৈরি হয়েছিল বই রাখার জন্য। এখন ওদের অন্য আলমারি বা আলনা না থাকার জন্য বাসনকোসন জামাকাপড়ও রাখা হয় এখানে। বইগুলো বের করে মিশা ধুলো ঝাড়ল জুতোর বুরুশ দিয়ে। তারপর একখানা খবরের কাগজ পেতে দিল। মেঝেতে বসে বইগুলো আলাদা করে গোছাল। তারপর আবার একটা একটা করে তুলে রাখল বইয়ের তাকটাতে। বিশ্বকোষ, অ্যাডভেঞ্চার জগৎ, গোগলের রচনাসংগ্রহ, তলস্তয়েব 'শৈশব, কৈশোর, যৌবন', মার্ক টোয়েনের 'টম সয়ারের অ্যাডভেঞ্চার' গোছানোর পর হাতে উঠল একটা বই, বইটা ওর পছন্দ নয় একেবারেই, নেহাৎই প্যানপ্যানে কান্নার গল্প, তবে বইটার মলাটটা খাসা। স্লাভা এই বইটার সঙ্গে ওব পেনও বই বদলাবদলি কবে নিতেও পারে হয়ত, কারণ স্লাভার আবার সুন্দর কভারের দিকে ঝোঁক একটু বেশিই। একটু এগিয়ে গিয়ে জানলাটা খুলে দিতেই রাস্তার হই হট্টগোল আর গাড়ির আওয়াজ যেন ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ল ঘবে। বাড়িগুলো লম্বা লম্বা ব্লকে ভাগ করা, চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে। জাফরি কাটা লোহার ঝুলবারান্দাগুলো যেন আঠা দিয়ে বাড়িগুলোর গায়ে গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে, সরু লোহাব মইগুলোও। একটু দূর দিয়ে নীল ফিতের মতন এঁকে বেঁকে গেছে মস্কো নদী। দূর থেকে দেখলে পুলগুলোকে মনে হবে ফিতের ওপরে গিঁট দেওয়া এক একটা কালো বাঁধুনি। সবচেয়ে কাছের গির্জাটার সোনালি গম্বুজে হাজারটা সূর্য যেন ঠিকরে পড়ছে। ঠিক তার পিছনেই ক্রেমলিনের চূড়োর তীক্ষ্ণ ফলাগুলো আকাশের গায়ে যেন ফুঁড়ে উঠেছে। মিশা জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'স্লাভা - আ - আ।'

ওর ডাক শুনে তেতলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল সরু সরু লম্বা আঙুল আর ফ্যাকাশে মুখের ছেলে স্লাভা। ও সবসময়েই বো নেকটাই পরে, পিয়ানো বাজায় আব কক্ষনও মারামারি করে না বলে পাড়ার সবাই ওকে 'বুর্জোয়া' বলে ঠাট্টা করত। ওর মা একজন নামকরা গাইয়ে আর বাবা একটা কারখানার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। ওই কারখানাতেই কাজ করে মিশার মা, গেন্কার পিসি আর এ বাড়ির আরও অনেকেই। কারখানাটা বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল, এখন আবার চালু করার যোগাড় চলছে। স্লাভার হাঁক শুনে মিশা জিজ্ঞাসা করল, 'স্লাভা, বদলাবদলি করবি,' বলে বইটা উঁচু করে দেখাল — 'একেবারে পয়লা নম্বরের

বুঝলি, "রাজকুমারী জাভাহা", একবার ধরলে আর ছাড়তে পারবি না।'

স্লাভা চিৎকার করে উত্তর দেয়, 'না, আমার নিজেরই আছে।'

— 'তাতে কী হল, মলাটটা একবার দেখ, কী সুন্দর। তোর 'গডফ্লাই' বইটার বদলে এটা নিতে পারিস তুই।'

— 'না।'

— 'নিসনি তাহলে। শেষে নিজেই চাইবি, তখন থোরাই দেব তোকে।'

— 'কখন বেরুচ্ছিস?' স্লাভা জিজ্ঞাসা করে।

— 'একটু পরেই।'

— 'তাহলে গেস্কাদের বাড়িতে আয় না, আমিও যাব ওখানে।'

মিশা ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বইটা তাকে গুছিয়ে রাখে। ভাবে থাক কিছুদিন বইটা ওখানে। স্কুল খুললে আর একবার চেষ্টা করে দেখবে। আরও অনেকগুলো বই রয়েছে; সমুদ্রের ২০,০০০ লিগ নীচে, আফ্রিকার জঙ্গলে, চামড়ার মোজা, স্কন্ধকাটা ঘোড়সওয়ার — সবগুলোই কাউবয়, প্রেইরি, রেড ইন্ডিয়ানদের মাথার খুলি আর মেক্সিকানদের মাস্তাং ঘোড়াদের নিয়ে লেখা — চমৎকার। এগুলোই হচ্ছে বইয়ের মতন বই। গল্পের বইগুলো গুছিয়ে মিশা এবার পড়ার বইগুলোতে হাত বাড়ায়। কতগুলো পড়ার বই। গত বছরে বইগুলো ছুঁয়ে দেখেছে কি না সন্দেহ। শীতের সময়েই স্কুলে চুল্লির ব্যবস্থা ছিল না। শীতে ওদের হাত পা এমন জমে গিয়েছিল যে কেউ লিখতেই পারেনি। তবে স্কুলে ঠিক ঠিক পৌঁছে যেত গরম গরম স্যুপ খাওয়ার লোভে। ১৯২১ সালের সেই শীত, যেমন ছিল ঠাণ্ডা, তেমন ছিল না খেয়ে দিন কাটানো। একসারসাইজ খাতা, ডাকটিকিটের খাতা, ভাঙা কম্পাস, দাগ মুছে যাওয়া সেটস্কোয়ার আর কোণ মাপা যন্ত্রগুলো সরিয়ে রাখল মিশা। তারপর মায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বের করল ওর গোপন পুঁটলিটা, পুরোন পত্রিকায় ঠাসা পুঁটলিটার মধ্যে লুকোন রয়েছে সেই ছোরাটা। কাপড়ের বাইরে থেকে হাত দিয়ে ধারটা একবার ছুঁয়ে দেখল মিশা। পলেভয় এখন কোথায় কে জানে। একবার একটা চিঠি অবশ্য পেয়েছিল, তারপর কোনও পাত্তাই নেই। তবে মিশার বিশ্বাস পলেভয় ফিরে আসবেই একদিন না একদিন। বড় বড় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও চোরাগোপ্তা লড়াই এখনও শেষ হয়নি। এই তো ফেব্রুয়ারি মাসেই ফিনল্যান্ডের শ্বেতরক্ষীদের কারোলিয়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সৈন্য জাপানিদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু আবার নতুন করে যুদ্ধের জন্য আঁতাতের সবরকমের ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। সবার লক্ষ্যই ওইদিকে। কে জানে এতদিনে নিকিৎস্কি মরে ভূত হয়ে গেছে কিনা। না কি অন্য অনেক শ্বেতরক্ষীদের দলে ভিড়ে সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে গেছে। ছোরার খাপটা রয়েছে ওর কাছে। তাই ছোরার রহস্যটা আর বোধহয় কোনওদিনই উন্মোচিত হবে না।

হঠাৎ মিশার ফিলিনের কথা মনে পড়ে গেল। পলেভয় এই নামটা উল্লেখ করে সাবধান করে দিয়েছিল ওকে। বরকার বাবার নাম ফিলিন, মালগুদামের চার্জে রয়েছে সে। পলেভয় বলেছিল রেভস্কের বাসিন্দা লোকটা। মাকে জিজ্ঞাসা করে কিছু জানতে পারেনি, গেঙ্কার পিসি মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল — 'জানি না, জানতেও চাই না, খারাপ মানুষ একটা, গোটা পরিবারটাই অবশ্য একই রকমের বদ।' এ ছাড়া একটা কথাও বলেননি পিসিমা। কিন্তু যেহেতু গোটা পরিবারের কথা বলেছেন, তাহলে জানেন নিশ্চয়ই অনেককিছু। শক্ত সমর্থ মহিলা গেঙ্কার এই পিসিমা, সব্বাই ভয় করে ওনাকে। উনি মহিলা সাংস্কৃতিক সমিতির প্রতিনিধিও বটেন। শুধু গেঙ্কাই ভয় করে না পিসিকে। একটু গোলমাল হলেই কাপড়জামা গুছিয়ে বলে — 'রেভস্কে ফিরে যাচ্ছি,' ব্যস পিসিমাই শেষপর্যন্ত হার মানেন। পলেভয় কেন যে লোকটার পুরো নাম ওকে বলে গেল না! লোকটাকে খুঁজে বার করার আর কোনও রাস্তাই নেই না কি। মিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোরাটা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে আলমারিটা বন্ধ করে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই ভেবে মিশা এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। এখন তার গন্তব্য গেঙ্কাদের বাড়ি।

১৭.

গেঙ্কা

দাবাব ছক সাজিয়ে খেলছিল ওরা। গেঙ্কা বিছানায বসে, স্লাভা দাঁড়িয়ে। বিছানার বালিশগুলো পিরামিডের মতন উঁচু হয়ে প্রায় ছাদ ছুঁয়েছে। পাশেই একটা টেবিলে গেঙ্কার পিসিমা ময়দা মাখছেন। মেজাজ খুব ভাল নেই মনে হল, কারণ মিশা ঘরে ঢুকতেই কড়া নজরে একবার দেখলেন। মিশাকে দেখে গেঙ্কা বলে উঠল, 'তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি। এই দেখ তিনচালে ওকে মাত কবে দিচ্ছি।'

— 'কি বললি, তিন চালে, বিছানা থেকে নাম বলছি, বসার বেশ জায়গাটা তাই না।' পিসি চিৎকার করে ওঠে। নামছে এরকম একটা ভাব দেখিয়ে গেঙ্কা একটু নড়ল।

— 'উশখুশ না করে উঠে বস তো। কথা শুনতে পাস না নাকি।'

মাখা ময়দাটার ব্যবস্থা করতে বেলুনচাকি নিয়ে পড়লেন এবারে পিসিমা। তারপর ফের গেঙ্কার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'কী লজ্জার কথা। অতবড় বাঁধাকপিটা কুপিয়ে, কেটে শেষ করে ফেললি। কেন কাটলি বল তো ...।'

— 'ওটার গোড়াটা আমার দরকার ছিল। ওটা নিশ্চয় তোমার কোনও কাজে লাগবে না।'

— 'ঠিক আছে কাটলিই যখন, তখন আর একটু সাবধানে কাটতে পারলি না, গাধা কোথাকার। কপির পুরভাজা বানাব বলে যত্ন করে জমিয়ে রাখছিলাম, আর তুই কিনা সব কটা পাতা কেটেকুটে সাফ করে দিলি!' গেঙ্কা দাবার চালটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'কপি পাতায় মাংসের পুর ভাজা। ওটা বুর্জোয়াদের খাবার পিসিমা। আমরা বুর্জোয়া নই যে ওটা খাব। তাছাড়া তুমি তো নির্ঘাৎ মাংসের বদলে পরিজের পুর দেবে। মাংসের পুর হলেও নাহয় কথা ছিল।'

— 'তুই কি আমাকে রান্না শেখাবি নাকি!'

— 'না, তবে তোমার ব্যাপার দেখে অবাক হচ্ছি পিসিমা। তুমি একজন কেউকেটা মানুষ। আর তুমি কিনা বাঁধাকপি আর পুরভাজা নিয়ে এত মাথা খারাপ করছ। এত অস্থির হলে শরীর খারাপ হবে তোমার।'

— 'তবে রে ডেঁপো। মুখ বন্ধ কর বলছি। অনেক বকেছিস। নাহলে আমার হাতের এটা কি দেখতে পাচ্ছিস!'

— 'বেলুনির ভয় দেখিও না পিসি। তুমি আমাকে মারতেই পারবে না।'

— 'কেন। তোকে মারতে পারব না কেন?' তেড়ে ওঠেন পিসিমা।

— 'পারবে না তার কারণ, তুমি আমাকে ভালবাসো। পিসিমামণি তুমি যে আমাকে খুব ভালবাসো।'

পিসিমা এবার হেসে ফেলেন, বলেন, 'উঃ, কী পাজি ছেলে রে বাবা। তুই এত পাজি কেন রে গেঙ্কা।'

হঠাৎ স্লাভা বলে, 'কিস্তি মাত।'

গেঙ্কা চমকে উঠে বলে, 'কই, কোথায়, আরে ঠিকই তো, দেখলে পিসিমা দেখলে, তোমার ওই বাঁধাকপির পুরভাজা আমার জেতা গেমটা চৌপাট করে দিলে।'

পিসিমা রান্নাঘরে যেতে যেতে বলেন, 'তাতে তোমার ক্ষতি কী হল!'

স্লাভা হঠাৎ বলে, 'আচ্ছা গেঙ্কা, তুই রাতদিন তোর পিসির সঙ্গে ঝগড়া করিস কেন রে। তোর লজ্জা হওয়া উচিত।'

— 'আমি, ঝগড়া করি! কী সব আবোল তাবোল বকছিস। এটাকে তুই ঝগড়া ভাবিস নাকি। আরে ওনার কথার ধরনটাই ওরকম।'

কথা বলতে বলতে দাবার ঘুঁটি সাজাতে থাকে গেঙ্কা। বলে, 'আয় মিশা, তোর সঙ্গে একদান খেলি।'

মিশা বলে, 'না, তার চাইতে চল সবাই মিলে উঠোনে যাই। এখানে থেকে কি হবে।'

ঘুঁটিগুলো উঠিয়ে রেখে গেঙ্কা ছকটা গুটিয়ে ফেলল। তারপর সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল।

১৮.

হাড়কিপটে বরকা

মে মাস পড়েছে, অথচ জমা বরফের চাঁইগুলো গলে যায়নি এখনও। বাতাসের টানে গোটা শীতকাল জুড়ে তুষারের যে স্তূপ জমেছিল তার পুরোটাই কালো জমাট হয়ে আছে। আটতলা সমান উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর আড়াল পেয়ে রোদ্দুরের তেজের কাছে মাথা নোয়ায়নি। আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে সেদিন সূর্যের আলো গুঁড়ি মেরে উঠোনে ঢোকে, সরু অ্যাসফল্টের ওপরে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, ঠিক যেখানটায় মেয়েরা খড়িমাটি দিয়ে এক্কা দোক্কা খেলার ঘর কেটেছে সেখানে ঝিমোয়। তারপর দেয়াল বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে উঠে বাড়িগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জারের সময়কার বড় বড় পাঁচ কোপেকের রেজগি দিয়ে ওরা খেলছিল। গেঙ্কা হাত যতদূর পারা যায় বাড়িয়ে মিশার পয়সাটাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছিল। মিশা বলল, 'তোর কাজ না গেঙ্কা। এই হাড়কিপটে, এবার তোর পালা।' স্লাভার পয়সাটার দিকে তাক করতে করতে বরকা বলতে থাকে, 'এই দেখ, ঠিক মাথার ওপরেই মারব দেখিস।' বলতে বলতেই পয়সাটা ছুঁড়ল। আর সেটা ঠিক গিয়ে লাগল স্লাভার ঢাউস পাঁচ কোপেকটার মাথায়।

— 'বুর্জোয়া, এবারে কড়ি ফেল দেখি চাঁদ।'

স্লাভার মুখটা লাল হয়ে ওঠে। বলল, 'আমি তো ফতুর এক্কেবারে। তোর কাছে ধার রইল আমার।'

বরকা চিৎকার করে ওঠে, 'বড্ড নাক গলাচ্ছিলি যে এতক্ষণ। ধার টারের ব্যাপার নেই। দে, আমার পয়সা দে।'

— 'বললাম তো পয়সা নেই। যখন জিতব, তখন শোধ করে দেব।'

স্লাভার পাঁচ কোপেকের পয়সাটা কেড়ে নিয়ে বরকা বলল, 'ও, এইরকমই মতলব বুঝি তোদের। ঠিক আছে পয়সা শোধ করলে এটা ফেরত পাবি।'

— 'আরে ওটা নেওয়ার কী অধিকার আছে তোর?' ফ্যাকাশে গাল লালচে হয়ে উঠছে স্লাভার, গলা কাঁপতে শুরু করল।

— 'আছে অধিকার আছে। আবার খেলতে এলেই বুঝবি।'

বরকাকে একটা কোপেক দিয়ে মিশা বলল, 'নে, ওর পয়সাটা এবার ফেরত দিয়ে দে। স্লাভা, তুই কিন্তু পয়সা না নিয়ে কক্ষনও খেলতে আসিস না বুঝলি।'

বরকা মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না, অন্যের পয়সা নেব কেমন করে। ওটা নেব না। ওর পয়সাই দিক ও।'

— 'কিপটেমি করার শখ হয়েছে বুঝি।'

— 'তাই যদি ভাবিস তো তাই।'

— 'না, সেটা হবে না, স্লাভার পয়সাটা মানে মানে ফেরত দিয়ে দে।'

বরকা চটেমটে একশা। — 'তুই কি মালিক নাকি এই জায়গার! তুই নাক গলাচ্ছিস কেন?'

বরকার দিকে এগিয়ে গেল মিশা। বলল, 'ফিরিয়ে দিবি কি না বল।'

গেঙ্কাও ততক্ষণে ছুটে এসেছে কাছে, বলল, 'দে তো দু ঘা কষিয়ে।' গেঙ্কাকে সরিয়ে দিয়ে মিশা বলল, 'তুই সর তো গেঙ্কা, আমি একাই ব্যবস্থা করতে পারব। এই শেষবারের মতন বলছি তোকে বরকা, ফিরিয়ে দিবি কি না।'

পেছিয়ে গিয়ে বরকা অন্যদিকে তাকাল। পাথরে টুং করে পয়সাটা পড়ার আওয়াজ হল। বরকা কটমট করে বলল, 'ওই নে, দম আটকে আসছিল বুঝি ওটার জন্য। কী ভাবিস নিজেকে, অ্যাঁ। লোকজনকে রক্ষা করে বেড়াচ্ছিস।'

খেলাটা ভেস্তে গেল। দেয়ালের কাছে অ্যাসফল্টের ওপরে বসে ওরা রোদ্দুরের তাপ নেয়। গির্জায় ঘন্টা বাজছে। ভোঁতা গাছগুলোর ডগায় সেই ঘন্টার শব্দ যেন বারবার আটকে আটকে যাচ্ছে। গাছে গাছে টাঙানো দড়ির ওপরে কাচা জামাকাপড়গুলো ফরফর করে উড়ছে, এপাশে ওপাশের দুলুনিতে কাঠের আঁকড়াগুলোও নড়ছে। পাঁচতলায় দুঃসাহসী একটি মেয়ে জানলার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে ফ্রেম ধরে কাঁচগুলো পরিষ্কার করছে।

গাদা করে রাখা মরচে ধরা রেডিয়েটরের ওপরে বসে মিশা বিদ্রুপের চোখে বরকাকে দেখছিল। মতলবটা খাটল না বেচারার। অন্যের পয়সা নিজের পকেটে গোঁজার ফন্দিটা ঠিক খাটল না এবার। সাধে কি আর লোকে হাড়কিপটে বলে ডাকে ওকে। বাজারে গেলেই দেখা যাবে ও সেখানে বসে টফি আর সিগারেট বেচছে। টফিগুলোকে চকচকে দেখাবার জন্য মাঝে মাঝে নিজের জিভ দিয়ে চেটে রাখছে। ওর বাবা ফিলিন, সেও সবসময় ধান্দায় থাকে কখন কীভাবে দুপয়সা কামাতে পারবে।

এর মধ্যে যেন কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব করে বরকা 'লাফানে ডাকাত'দের গল্প জুড়ে দিয়েছে সকলের সঙ্গে। বলছে — 'লাফানে ডাকাতরা চাদরে গা জড়িয়ে, দাঁতে বালব চিপে, পায়ে স্প্রিং বেঁধে একলাফে উঠে যায় পাঁচতলায়। ডাকাতি করে, প্রত্যেকটি ঘরে। পাহারাওয়ালা সামনে পড়লে বাড়ি ঘর ডিঙিয়ে চলে যায় পাশের গলিতে।'

মিশা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, 'বল, বলে যা, যা প্রাণ চায়। তুই একটা আস্ত গুলবাজ। হুঃ লাফানে ডাকাত। তার চেয়ে বরং বল না মাটির তলার কুঠরিতে মরা মানুষ কীসব দেখেছিস না সেখানে, সেসব বল।'

বরকা বলে, 'সত্যি সত্যি মড়া আছে মাটির তলার কুঠরিতে। ওখানে একসময়ে কবরখানা ছিল কী না। রাত্তির হলেই তখন ভূতপ্রেত হাউমাউ করে চেঁচায়, গোঙায়, কি সব ভয়ানক কাণ্ড, বুঝলি।'

মিশা বলে, 'তোর ওই কুঠরিতে কিসসু নেই বুঝলি। কবরখানা, ভূত, যত্তোসব বাজে কথা, আর কারও কাছে গিয়ে বল।'

বরকা তবু হাল ছাড়তে চায় না — 'আরে কবরখানা যে ছিল সে কথাটা তো সত্যি। ওখান থেকে সারা মস্কোর তলায় সুড়ঙ্গ চলে গেছে। জার 'ভয়ানক' ইভান বানিয়েছিলেন।'

শুনে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

মিশা বলে, 'দূর, জার 'ভয়ানক' ইভান হচ্ছে চারশো বছর আগের। আর আমাদের বাড়িটা তৈরি হয়েছে দশ বছর আগে। মিথ্যে কথাটাও ভাল করে বলতে পারিস না তুই।'

বরকা রেগে যায়, 'আমাকে মিথ্যেবাদী বললি! তাহলে চল আমার সঙ্গে মাটির নিচের কুঠুরিতে। দেখিয়ে দেব সুড়ঙ্গ আর মড়া।

গেঙ্কা বলে, 'যাস না রে মিশা। ওখানে তোকে একটা ফাঁদে ফেলে নাকাল করবে।'

বরকার ওই চালাকিটা ওরা সকলেই জানে। প্রকাণ্ড বাড়িটার নীচের অন্ধকার কুঠরিগুলোর অন্ধিসন্ধি ও খুব ভাল চেনে। ওর সঙ্গে কেউ গেলে ওখানকার অন্ধকার গোলকধাঁধায় তাকে ঘুরিয়ে ভয় পাইয়ে দেয়। সে অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে ওখান থেকে বেরোনোর পথ বাতলে দেয়। গেঙ্কারও সেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে তাই বলে, 'আমরা তো আর বুদ্ধু নই, তুই নিজেই যা না দেখি।'

বরকা নিশ্চিন্তমনে বলে, ' তা আর কী হবে, এত ভয় পেলে নাহয় নাই গেলি।'

মিশা চটে যায়, বলে, 'কার কথা বলছিস তুই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, বরকা বলে, 'না তেমন বিশেষ কারও কথা নয়। যারা কুঠরিতে যেতে ভয় পায়, তাদের কথাই বলছিলাম।'

মিশা উঠে দাঁড়াল, বলল, 'তাই যদি হয়, তাহলে চল।'

দুজনে বাড়ির নীচে মাটির তলার কুঠরিতে ঢুকে পড়ল। চটচটে আঠালো দেয়ালগুলো সাবধানে ধরে ধরে নীচে নামতে লাগল। পথ দেখিয়ে চলছে বরকা। মাটিটা আলগা, নরম, পায়ের নীচে টিনের টুকরো টাকরা ভাঙা কাঁচ শব্দ করছে। মিশা জানে বরকা ওকে বোকা বানাতে চাইছে। ঠিক আছে দেখা যাবে কে কাকে বোকা বানায়। গাঢ় অন্ধকারে ওরা এগিয়ে চলল কিছুটা। হঠাৎ বরকা থেমে দাঁড়াল। মিশা ভাবল, তাহলে এই শুরু হল বরকার খেলা। জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় রে তোর মড়াগুলো।' কিন্তু ওর কথার কোনও উত্তর এল না। দূর থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে এল মাত্র। মিশার মনে হল বরকা খুব কাছেই রয়েছে, উত্তর দিচ্ছে না। বেশ কয়েকমিনিট অস্বস্তির মধ্যে কেটে গেল। দুজনেই

মুখ বুঁজে রয়েছে। দুজনেই ভাবছে অন্যজন আগে কথা বলুক। মিশা আস্তে ঘুরে গিয়ে বাঁক খুঁজল, ঘাবড়াবার কিছু নেই, ও জানে ও নিজেই রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে। তারপর একবার খুঁজে পেলে দরজা বন্ধ করে আধঘন্টা আটকে রেখে জব্দ করবে বাছাধনকে। আস্তে খুব আস্তে এগোয় মিশা। কান খাড়া করে পেছনে হালকা পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারে যে বরকাও পিছু নিয়েছে। তার মানে ভয় পেয়েছে। মিশা চলতেই থাকে। নিশ্চয়ই কোনও একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে, কারণ পথটা চওড়া হওয়ার বদলে সরু হয়ে গেছে। কিন্তু এই অন্ধকারে বরকা দেখতে পাচ্ছে কেমন করে! ও ব্যাটা যদি চলে যায় আর মিশা পথ না খুঁজে পায়, তাহলে, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে ওর। রাস্তাটা আরও সরু হয়ে যাচ্ছে। দুদিকের দেয়ালে কাঁধ ঘষে যাচ্ছে মিশার। মাথার ওপরে হাত বাড়িয়ে দেখে একটা ঠাণ্ডা জলের পাইপে কল কল করে জল যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল ওর ওপরে। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মিশা অনেকটাই নীচে। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিশা। চোট লাগেনি, তাছাড়া এই জায়গাটায় আলো যেন একটু বেশি। একটা সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। একটু দূর থেকে বরকার কালো মূর্তি নজরে এল। — 'মিশা — এই মিশা, কোথায় তুই?' মিশা ইচ্ছে করেই জবাব দিল না, প্রথম কথা তো ওকেই বলতে হল। বেশ এবারে খুঁজুক ও। দেয়ালে গা ঠেকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিশা। বরকা আবার হাঁক পারছে — 'মিশা, এই মিশা,' তারপর যেদিকটায় মিশা রয়েছে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করে — 'কি রে উত্তর দিচ্ছিস না যে।' এবারে মিশা উত্তর দিল, 'কোথায় রে তোর মাটির তলার সুড়ঙ্গ। আর মড়াগুলো! দেখা না দেখি।'

বরকা ফিসফিস করে বলল, 'এই তো মাটির তলার সুড়ঙ্গ, তুই কিন্তু ভেতরে যাসনে, কফিন আর মড়ায় ভর্তি জায়গাটা।'

— 'তোর মড়ার আমি থোড়াই পরোয়া করি।' বলে মিশা এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের ভেতরে। দেখে বরকা ছুটে এসে চেপে ধরল ওর সার্টের কলার। বলল, 'এই মিশা, কথা শোন, চল ফিরে যাই, নয়তো খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে।'

— 'কেন ভয় দেখাতে চেষ্টা করছিস বলত।'

— 'আরে না, লণ্ঠন ছাড়া যাবি কী করে। কাল লণ্ঠন নিয়ে দুজনে আসব, বুঝলি।'

— 'ঠিক বলছিস তো, তোকে তো আমি চিনি।'

— 'দিব্যি করে বলছি, মিথ্যে বললে মরে যাব। আমি ফিরছি। নিজে নিজে তুই কখখনও বেরুতে পারবি না।'

— 'বয়ে গেল আমার।' বলল বটে মিশা, কিন্তু কালবিলম্ব না করে বরকার পেছন পেছন ফিরতে শুরু করল। তারপর পথ হাতড়াতে হাতড়াতে দুজনে

বেরিয়েও এল তলকুঠুরির অন্ধকার থেকে। দরজায় পৌঁছতেই ঝলমলে রোদে ঝলসে গেল ওদের চোখ।

মিশা বলল, 'তাহলে কাল সকালে — মনে থাকে যেন।'

— 'বেশ, সেই কথাই রইল।' উত্তর দিল বরকা।

১৯.

খেড়ে শুরা

ওরা যখন উঠোনে বসে গুলতানি করছে তখন সেখানে এসে উপস্থিত হল শুরা বলে ছেলেটা। খুব লম্বা বলে ওকে সবাই 'খেড়ে শুরা' বলে ডাকে। শুরাকে ওরা বিরাট অভিনেতা বলে ভাবে। এক নম্বর ব্লকের নীচের তলায় যে ক্লাবটার সদর আস্তানা সেই ক্লাবেরই সৌখীন নাট্যচর্চার সদস্য শুরা। সেখানে ছেলে ছোকরাদের ঢোকার নিয়ম নেই। শুধু লম্বু শুরা ঢোকার অনুমতি পেয়েছে। তার জন্যও শুরার দেমাক কম নয়। মিশা ওকে ডাকে, 'এই যে লম্বু দাদু।'

শুরা চোখ পাকায়। বলে, 'কী যে ছেলেমানুষী করিস তোরা। ভেবেছিলাম এতদিনে চ্যাংড়ামিগুলো ঝেড়ে ফেলেছিস।'

গেঙ্কা বলল, 'এই সেরেছে। এটা আবার শিখলি কোথায়, ক্লাবে নিশ্চয়।'

— 'সে আর তোদের বলে কী লাভ। জানিসই তো ক্লাবে ছোটদের ঢোকা বারণ।' অর্থপূর্ণ ভাবে হাসে শুরা।

মিশা বলে, 'এই বলে আর লোক হাসাস না। নেহাৎ তালগাছ হয়ে গেছিস তাই তোকে ঢুকতে দিয়েছে।'

শুরা হাসতে হাসতে বলে, 'তোর হিংসে হচ্ছে সেই কথা বল। আমি ক্লাবের এক নম্বর অভিনেতা বুঝলি।'

স্লাভা বলে, 'আরে আমাদের ঢুকতে দেয় না কারণ ক্লাবটা আমাদের নয়। শুনেছি কাছেই একটা কিশোর কমিউনিস্ট সংঘ তৈরি হয়েছে, সেখানে নিজেদের ক্লাবও আছে।'

— 'হ্যাঁ, আছেই তো। ওদের কী একটা আলাদা নামও আছে ভুলে গেছি। তবে ওটা তো বাচ্চাদের ক্লাব। বড়রা যায় কমসমোলে।' শুরা বলে। ও যে নিয়মিত কমসমোলে যায় সেটা ওর কথাতেই বোঝা যায়।

মিশা বলে, 'বাঃ বেশ মজার তো। ছোটরাও নিজেদের সংঘ বানিয়েছে।'

গেঙ্কা বলে, 'ওরা বোধহয় বয়েজ স্কাউট বুঝলি স্লাভা। গুলিয়ে ফেলিসনি তো?'

— 'আরে না, ঠিকই বলছি। স্কাউটদের তো নীল টাই। এরা বাঁধে লাল টাই।'

মিশা বলল, 'লাল, সেটা হলে তো সোভিয়েতের সমর্থনে হবেই। তাছাড়া ওখানে বয়স্কাউট আসবে কোথা থেকে! মজুরদের পাড়া ওটা।'

শুরা সায় দেয়, 'হ্যাঁ, ওরা সোভিয়েত শাসনের পক্ষেই।'

— 'ওটা ওদের নিজেদের ক্লাব?'

— 'নিশ্চয়। প্রত্যেকের নিজস্ব কার্ড আছে।' মনে একটু খটকা থাকলেও বলে শুরা।

মিশা বলে, 'বাঃ বেশ মজার তো। আমি তো জানতামই না। তুই কী করে জানলি রে স্লাভা?'

— 'গানের স্কুলের একজন ছাত্র আমাকে বলেছে।'

— 'ভাল করে জেনে নিলি না কেন! নাম ঠিকানা আর কারা কারা নাম দিতে পারে।'

— 'যোগ দিতে। অত সোজা নাকি। কেমন করে তোকে নেয় দেখব আমি।' শুরা বলে।

— 'কেন, নেবে না কেন?'

— 'সোজা নয় ব্যাপারটা, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।' মহাবোদ্ধার মতন মন্তব্য করে শুরা।

— 'যোগ্যতা! কিসের যোগ্যতা?'

— 'মানে, যেমন ধর অন্যদের মতন ক্লাবের কিছু দরকারি কাজ করা, নিয়মিত কমসমোলে যাওয়া, এইসব আর কী!' শুরা বলতে থাকে।

মিশা ওকে থামিয়ে দেয়, বলে, 'ব্যস, ব্যস, থাম তো। অত দেমাক করার কী হল। তুই নিজে কি কাজ করতে পারিস রে শুরা।'

— 'কী বলতে চাস তুই।'

— 'খুব সোজা। তোর ইচ্ছে কমসমোলে যোগ দেওয়ার তাই না! বেশ। কিন্তু জানিস কি যে কমসমোলের ছেলেরা লড়াই করে ফিরে এখন কারখানায় কাজ করছে। আর তুই? স্টেজের পেছনে হাজারটা চুনোপুঁটির মতন বসে আছিস। তা, সত্যি কথাটা বল তো, তোর স্টেজ ম্যানেজার হওয়ার সাধ আছে?'

— 'আরে সে আমি কেমন করে হব। কমরেড মিতিয়া সাখারভ তো আমাদের স্টেজ ম্যানেজার।'

— 'আরে উনি তো বড়দের স্টেজ ম্যানেজার। আমরা ছোটদের জন্য একটা চক্র খুলব। তাহলে আমাদের ক্লাবে ঢুকতে দিতে বাধ্য হবে। আমরা নাটক করব। নাটকের শো দেখিয়ে টাকা তুলে দুর্ভিক্ষ এলাকায় পাঠাব। আমরা যে কত কাজ করতে পারি সেটা বুঝিয়ে দেব।'

স্লাভা বলল, 'ঠিক বলেছিস। একটা সঙ্গীতচক্রও খুলতে পারি। গানের দল, আঁকিয়েদের দলও থাকবে।'

শুরা তবু মাথা নেড়েই চলেছে, 'ওরা তোদের নেবেই না।'

শুনে মিশার জেদ চেপে গেল। বলল, 'আলবাৎ নেবে। চল সবাই মিলে কমরেড মিতিয়া সাখারভের কাছে যাই। সব কথা খুলে বলি ওকে। উনি কেন ঠেকাতে যাবেন আমাদের!'

— 'লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে তোদের।' আবর্জনার টিনের ভেতর থেকে খালি শিশি বোতল খুঁজতে খুঁজতে চেঁচিয়ে উঠল বরকা।

গেঙ্কা ঘুষি বাগিয়ে বলে, 'তুই খবরদার নাক গলাবি না। যা গিয়ে টফি বেচ গে যা।'

শুরা কী ভেবে বলে, 'হুঁ, মন্দ নয় বুদ্ধিটা। তবে আমার এলেম হচ্ছে অভিনয় করা, স্টেজ ম্যানেজারিতে নয়।'

মিশা বলল, 'খুব ভাল কথা, অভিনেতা হিসেবে স্টেজ ম্যানেজারের পাঠটাই করবি না হয়। আর ভেবে কী করবি!'

শুরা রাজি হয়ে যায় — 'তাই করা যাক তাহলে। তবে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোদের যে আমি যা বলব শুনতে হবে তোদের। আর্টের ব্যাপারে শৃঙ্খলাই হচ্ছে বড় কথা। গেঙ্কা তুই ভাঁড়টাঁড়ের পাঠ করতে পারিস। স্লাভা নায়ক হতে পারবে। আর হ্যাঁ, বাজনাটাও দেখবে। আমার মনে হয় মিশাকেই ম্যানেজার করা উচিত। আব অন্য সব পার্ট পরীক্ষা করে করে বেছে দেব'খন।

২০.

ক্লাব

একটা হল আর স্টেজ নিয়ে ক্লাব ঘরটা। সভা সমিতি কিংবা অভিনয় যখন থাকে না তখন ঘরের একপাশে দুচারটে বেঞ্চি টেনে নিয়ে ক্লাবের কাজকর্ম চলে। বাড়ির মেয়েরা বুনিয়াদি শিক্ষার কাজ করে। স্টেজে নাট্যচক্র তালিম দেয়। মাঝে মাঝে হলের মাঝখানে বিলিয়ার্ড ভক্তরা বিলিয়ার্ড খেলে। অর্কেস্ট্রার রেওয়াজ যখন চলে তখন বিলিয়ার্ডওয়ালারা ওদের ডাণ্ডাগুলো সরিয়ে জায়গা ছেড়ে দেয় অর্কেস্ট্রার বাজনাদারদের। এই সব কিছুর প্রধান পরিচালক হল ক্লাবের ম্যানেজার কমরেড মিতিয়া সাখারভ। সাখারভ নিজে একজন স্টেজ ম্যানেজারও। সাখারভের অল্প বয়স, লম্বা, টিকোল নাক, মুখের ভাবটা সদা ব্যস্ত। সবসময়েই হাত দিয়ে সামনে ঝুলে থাকা চুল সরিয়ে দিচ্ছে। ঘরে ঢুকে ওরা সবাই মিশাকেই সামনে ঠেলে দিল। শুরা বলল, 'তুই কথা বল, তুইই স্টেজ ম্যানেজার।' বলেই একপাশে আড়ালে সরে গেল।

মিশা ওর আসার উদ্দেশ্য ভালভাবে বোঝাতে লাগল সাখারভকে। সব শুনে সাখারভ বলল, 'হুম, বুঝলাম। তবে আমি তো থিয়েটারের স্কুল চালাচ্ছি না।

এটা একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তাও আবার বাড়ি-কমিটির কড়া নিয়মকানুনের মধ্যে।' বলতে বলতে ও স্টেজের দিকে এগিয়ে কাকে যেন অভিনয়ের পার্টটা আরও ভাল করে করতে অনুরোধ করতে থাকে। হতাশ হয়ে মিশা ফিরে আসে। বন্ধুদের বলে, 'না রে হল না, স্রেফ ভাগিয়ে দিল।'

শুরা বলল, 'দেখলি তো, আগেই বলেছিলাম।'

মিশা ভীষণ ক্ষেপে যায়। বলে, 'থাম তো তুই, সেই এক কথা, 'আমি আগেই জানতাম'।' ছেলেরা খানিকক্ষণ ভাবতে থাকে। বিলিয়ার্ডের টেবিলটা ফাঁকা। অর্কেস্ট্রায় 'তুর্কি অভিযান' বাজছে। দেয়ালে হাড্ডিসার একটা বুড়োর ছবি। নীচে ক্যাপসন, 'ভোলগাপারের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করুন।'

মিশা বলল, 'আর একটা উপায় আছে।'

— 'কী উপায়?'

— 'কমরেড জুরবিনের সঙ্গে দেখা করা।'

শুরা হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'ও সব বেআক্কেলে কথা। উনি হচ্ছেন কিনা শহর পরিষদের সদস্য; উনি আসবেন আমাদের চক্র নিয়ে মাথা ঘামাতে! আমি কিন্তু যাচ্ছি না বাবা। শেষে ওই ডাইনিটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

মিশা বলল, 'না গেলি, আমিই যাব। ক্লাবটা তো আর সাখারভের সম্পত্তি নয়। আয় তো গেঙ্কা।'

চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওরা চারতলায় উঠল। জুরবিন সেখানেই থাকেন। মিশা ঘন্টা বাজাল। গেঙ্কা ওপর পর্যন্ত উঠলই না, গুটিসুটি মেবে রইল সিঁড়ির তলায়। যেই না ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল, গেঙ্কা একলাফে নীচে নেমে ভোঁ ভা দৌড়। দরজা খুলল তিরিক্ষি চেহারার এক মহিলা। ছেলেরা ওকে ডাইনি বলে।

— 'কী চাই?'

— 'কমরেড জুরবিনের সঙ্গে দেখা করব।'

— 'কেন, কী দরকার?'

— 'দরকার আছে।'

— 'তোমার আবার কিসের দরকার। এখানে যে বড় ঘোরাঘুরি করছ,' — বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল মিশার নাকের ওপরেই। 'ডাইনি' বলে চেঁচিয়ে মিশা ছুট লাগাল নীচের দিকে। সিঁড়িতে জোর ধাক্কা লাগল একজনের সঙ্গে, তাকিয়ে দেখে কমরেড জুরবিন। কড়া গলায় জুরবিন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, এমন দস্যিপনা কেন?'

মিশা মাথা নীচু করে। জুরবিন বলেন, 'কালা নাকি।'

মিশা বলে, 'না, না,।'

— 'তাহলে জবাব দিচ্ছিস না যে। যা, আর অমন করে ছুটিস না।' বলে

আস্তে আস্তে ভারী পা ফেলে ওপরে উঠে যেতে লাগলেন।

মিশার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সব ব্যাপারটাই এরকমভাবে ভেস্তে যাবে। ওপর থেকে জুরবিনের ভারী পায়ের আওয়াজ কানে আসছে। দরজায় চাবি লাগিয়ে দরজা খোলার শব্দ হল। মিশা দেরি না করে ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'কমরেড জুরবিন। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

— 'কী ব্যাপার!'

— 'আমরা একটা নাট্যচক্র খুলতে চাই। কিন্তু কমরেড সাখারভ খুলতে দিচ্ছেন না।'

— 'আমরা কারা।'

— 'আমরা সবাই। আঙিনার ছেলেমেয়েরা সবাই।'

জুরবিনের কঠিন দৃষ্টিটা একটু নরম হল। মুচকি হাসি দেখা গেল গোঁফের আড়ালে। কোনও জবাব না দিয়ে মিশার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসতে লাগলেন। মিশা বুঝতে পারছিল না কেন উনি অমন করে হাসছেন। তারপর একটু পরে জুরবিন বললেন, 'ঠিক আছে। ভেতরে আয় আলোচনা করে দেখি।' জুরবিনের পেছন পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকল মিশা। মিশাকে দেখে চোখ পাকিয়ে তাকাল ওর দিকে 'ডাইনি' বুড়িটি। তারপর ভেতরে চলে গেল।

২১.

বাজিকর

প্রায় আধঘন্টারও ওপরে জুরবিনের সঙ্গে আলোচনা করে বেরোল মিশা। বন্ধুরা উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল উঠোনে। মস্ত ভিড় জমে গেছে ওখানে। একজন বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে। মিশা ভিড় ঠেলে একেবারে সামনের সারিতে এগিয়ে গেল। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। আঁটোসাটো নীল পোশাক আর কোমরে লাল উড়ুনি। মাটিতে একটা গালিচা বিছিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। চোখে দেখলেও অবিশ্বাস্য মনে হয় এমন সব খেলা দেখাচ্ছে ওরা। বিশেষ করে ছিপছিপে পাতলা মেয়েটা। বাঁকা বাঁকা চোখের পাতার নীচে নীল নীল চোখদুটো, ছোটার সময়ে হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিচ্ছে পিছনে। গোঁফদাড়ি কামানো একটা লোক ওদের সারাক্ষণ 'সাবাশ' 'সাবাশ' বলে বাহবা দিচ্ছে। একটু দূরে একজোড়া সাইকেলের চাকার ওপরে একটা গাড়ি, একটা ছোট্ট গাধা বাঁধা আছে গাড়িটায়। গাড়ির ওপরে দুটো পাতলা কাঠের তক্তা আড় করে টাঙানো, তাতে লেখা — 'রুশ ভ্রাতা ও ভগিনী। বাজিকরের খেলা। রুশ ভ্রাতা ও ভগিনী।'

গাধাটা শান্তশিষ্ট বটে। লম্বা কানদুটো নাড়ছে আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখছে। খেলার শেষে ওই গোঁফদাড়ি·কামানো লোকটা বলল যে ওরা ভিখিরি নয়, খেলোয়াড়। অবস্থার বিপাকে পড়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খেলা দেখাতে হচ্ছে ওদের। দর্শকরা যদি যৎসামান্য সাহায্য করেন তাহলেই খেলার তারিফ করা হবে। একটা ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বাটি হাতে ছেলেটা আর মেয়েটা দর্শকদের কাছে ঘুরে যাচ্ছে। ওপরের জানালা দিয়ে কাগজে জড়িয়ে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে অনেকেই। দর্শকদের অনেকেই সেই পয়সা কুড়িয়ে ওদের বাটিতে দিয়ে দিল। মিশাও একটা কাগজে জড়ানো পয়সা তুলে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন মেয়েটা ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। শেষমেশ মেয়েটা এসে ওর সামনে দাঁড়াল বটে কিন্তু ওর নীল চোখের হাসি মিশাকে এমনভাবে বিব্রত করে দিল যে ও সম্মোহিতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটুও নড়ার ক্ষমতা রইল না। অগত্যা মেয়েটা ওর বাটিটা দিয়ে মিশার বুকে ঠেলা মারল আস্তে, বলল, 'কী গো'? শুনেই মিশার সম্বিত ফিরে আসে। ও তাড়াতাড়ি পয়সার পুঁটলিটা মেয়েটার বাটিতে ফেলে দেয়। মেয়েটাও এগিয়ে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে পিছন ফিরে খুব চমৎকার ভাবে হাসল ওর চোখে চোখ রেখে। তারপর বাজিকর যখন সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে উঠোন ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখনও একবার মেয়েটি ওর দিকে চোরা হাসি হাসল একবার। মিশার খেয়াল নেই চারদিকে কী ঘটছে। হঠাৎ পিঠে চাপড় পড়তেই দেখল গেঙ্কা, শুরা, স্লাভা সবাই দাঁড়িয়ে।

— 'কী রে, কমরেড জুরবিন কী বললেন।'

— 'নিজেরাই পড়ে দেখ', বলে মিশা একটা কাগজের টুকরো ওদের হাতে দিতে গিয়ে দেখে, ও হরি, এটাতো একটা দশ কোপেক জড়ানো বাজে কাগজের টুকরো। এইরে, তাহলে ভুল করে জুরবিনের চিঠিটা ওই মেয়েটার বাটিতে দিয়েছে সে, এই দশ কোপেকটাকে ফেলার বদলে। ভাবা মাত্র জোর ছুট লাগায় মিশা, হাঁফাতে হাঁফাতে পৌঁছায় পাশের বাড়ির উঠানে, বাজিকর সেখানেই খেলা দেখাচ্ছে। সেখানেও খেলা প্রায় শেষ। মেয়েটা যথারীতি বাটি নিয়ে দর্শকদের কাছে ঘুরছে। মিশা হাঁফাতে হাঁফাতে ওর কাছে গিয়ে দশ কোপেক জড়ানো কাগজটা ওর বাটিতে ফেলে দেয়। তারপর বিড়বিড় করে বলে, 'শোন, আমি ভুল করে একটা কাগজ তোমার বাটিতে ফেলে দিয়েছি। ওটা ফেরৎ দিয়ে দাও। খুবই জরুরি কাগজ সেটা।' মেয়েটা ওর কথা শুনে হি হি করে হাসতে থাকে।

— 'কী কাগজ, বেশ মজার ছেলে তো তুমি ... কপালে কাটা দাগ কেন?'

— 'ওসব ছেড়ে দাও। ওটা শ্বেতরক্ষীদের কীর্তি। তুমি কাগজটা ফেরত দাও তো।'

মেয়েটার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। বলে, 'ও বাব্বা, তুমি বুঝি লড়াই করতে খুব ভালবাসো। আমি কিন্তু লড়ুয়ে ছেলেদের পছন্দ করি না বুঝলে।'

— 'আমার বয়ে গেল, চিঠিটা দাও তো', গম্ভীরভাবে বলে মিশা।

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকায়, বলে, 'তোমার কাগজটা চোখেই দেখিনি আমি। হয়তো বুশের কাছে আছে। আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি আমি।' এই বলে মেয়েটি ওই বাজিকরটার কাছে যায়। কিসব কথা কাটাকাটি হয় ওদের মধ্যে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝোলা থেকে হাতড়ে কাগজটা বের করে লোকটা। মেয়েটাকে দেয়। মেয়েটার হাত থেকে জুরবিনের চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে মিশা। পেছন থেকে খিলখিল করে হাসতে থাকে মেয়েটা। মিশার মনে হল ওই ছোট্ট গাধাটাও বুঝি ওকে দেখে হাসছে।

২২.

আর্ট সিনেমা

মিশা আসতেই মাথা ঘেঁষাঘেঁষি করে ওরা জুরবিনের চিঠিটা পড়ল। চিঠিতে লেখা আছে — 'কমরেড সাখারভ, ছেলেরা যে উদ্যম দেখিয়েছে তাতে তাদের সহায়তা করা দরকার। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে ক্লাবের ব্যাপারে। আপনি আমাদের ছেলেমেয়েদের একটা নাট্যচক্র গড়ে তোলার কাজে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। দেখবেন যেন কোনওরকম অন্যথা না হয়। — জুরবিন'

শুরা বলল, 'ব্যস, তাহলে তো সব ঠিকই হয়ে গেল। আমি আগেই জানতাম জুরবিন সাহায্য করবেন ঠিকই। কাল আমরা একটা উদ্বোধনী সভা করব। আজকের মতন চললাম আমি। আমার এখন তাড়া আছে, একটা সভায় হাজির থাকতেই হবে আমাকে।' শুরা চলে গেল। শুরা চলে যেতেই মুখ ভার করে গেঙ্কা বলল, 'দেখলি, কেমন ঠাট মারছে। যেন জরুরি সভায় সকলে ওর মুখ চেয়ে বসে আছে কখন উনি পায়ের ধুলো দেবেন। দরকার আচ্ছামতন ধোলাই দেওয়া, বুঝলি।'

সেদিন সন্ধেবেলা 'আর্ট' সিনেমা হলের পাথরের সিঁড়ির ওপরে বসে আড্ডা মারছিল মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভা। হালকা কুয়াশায় চারদিক ডুবে গেছে, উঠোনের ঠিক মাঝখানটা কালো হয়ে ফুটে আছে ফায়ার ট্যাঙ্কের লোহার ছাদটা। কে যেন কোথায় হালকা সুরে গিটার বাজাচ্ছে। মেয়েরা খিলখিল করে হাসছে, বিকেলের কলরব মিলিয়ে যাওয়ার আগে ওদের চারপাশকে যেন চঞ্চল করে তুলছে। গেঙ্কা বলল, 'জানিস মিশা, আমরা কিন্তু বিনে পয়সায় সিনেমা দেখতে পারি।'

— 'জানি', বলল মিশা, 'কিন্তু তার জন্য সারাদিন ঘাড়ে করে পোস্টার বয়ে বেড়াতে হবে, মজাটা টের পাবি।'

— 'ইস, ওই বাজিকরের মতন আমাদের যদি একটা গাড়ি থাকত। ওটাতে করেই পোস্টার নিয়ে ঘুরতাম, কী সুন্দর হত তাহলে।' গেঙ্কা বলে।

— 'ঠিক বলেছিস, আর তোকে আমরা ওই গাড়িটার সঙ্গে গাধা বানিয়ে জুতে দিতাম।'

স্লাভা ফোড়ন কাটে, 'তা কী করে হবে? লালচুলের গাধা হয় নাকি।'

গেঙ্কা মুখ ভার করে। বলে, 'হাসছিস তোরা, তো হাস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবি বরকা কাজটা ঠিকই পাবে। সিনেমার পাশও পেয়ে যাবে।'

মিশা বলল, 'দূর, ও দরখাস্তই করবে না। এখন ও ব্যস্ত ডাকটিকিটের ফাটকাবাজি নিয়ে। কোথা থেকে যে জোগাড় করে ওগুলো, কে জানে।'

গেঙ্কা বলল, 'আমি জানি। একজন পুরনো ডাকটিকিটওয়ালা আছে ওই দিকে। ওর কাছ থেকেই আনে।'

মিশা বলে, 'সে কী রে, আমরা তো বহু ঘুরেছি। কোনওদিন দেখতে পাইনি তো লোকটাকে।'

— 'তুই কী করে দেখা পাবি। লোকটা তো পেছনের দরজা দিয়ে যাতায়াত করে।'

মিশা বলে, 'তাই নাকি, তাহলে লোকটা চুরি করে বল। বেচে কিন্তু জলের দামে।'

— 'তা জানি না, তবে জানি লোকটা ওখানে যায়, আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

মিশা বলে, 'যাকগে, ও যা খুশি করুক। এখন শোন, জুরাবিন কি বললেন জানিস।'

— 'কী করে জানব, বললি কোথায় তুই।'

— 'শোন। ওই যে, ছেলেগুলো কাজ করছে বলেছিলাম না, ওদের নাম হয়েছে 'ইয়ং পাইওনিয়ার'। ওই নামেই ওদেব ডাকা হয়।'

— 'কী কাজ হয় বলতো।'

— 'সেটাও জানিস না নাকি। ওটা হল ছোটদের কমিউনিস্ট সংগঠন। বুঝলি। জুরবিন বললেন চক্র নিয়ে লেগে পড়, ক্লাবে যাও, দেখতে দেখতে তোমরাও ইয়ং পাইওনিয়ার হয়ে যাবে।'

— 'সত্যিই তাই বললেন?'

— 'হ্যাঁ রে।'

— 'তো, সংগঠনটা কোথায় আছে কিছু বললেন?'

— 'ওইদিককার একটা ছাপাখানায়। দেখলি কেমন গুছিয়ে সব খবর জোগাড় করলাম আমি। তোদের মতন নয়।'

স্লাভা মিশার মন্তব্যকে পাত্তাই দিল না, বলল, 'ওখানে গিয়ে দেখে এলে মন্দ হত না কি বলিস।'

— 'হ্যাঁ, মন্দ বলিসনি। কিন্তু ঠিকানাটা জোগাড় করতে হবে।' সবাই এরপর

চুপ করে যায়। ভেনটিলিটারের ফাঁক দিয়ে ওরা লক্ষ্য করল সিনেমাহলের ভেতরে কালো কালো মাথার সারি। আর সেই সারির ওপর দিয়ে উজ্জ্বল একটা রশ্মি গিয়ে টাঙানো পর্দায় পড়ছে। ওদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন স্লাভার মা। দেখতে সুখী, পোশাক আষাকও সুন্দর। মাকে দেখে স্লাভা দাঁড়িয়ে উঠল। হাতের কালো দস্তানাদুটো টানতে টানতে তিনি বললেন, 'স্লাভা এখনও বাড়ি যাসনি যে!'

— 'এক্ষুনি যাচ্ছি মা।'

— 'তাড়াতাড়ি চলে যাস। দাসা তোর খাবার দিয়ে দেবে। তারপর ঘুমোতে যাবে।'

স্লাভার মা চলে যেতেই একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

স্লাভা বলল, 'মা তো কনসার্টে যোগ দিতে গেল। চল আমরা বরং সিনেমায় যাই। 'খুদে লাল শয়তান'-এর দ্বিতীয় অংশটা দেখাচ্ছে।'

— 'পয়সা পাবি কোথায়।'

স্লাভা উশখুশ করে। বলে, 'মা আমাকে দু রুবল দিয়েছিল। ভাবছিলাম টাকাটা দিয়ে স্বরলিপির বই কিনব।'

গেঙ্কা লাফিয়ে ওঠে, 'দূর সব দোকান এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আর কোনও বই পাচ্ছিস না।'

— 'আরে, কালকেও তো কিনতে পারি নাকি।'

— 'সে কালকের কথা কাল ভাববি। আজ যখন সিনেমায় যাওয়ার সুযোগ রয়েছে চল সবাই মিলে সেখানেই যাই।'

টিকিট কেটে ওরা সিনেমা হলে ঢুকে পড়ল।

দেয়াল জুড়ে নামকরা সব চিত্রতারকাদের ছবি। পাশেই হলদে হয়ে যাওয়া পোস্টার এবং প্ল্যাকার্ড। একটা পোস্টারে একজন লাল ফৌজের একজন সৈনিক হাতে রাইফেল, ঘোড়সওয়ারের টুপি মাথায়। নীচে লেখা রয়েছে — 'আমরা স্বেচ্ছাসেবক হয়েছি। আপনারাও হবেন তো!' আরেকটা পোস্টার টাঙানো রয়েছে কেক মিঠাইয়ের দোকানের পেছনে। তার নীচে লেখা — 'কিশোর অপরাধ দূরীকরণের কাজে সহায়তা করুন।' হলের ভেতরে জগাখিচুড়ি ভিড়। ফৌজি সৈনিকরা, ওড়নি আঁটা কারখানার মেয়ে মজুর, রুশি কামিজ কুর্তা আর উঁচু বুট পরা জোয়ান ছেলেরা সব ভিড় করে সিনেমা দেখতে এসেছে। সিনেমার ঘন্টা বাজল। কে কোন ভাল আসন দখল করবে তার জন্য সবাই ঠেলাঠেলি করতে লেগে গেল। আলো নিভে যেতেই শুরু হয়ে গেল মেশিনের বাজখাই কটকট শব্দ, ভাঙা পিয়ানোর একঘেয়ে সুর কানে বাজছে। সরু সরু বেঞ্চে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে সবাই, ফিসফিস করে কথা বলছে আর সূর্যমুখীর বীচি চিবোচ্ছে। সিনেমা শো শেষ হতেই ছেলেরা ছুটে রাস্তায় নেমে এল। ওদের মন কিন্তু সিনেমার সেই 'খুদে লাল শয়তান' ছবির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। তাক লাগান রোমাঞ্চকর

অ্যাডভেঞ্চার। ছবিতে কমসোমল সদস্যদের দেখানো হয়েছে। ওদের সম্পর্কে ছেলেদের শ্রদ্ধা একশোগুণ বেড়ে গেল। মিশা ভাবছিল, ইস্ রেভস্কে থাকার সময় এত ছোট ছিল সে যে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেনি কিছুই। এখন ও ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে নিকিৎস্কিকে কীভাবে জব্দ করা যায়।

ছুটির প্রথম দিনটা এভাবেই কেটে গেল। বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, এবার বাড়ি ফিরতে হয়। আর্ট সিনেমার আলোই যা একটু রাস্তার সামনেটা আলো করে রেখেছে। বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো আবছা দেখা যাচ্ছে। দরজার গায়ে বাতাসে ফরফর করছে ছেঁড়া পোস্টারের টুকরোগুলো।

২৩.

নাট্যচক্র

পরের দিন সকালে মিশা উঠোনে নামতেই দেখল দারোয়ান ভাসিলি খুড়ো হাতুড়ি, পেরেক নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে। মিশা আর একটু এগিয়ে দেখল তলকুঠুরিতে ঢোকার রাস্তা তক্তা আর পেরেক মেরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মিশা খুব অবাক হয়ে ভাসিলি খুড়ো যেখানে হোসপাইপ দিয়ে আঙিনা পরিষ্কার করছিল সেখানে হাজির হল। বলল, 'খুড়ো, দাও না আমি একটু করি।'

— 'ভাগ এখান থেকে!' মিশা বুঝল খুড়োর মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে আছে। মিশা খুড়োকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'খুড়ো ছুতোর মিস্ত্রির কাজ ধরেছ তুমি।' রাগে গরগর করে উঠল খুড়ো। বলল, 'গুদোম ঘরের চিন্তায় কাঁটা ফিলিন। জোঁকের মতন পেছনে লেগেছিল। বাধ্য হয়ে তক্তা দিয়ে এঁটে দিলাম। ফিলিন বলে তলকুঠুরিতে চোর ঢুকতে পারে, তাই আমাকে তক্তাবন্ধ করতে হল। অথচ ভেতরে বলার মতন কিচ্ছুটি নেই। অদ্ভুত আবদার ছাড়া আর কি বলব বল।'

মিশা ভাবল, ও এই ব্যাপার। সেইজন্যই বরকা ওকে তলকুঠুরিতে ঢুকতে দেয় নি কাল। নিশ্চয়ই কোনও রহস্য রয়েছে এর পিছনে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, সিগারেট বিক্রি করছিল বরকা। মিশা ওকে দেখে বলল, 'এই বরকা, চল তলকুঠুরিতে যাই।'

'তা আর হচ্ছে না বুঝলি, দরজায় তক্তা এঁটে দিয়েছে।'

'কার হুকুমে।'

বরকা কাঁধ ঝাঁকাল, 'কার হুকুম, সে তো সবাই জানে, বাড়ির ম্যানেজারের।'

— 'কেন, কিসের জন্য?'

— 'কেন?' ভেংচাল বরকা, 'যাতে মড়াগুলো সব পালিয়ে না যায়, আর তোর মতন ছোকরারা যখন তখন হুটহাট করে ঢুকে না পড়ে।' বলেই পালাল বরকা। ওকে তাড়া করেও কোনও লাভ হল না মিশার। বরকা ওর বাবার গুদামঘরে

ঢুকে পড়েছে। মিশা ওকে শাসিয়ে ক্লাবঘরে চলে গেল। জুরবিনের চিঠিতে কাজ হয়েছে। সাখারভ ওদের জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তবে শাসিয়ে রেখেছে এই বলে যে, কোনও টাকাপয়সার ব্যবস্থা করা যাবে না। আর বলেছে যে থিয়েটার চালানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি হল টাকাপয়সা। ছেলেদের উচিৎ কারও ওপর নির্ভর না করে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই যেন করে নেয়। আরও কীসব বলেছে ছেলেরা কিছুই বুঝতে পারেনি। যারা যারা নাট্যচক্রে যোগ দিতে চায় তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখল শুরা। পুশকিনের কবিতা আবৃত্তি করতে দেওয়া হল। সবাই আবৃত্তি করল বটে কিন্তু শুরা খুব খুশি হল না। সে নিজেই আবৃত্তি করে দেখিয়ে দিল কীভাবে আবৃত্তি করতে হয়। 'আমার এ পাপ জিহ্বা ছিঁড়েছি দুহাতে টেনে' — অংশটা বলার সময়ে এমনভাবে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আবৃত্তি করল যে মনে হল বুঝি সত্যি সত্যি সে তার জিভটা টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খুবই বাস্তব হল ওর আবৃত্তি। এমন বাস্তব যে খুদে ভদকা এগিয়ে পরখ করল যে সত্যি সত্যি জিভটা ও টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে কি না। লোকজন বাছাই হওয়ার পরে শুরু হল নাটক বাছাইয়ের পালা। স্লাভার পরামর্শ হল —,'পাভেল ইভানভ' বইটা। শুনে শুরা বলল, 'দূর ওসব এখন আর লোকে চায় না, দেখে দেখে লোকের চোখ পচে গেছে। বস্তাপচা কূপমণ্ডুকের নাটক।' অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হল ওরা করবে 'কুলাক আর ক্ষেতমজুর' নাটকটা। ভালিয়া নামে একজন ক্ষেতমজুরের ছেলে কুলাক পাখোমের খামারে কাজ করত, সেই নিয়েই গল্প। কুলাকের পার্টটা নিল শুরা। গেঙ্কা হল ভালিয়া। ভালিয়ার দিদিমার ভূমিকায় নামল জিনা নামে একটা মোটা মেয়ে। একনম্বর ব্লকে থাকে আর খালি হি হি করে হাসে। মিশা লোক বাছাবাছির ব্যাপারে মাথা গলায়নি। মাথায় হাত দিয়ে শুধু ভেবেছে তলকুঠুরির কথাটা। বরকা ফিলিন ওকে ঠকিয়েছে। ইচ্ছে করেই ঠকিয়েছে। বাবাকে বলে দরজাটা বন্ধ করিয়েছে। তার মানে তলকুঠুরিটা আর গুদাম ঘরের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ আছে। যদিও গুদামটা পাশের ব্লকে। গুদামঘর ভর্তি লোহালক্কর আর মর্চে ধরা জিনিসপত্র, সেসব নিয়ে এত ভয়ের কারণ কী। রাজ্য জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো। কেউ মাথাও ঘামায় না। কারই বা দরকার। কে ওর ভেতরে খুঁজতে যাবে। বিশেষ করে যখন তলকুঠুরিতে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে চলতে হয়, প্রায় গোলকধাঁধায়। আর বরকার বাবা ওই ফিলিন লোকটা। পলেভয় হয়ত ওর কথাই বলেছিল। মিশার মনে পড়ল লোকটার চ্যাপ্টা চিমড়ে মুখ, জ্বলজ্বলে ছোট ছোট চোখ। শীতের সময়ে ফিলিন একবার ওদের ফ্ল্যাটে এসেছিল। বাবার ঘন নীল কোট প্যান্টলুন আর ওভার কোটের বদলে এক বস্তা মোটাদানার ময়দা দিয়ে গিয়েছিল। বাবা পোশাকটা দু একবার মাত্র ব্যবহার করেছিলেন। ফিলিন সেদিন চারদিকে তাকিয়ে আরও কী যেন খুঁজছিল। বাবার সেই শেষ স্মৃতিটা হাতছাড়া করতে মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেটা লক্ষ্য করে ফিলিন বলেছিল, 'এই

স্মৃতিচিহ্নটা কি আপনি মাখন লাগিয়ে খাবেন। খেতে মন্দ লাগবে না কি বলেন।' মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল, কোনও কথা বলেনি।

মিশা ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে যে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখবে ব্যাপারটটা কী। বরকা যেন না ভাবে যে ওকে এত সহজে ঠকানো যায়। মিশা উঠে ক্লাবঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। এখান থেকেও মাটির তলার চোরাকুঠুরিতে যাওয়ার কোনও রাস্তা আছে কি না কে জানে। ক্লাবটা আসলে বাড়ির আর একটা অংশের নীচের তলায়, তাই বাড়ির অন্যান্য অংশের সঙ্গে কোনও না কোনও যোগসূত্র থাকাটাই স্বাভাবিক। মিশা ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে করতে দেয়ালগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। পোস্টারের পেছনে, আলমারির আড়ালে, স্টেজের পেছনেও তেমন কিছু দেখতে পেল না। কতরকমের সিন যে সব জড়ো করে রাখা আছে একজায়গায়। সেগুলো কাটিয়ে এগুতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে সাখারভের গলা শোনা গেল। — 'সে কী মিশা, তুমি এখানে কি করছ।'

মিশার সঙ্গে সঙ্গে জবাব, 'দশটা কোপেক হারিয়ে গেছে। তাই খুঁজতে চেষ্টা করছিলাম।'

— 'দশটা কোপেক মানে!'

— 'দশটা কোপেক। মানে একটা দশ কোপেক পয়সা।' আর সেই মুহূর্তে চোখে পড়ল সাদা থামওয়ালা জমিদারবাড়ির একটা সিনের আড়ালে রয়েছে একটা লোহার দরজা।

— 'কী সব আবোল তাবোল বকছ।'

— 'কেন, একটা পয়সা হারিয়েছে, সেটাই খুঁজছি। এরমধ্যে গণ্ডগোল কোথায়।'

— 'অনেক গণ্ডগোল বুঝলে। যাক তাড়াতাড়ি পয়সাটা খুঁজে নিয়ে কেটে পড়।' বলে বেরিয়ে গেল সাখারভ।

২৪.

মাটির নীচের ঘর

মস্কো নদীর ধারে পুলের গা ঘেঁষে যে জলাধারটা, সেটার কাছাকাছি বসে ছিল মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভা। গেঙ্কা জলে কাত করে পাথর ছুঁড়ছে। স্লাভা অলসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মিশা ওদের অনেকক্ষণ ধরে সাধাসাধি করছে ওর সঙ্গে গিয়ে তলকুঠুরিটার রাস্তা খুঁজে বার করার জন্য। বিকেল শেষ হতেই দিনের আলো মিলিয়ে আসছে। পাতলা কুয়াশার কুণ্ডলীগুলো ফুলোন ধোঁয়াটে বলের মতন জলের ওপরটা ছুঁয়ে যাচ্ছে, আবার একটু ধাক্কা খেয়েই আবার

আলতোভাবে ফিরে যাচ্ছে বাতাসের মধ্যে। পুলের ওপর ট্রাম চলার শব্দ। পথিকদের ব্যস্ত ত্রস্ত ভাব, সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে মোটরগাড়ি। ওরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে এগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছে।

মিশা বলছিল, 'সব গাঁজাখুরি গল্প, মড়া আর কফিন, যত্তসব। যেন মড়া নিয়েই ফিলিনের যত সব মাথাব্যথা। সব যেন হচ্ছে আমাদের দূরে রাখার জন্যে। ইচ্ছে করেই করছে এগুলো। হয় কোনও সুড়ঙ্গ আছে, না হয়ত কিছু লুকোচ্ছে ওরা।'

গেস্কা ফোঁস করে ওঠে, 'বাজে তর্ক করিস না মিশা। এমন সব মড়া আছে যারা স্বস্তিতে ঘুমোতেও পারে না। আমরা ওখানে যাই আর হুড়মুড় করে ওগুলো আমাদের তাড়া করুক আর কী।'

স্লাভা বলল, 'মড়াটড়া অবশ্য নেই ওখানে। তবে সেটা নিয়েই বা মাথা ঘামাচ্ছি কেন আমরা? ধর ফিলিন কিছু লুকিয়েই রেখেছে ওখানে। সবাই জানে ও একটা ফাটকাবাজ। তা সেটা নিয়ে আমাদের এত ভাবনা কেন।'

— 'কিন্তু সত্যিই যদি নীচে এমন সুড়ঙ্গ থাকে যেটা সারা মস্কোর তলায় ছড়িয়ে আছে, তাহলে?'

— 'থাকলেই বা কী। নকশাটা কোথায়, সেটা তো পেতে হবে।'

মিশা উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'দূর ছাই। বুঝলাম তোরা সব ভীতুর ডিম। তোরা আবার ইয়ং পাইওনিয়ার হতে চাইছিস। কেন যে তোদের কাছে কথাটা তুলেছিলাম। মরুকগে, তোদের বাদ দিয়ে আমি নিজের রাস্তা দেখব।'

গেস্কা রেগে যায়, 'যাব না কখন বললাম তোকে। আমি তো শুধু মড়াগুলোর কথা বলছিলাম। একটুতেই এত রেগে যাস তুই। ওই স্লাভাটাই তো যেতে চাইছে না। তুই যখন বলবি তখনই যাব।'

স্লাভা লাল হয়ে বলে, ' আমি আবার কখন যাব না বললাম শুনি। শুধু বলছিলাম সঙ্গে নকশা থাকলে ভাল হত।'

থিয়েটারে অন্যরা সব মহড়া দিতে পৌঁছনোর আগেই ওরা পৌঁছে যায় ক্লাবঘরে। ছোটদের নাটকের মহড়া চলে বিকেলে, দুটো তিনটে নাগাদ। তারপর মালি ঝাঁট দিয়ে ক্লাবের দরজায় তালা মেরে রাখে পাঁচটা পর্যন্ত। তারপর আসে বয়স্করা। ওই চারটে থেকে পাঁচটায় ফাঁকা সময়ের মধ্যে ওরা ঠিক করল তলকুঠুরিতে ঢুকবে।

মিশা আর স্লাভা স্টেজের পেছনে গিয়ে লুকোল। গেস্কা অন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সবাই এলে মহড়া শুরু হয়ে যায় :

'ভালিয়া, তোকে তো আমি শাস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছি' — কুলাক

'আপনাকে তো আমি তা করতে বলিনি' — ভালিয়া

এরপরেই কুলাকরূপী শুরা আর তানিয়ারূপী গেস্কা এ দুজনের মধ্যে ঝগড়া

বেঁধে গেল। শুরার দিকে পিছন ফিরে কথা বলবে গেঙ্কা, না কি গেঙ্কার দিকে পিছন ফিরে কথা বলবে শুরা, এই নিয়ে তর্ক। মহড়ার চাইতে ঝগড়া হয় বেশি। মহড়া ছেড়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় শুরা। জ়িনা শুধু সারাক্ষণ খিল খিল করে হেসেই চলে। মহড়া শেষ হওয়ার পর সকলের অলক্ষ্যে গেঙ্কা মিশাদের সঙ্গে যোগ দেয়। অন্য ছেলে মেয়েরা চলে গেছে, মালি ঝাট দিয়ে দরজাটাও বন্ধ করল। ওরা তিনজন শুধু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল ওই লোহার দরজাটার সামনে। একটা সাঁড়াশি এনেছিল ওরা। সেটা দিয়ে একটা পেরেক খুলে ফেলে আস্তে টান মারতেই দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে খুলে গেল। সামনে তলকুঠুরিতে যাওয়ার রাস্তা। দরজাটা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে এল। ছোট একটা টর্চ জ্বালল মিশা। তারপর সবাই ভেতরে এগিয়ে গেল। টর্চের ব্যাটারিটা দুর্বল। তাই দেয়াল ভালভাবে লক্ষ্য করার জন্য ওদের ঝুঁকে পড়ে দেখতে হল। তলার কুঠুরিগুলোর একটাতে ঢুকে ওরা দেখল চৌকো চৌকো অনেকগুলো ঘর। বাড়ির ভিতের সঙ্গেই সেগুলো তৈরি হয়েছিল। সবকটা ঘরই খালি, একটাতে দুটো প্রকাণ্ড বয়লার। মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাইপ, জমে যাওয়া চুণ, ইঁট, কয়লা আর সিমেন্টভরা কাঠের বাক্স। টর্চটার তেজ কমতে কমতে একসময় নিভেই গেল। অন্ধকারেই চলতে হল ওদের। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে গলিঘুঁচির মোড় বোঝার চেষ্টা করে ওরা।

মিশা জেদের বশে এগিয়েই চলে, বাধ্য হয়ে স্লাভা আর গেঙ্কাকে ওর সঙ্গে তাল রাখতে হয়। সরু একটা ফাঁক দিয়ে আলোর একটা রেখা ওরা দেখতে পেল। এতক্ষণ পরে ওরা সেই তক্তা লাগানো দরজাটির কাছে এসে পৌঁছল। দরজার কাছে সরু একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। ধাপগুলো খুবই উঁচু উঁচু, লোহার হাত- রেলিং দেওয়া। ক্রমশ কুঠুরির আরও অনেকটা ভেতরে এগিয়ে গেল ওরা। রাস্তাটা ক্রমশ আরও সরু হয়ে এসেছে। মিশা ওপরে হাত তুলে ছাদটা ছুঁতে চেষ্টা করল, লোহার পাইপটাও। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পেল জলের কল কল শব্দ। মিশা গুটিশুটি হয়ে বসে পড়ে এবারে দেশলাই জ্বালল একটা। দেখল রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে ক্রমশ। বরকার সঙ্গে এসে এখানটাতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সরু রাস্তাটা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকল ওরা। কিনারায় এলে হাত উঁচু করে বুঝল ছাদ ছোঁয়া যাচ্ছে না। আর একটা দেশলাই জ্বালল মিশা। দেশলাইয়ের আলোতে ওরা দেখল একটা চারকোণা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছেছে ওরা। ছাদটা নিচু।

গেঙ্কা ফিসফিস করে বলল, 'ওই দেখ কফিন।' উলটোদিকের দেয়ালে বড় বড় কফিনের রেখাকৃতি দেখা যাচ্ছে। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেশলাইয়ের কাঠিটাও নিভে গেল। ওদের মনে হল অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত সব খস খস শব্দ

আর কবরখানার চাপা গলায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ওদের পা মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল। তারপর হঠাৎই মাথার ওপরে একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। একটা আলোর রেখা ক্রমশ চওড়া হয়ে উঠতে লাগল। তারপর কাদের যেন পায়ের আওয়াজ ওরা শুনতে পেল। অগত্যা একদৌড়ে ওরা সেই সরু রাস্তাটায় ফিরে এসে লুকিয়ে রইল। নিঃশ্বাস নিতেও যেন সাহস হচ্ছে না ওদের। ওরা দম বন্ধ করে দেখতে থাকে।

ছাদের ওপর থেকে একটা দরজা খুলে গেল। কে যেন একটা মই নামিয়ে দিচ্ছে। দুটো লোক সেই মই বেয়ে নেমে এল নীচে, তারপর ওপর থেকে কতকগুলো বাক্স নামিয়ে দেওয়া হল নীচে। থাক থাক করে সাজিয়ে রাখল ওরা বাক্সগুলো। অন্ধকারে ওই বাক্সগুলোকেই ওরা কফিন ভেবেছিল। কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় লোকটাও নীচে নেমে এল। মই থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেতেই জোরে গালাগালি দিয়ে উঠতেই ভয়ঙ্করভাবে চমকে ওঠে মিশা। লোকটার গলার আওয়াজটা খুবই চেনা মনে হচ্ছে। লোকটা খুবই লম্বা। বাক্সগুলো পরীক্ষা করল সে। তারপর জোরে নিঃশ্বাস টেনে জিজ্ঞাসা করল, 'দেশলাই জ্বালিয়েছিল কে এখানে।' মিশাদের বুক গুড়গুড় করে উঠল। একজন উত্তর দিল, 'স্বপ্ন দেখছেন নাকি সের্গেই ইভানভিচ'। ফিলিনের গলার স্বর চিনতে পারল ওরা।

— 'না, আমি কখনও স্বপ্ন দেখি না, জেনে রাখুন ফিলিন।' আর একটু পেছন দিকে সরে এল লোকটা। ওদের খুব কাছাকাছি। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, — 'রাস্তার মুখটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তো।' — 'হ্যাঁ, ঠিক যেমনটি হুকুম করেছিলেন। তক্তা এঁটে দিয়েছি দরজায়, রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' জবাব দিল ফিলিন। এরপর তিনজনই কব্জা আঁটা দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে উঠে মইটা টেনে নিল। দরজাটা বন্ধ করতেই অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। ওরাও কালবিলম্ব না করে ছুট লাগাল ক্লাব ঘরের দিকে। দরজা খোলা পেয়েই একছুটে রাস্তায় নেমে এল ওরা।

২৫.

সন্দেহজনক লোকজন

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। গরমের দিনের বৃষ্টি। বাড়িঘরের জানলা দরজা, গাড়ির বনেট, কালো সিল্কের ছাতা, নুড়ি পাথর সবই চকচক করছে এখন। রাস্তার জাফরি-লাগানো পাশ দিয়ে জল কাদার স্রোত নেমে যাচ্ছে কুয়োর দিকে। জল ছিটিয়ে হাতে জুতো নিয়ে মেয়েরা মহা স্ফূর্তিতে হাসতে হাসতে চলেছে রাস্তা দিয়ে। কয়েকজন রাজমিস্ত্রী মাথার ওপর বস্তার ঘোমটা চাপা দিয়ে। একটা

ফাটা পাইপ বেয়ে জলের ফোয়ারা পথচারীদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। ছিটকে সরে যাচ্ছে তারা। ছেঁড়াখোড়া ভারী মেঘগুলোকে সরিয়ে আকাশ জুড়ে আলোর ঝলমলে রেখা আঁকছে সতেজ সূর্য।

মিশা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে গেক্কা, খামোকা অমন ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলি কেন বলতো! চারদিকেই কফিন দেখিস তুই।'

গেক্কা প্রতিবাদ করে, 'তোরা ভয় পাসনি বলতে চাস? ভয় ঠিকই পেয়েছিলি। এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস। তবে আমি জানি ওই বাক্সগুলোর মধ্যে কি আছে।'

— 'কী।'

— 'সুতো, বুঝলি।'

— 'কেমন করে জানলি।'

— 'জানি, ফাটকাবাজরা এখন সুতোর কারবারই করছে বুঝলি। ওরা বলে ওতেই সবচেয়ে বেশি লাভ।'

মিশা শুনছে সব কথা, কিন্তু ওর কানের মধ্যে ওই তৃতীয় লোকটার অদ্ভুত পরিচিত গলার আওয়াজটা বেজেই চলেছে। কে হতে পারে লোকটা। নামটা তো পলেভয়ের, কিন্তু পলেভয় হতেই পারে না। নামের মিল রয়েছে এইমাত্র। 'আর্ট' সিনেমার সামনে যথারীতি ওরা দাঁড়িয়েছিল সেদিন। মিশার চোখ গুদামঘরের দরজার দিকে। বোর্ডের ওপরে মারা দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো দেখছিল গেক্কা আর স্লাভা। ভোলগা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ নিয়ে সিনেমা দেখান হচ্ছে। উরা নামের ছেলেটি ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ওর বাবা 'কান গলা নাক'-এর ডাক্তার। উরা একসময়ে বয়স্কাউট ছিল। এখন স্কাউট উঠে গেছে। স্কাউটের পোশাকও তাই পরে না আজকাল। তবু সকলের কাছে ওর নাম হয়ে গেছে উরা স্কাউট। দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একটা নিশান উড়িয়ে ওরা চলেছে।

গেক্কা ওদের দেখে ধমকে ওঠে, 'এই স্কাউট, ভাল চাস তো লাঠিটা দে।'

নিশান ধরে টান মারল সে। কিন্তু লাঠিটার অন্যদিকটা প্রাণপণে চেপে ধরল উরা আর ওর বন্ধুরা। তিনজনের বিরুদ্ধে গেক্কা একা। সে মাথা ঘুরিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল একবার। ওরা কেউ ওকে সাহায্য করতে আসছে না। স্লাভা নির্বিকারভাবে তাকিয়েই থাকে। মিশা বলল, 'ছেড়ে দে গেক্কা।' ছেড়ে দেবে মানে। কোন এক জেনারেলের সমর্থক এরা, পেটোয়া লোকজন, বুর্জোয়া তো অবশ্যই। গেক্কা প্রাণপণে লাঠিটা চেপে ধরে থাকে আর ছেলেগুলোর দিকে হাত পা ছুঁড়তে থাকে। মিশা চিৎকার করে ওঠে, 'ছেড়ে দে গেক্কা।' অগত্যা লাঠিটা ছেড়েই দিল গেক্কা। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ঠিক আছে, পরে দেখবখন।'

উরাও কম যায় না, বলে, 'আয়না দেখি, তোকে থোরাই পরোয়া করি

আমি।' বন্ধুদের নিয়ে চটপট সরে পড়ে উরা। অবাক হয়ে মিশার দিকে আড়চোখে তাকায়, গেঙ্কা। কিন্তু মিশা ওদের কাউকেই পাত্তা দিল না। মিশা দেখছিল গুদামঘর থেকে একটা রোগা ঢ্যাঙা লোক উঁচু বুট আর ককেসিয় জুতো পরা, রুপোর কাজ করা কালো বেল্ট পরে বেরিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। হাতের পিছনে মুখটা আড়াল করে রাস্তাটা একবার দেখে নিল। তারপর আরবাত স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। মিশা ওর পিছনে রাস্তা পেরোতে না পেরোতে চলন্ত ট্রাম গাড়িতে উঠে চলে গেল লোকটা। মিশা রাস্তায় সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুরল ফিরল। একটা অজানা ভয় ওকে চেপে ধরছে। গির্জার গম্বুজে ডুবে যেতে থাকা সূর্যের আলো যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গরমকালের সন্ধ্যার গরম হাওয়া, রাস্তার গলা অ্যাসফাল্টের গন্ধ, আর নুড়িপাথর ছড়ানো রাস্তার ধুলো উড়ে আসছে। সবুজ বুলেভার্ডে নিশ্চিন্তে খেলছে ছেলেমেয়েরা, বুড়িরা বেঞ্চিতে বসে রয়েছে। মিশা ভাবছে তো ভাবছেই। আরে, লোকটার গলার আওয়াজ এতটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন। কোথায় ও লোকটার গলা শুনেছে। মাটির তলার কুঠরিতে ফিলিনরা কী জিনিস লুকিয়ে রাখছে। হয়তো বা তেমন কিছুই নয়। শুধু গুদামঘর হিসেবেই ব্যবহার করছে জায়গাটা। আর গলার আওয়াজটা চেনা সেটা ওর মন গড়াও হতে পারে। কিন্তু লোকটা যদি নিকিৎস্কি হয় — না, সে কি সম্ভব। চেহারাটাই সেরকম নয়। মুখের সেই কাটা দাগটা কোথায়। কপালের ওপরে ঝুলে পড়া চুল। না লোকটা নিকিৎস্কি নয়। তাছাড়া লোকটার নাম তো সের্গেই ইভানভিচ। নিকিৎস্কি কি মস্কোতে এত খোলামেলাভাবে ঘুরতে সাহস পাবে। মিশা একটা স্কোয়ার পেরিয়ে আর একটায় পৌঁছল। সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়ার পাশে বইওয়ালাদের দোকান। কোলকুঁজো, কুঁচকে যাওয়া মুখে চশমা আঁটা বুড়োরা একমনে বই পড়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলে দলে শ্রমিক ফ্যাকাল্টির লোকজন বেড়িয়ে আসছে। ওদের গায়ে রুশি কামিজ আর চামড়ার জ্যাকেট, বগলে ছেঁড়াখোঁড়া ব্রিফকেস। বলশায়া নিকিৎস্কায়া রাস্তার মুখটাতে একটা মিছিল মিশার রাস্তা আটকে দিল। ওরা পাশের মহল্লার মজুর। ফেস্টুন নিয়ে চলেছে, ফেস্টুনে লেখা, — 'আঁতাতের ভাড়াটে দালালরা নিপাত যাক!' 'আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরেরা নিপাত যাক!' ওদের লক্ষ্য ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের দিকে, যেখানে কয়েকজন বিপ্লবীর বিচার চলছে। আরও কয়েকটা মিছিল আসছে চারদিক থেকে। লাল পতাকায় পতাকায় ছেয়ে গেছে চারদিক। কমসমোলের সদস্যরা উত্তেজিতভাবে হাত পা ছুঁড়ে আলাপ আলোচনা করছে। মাঝে মাঝেই অস্থায়ী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। ওরা বলছে — 'ব্রিটিশ আর মার্কিন পুঁজিপতিরা সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবী বেইমানদের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে টুঁটি টিপে মারতে চেয়েছিল।

সামনাসামনি লড়াইয়ে তারা হেরে গেছে। সোভিয়েত দেশের ওপর থাবা বসাবার ফন্দি নষ্ট হয়েছে। এখন তাই ওরা আমাদের দেশে গুপ্তচর আর গুপ্তবিনাশকদের পাঠাচ্ছে। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটছে'। মিশা ভাবছিল নিকিৎস্কি খুব সম্ভবত বিদেশে পালিয়ে যায়নি। কোথাও এখানেই লুকিয়ে আছে, আর ষড়যন্ত্র আঁটছে ঠিক এই লোকগুলোর মতই যাদের বিচার হচ্ছে। নিকিৎস্কি ছিল শ্বেতরক্ষী, সোভিয়েত শাসনের চরম দুশমন — যদি ওই ঢ্যাঙা লোকটা সত্যি সত্যিই নিকিৎস্কি হয় আর এই ফিলিনই যদি সেই ফিলিন হয় যার কথা পলেভয় ওকে বলেছিল। সেক্ষেত্রে নিকিৎস্কি নিশ্চয়ই ফিলিনের বাড়িটাকেই গোপন আড্ডা হিসেবে ব্যবহার করছে। ছদ্মবেশে লুকিয়ে রয়েছে, নামটাও বদলে নিয়েছে আর তলকুঠুরিটা ব্যবহার করছে শ্বেতরক্ষী ডাকাতদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্য। সত্যিই ব্যাপারটা সন্দেহজনক তো বটেই বিপজ্জনকও কম নয়। ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের দরজায় লাল ফৌজ ওকে আটকে পাশ চাইল। মিশা কটমট করে তাকিয়ে সরে যেতে বাধ্য হল। ভাবল তোমরা সারাদিন এই একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু পাশই দেখে যাচ্ছ, কী করেই বা বুঝবে যে মিশা খুব শিগগিরই একটা বিশাল চক্রান্ত উদঘাটিত করতে চলেছে!

২৬.

দড়ির খেলা

ফিলিনের গুদামঘরের দেয়াল ওপাশের আঙিনা পর্যন্ত চলে গেছে। ফটক খুব চওড়া আর জানলাগুলো তক্তা দিয়ে ঢাকা। ওপাশের দিকটা ভর্তি রাজ্যের জঞ্জাল, লোহা লক্কর। টুকরো টাকরা টিন কলকব্জা সব ছড়ানো। মিশা এখন গুদামঘরের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে। একবার ভেতরেও ঢুকতে গিয়েছিল কিন্তু ফিলিন তাড়িয়ে দিয়েছে। অগত্যা দূর থেকেই নজর রাখছে দরজাটার ওপর। দিনের পর দিন সিনেমার দরজায়, সরাইখানা কিংবা রুটির দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ও সারাক্ষণ লক্ষ্য রেখেছে, কিন্তু সেই ঢ্যাঙা লোকটার আসার কোনও নামই নেই। মিশা ভাবল আর একবার তলকুঠুরিতে ঢুকবে, কিন্তু গিয়ে দেখল ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা এবারে সত্যি সত্যিই বন্ধ করে রাখা হয়েছে। থিয়েটারের রিহার্সেলও শেষ হতে চলল। অভিনয়ের দিন এগিয়ে আসছে। শুরা ভারী বিরক্ত করছে সাজ আর রং কিনে দেওয়ার জন্য। শুরা অনুযোগ করছিল — 'মিশা তুই তো ম্যানেজার, সাজ সরঞ্জাম, রং এসব তো তোরই জোগাড় করে দেওয়ার কথা। সিন সিনারি না হয় আমরাই ব্যবস্থা করে নেব কিন্তু সাজবার রং না হলে কী করে হবে। বিশেষ করে পরিচালনার কাজ নিয়ে কী দারুণ ব্যস্ত থাকতে হয় সেটা তো তুই জানিসই।'

সাধারণভ টাকা দিতে রাজি হয়নি। মিশা ঠিক করল লটারি করে টাকা তুলবে। লটারির পুরস্কারের জন্য গোগোলের সেটটা হাতছাড়া করতেই হবে। খুবই কষ্ট হচ্ছে অবশ্য, কিন্তু অন্য উপায় তো নেই। ওদের নাটক করাটা তো আর বন্ধ করে দিতে পারে না। তাছাড়া ওরা তো সবসময়েই বুলি কপচাচ্ছে, — 'ত্যাগ স্বীকার না করলে শিল্প হয় না।'

টিকিটের দাম ঠিক হল তিরিশ কোপেক। একশোটা টিকিট দেখতে দেখতে বিক্রি হয়ে গেল। টিকিট কেনেনি শুধু বরকা, লটারি বানচাল করতে প্রাণপণ চেষ্টাও চালিয়েছে। রটিয়ে দিয়েছে যে লটারিটাই ফাঁকি, প্রাইজ উঠবে মিশারই নামে। সব টাকাগুলো মিশাই মেরে দেবে। গেঙ্কা আর মিশার কাছে রাম ধোলাই খাবার পরেও এই বদনাম করার কাজ শেষ পর্যন্ত ছাড়েনি। বরকার এখন বন্ধু বলতে উরা স্কাউট। নাটকের ছেলেমেয়েদের মন অন্য দিকে টানার জন্য ওরা একদিন দড়ির একটা রাস্তা বানাল। আঙিনার ওপর দিয়ে ধাতুর তার দিয়ে তৈরি দড়ির রাস্তাটা। একদিকটা একটা বাড়ির দোতলার উঁচুতে বাঁধা, অন্যদিকটা নীচের গাছের ডালে। তারটার ওপরে ছোট চাকা বসানো আছে, সেখান থেকে ঝুলছে আর একটা দড়ি। দড়িটার একটা দিকে একটা ফাঁস। ওই ফাঁসটার মধ্যে বসে ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে নামাটাই হল খেলা। বরকা আর উরার সঙ্গে অন্য ছেলেরাও ওই খেলায় মেতে ওঠে। ওরা যখন খেলা শুরু করে তখন আশেপাশের সবাই ভিড় করে খেলা দেখতে আসে। উরার সঙ্গে পরামর্শ করে বরকা হঠাৎ খেলাটা বন্ধ করে দেয় বলে, 'না বিনে পয়সায় এরকম খেলা চালানো যাবে না। যে চড়বে তাকে পাঁচ কোপেক পয়সা দিতে হবে। না থাকলে মিশার লটারির টিকিট ফেরত দিয়ে পয়সা আনতে পারে। প্রথমে ইয়েগরকা মিশার কাছে এল, পেছন পেছন ভাসকা। পয়সা চায় টিকিট ফেরতের বদলে। কিন্তু গেঙ্কা হাজির হল ঠিক সময়টাতে। বলল, 'না পয়সা ফেরত দেওয়ার কোনও নিয়ম নেই। কাউন্টার ছাড়ার আগে পয়সা বুঝে নিতে আগেই বলা হয়েছে।' গেঙ্কা বলার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল বেঁধে গেল। বরকা সুযোগ বুঝে চেঁচাতে লাগল — 'দিনদুপুরে ডাকাতি।' ইয়েগরকা আর ভাসকা পয়সা ফেরত চাইতে থাকে। উরা পিছনে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। গেঙ্কাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিশা। পকেট থেকে টাকাগুলো বের করল, সবশুদ্ধ তিরিশ রুবল। ওর কাণ্ড দেখে সবাই চুপ করে যায়। মিশা টাকাটা পাথর চাপা দিয়ে সিঁড়ির ওপরে রাখল। তারপর সকলের দিকে ফিরে বলল, 'তোদের পয়সা আমাদের চাই না। ফেরত নিতে পারিস। তবে তার আগে একটু মাথা খাটিয়ে ভেবে দেখ বরকা কেন আমাদের নাটকটা ভেস্তে দিতে চায়। উরা বয়স্কাউট ছিল, সবাই জানে ওটা বুর্জোয়াদের কাজ। ওরা আসলে চায় না যে আমরা আমাদের নিজেদের ক্লাব গড়ি। আর বরকার চরিত্র নিয়ে কোনও কথা না বলাই ভাল।

অতএব যাদের বিবেক বলতে কিছু নেই তারা অনায়াসে টিকিট ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে পারিস।' লম্বা বক্তৃতা করে মিশা আঙিনায় ছেলেদের দিকে পিছন ফিরে চলল। কিন্তু এরপর পয়সা ফেরত নিতে গেল না কেউ। সবাই এমন ভাব করতে লাগল যে পয়সা ফেরত নেওয়ার কথা ভাবেইনি। ইতিমধ্যে গেঙ্কা দোতলায় উঠে দড়ির বাঁধা দিকটা খুলে ফেলে দিল। বরকা হাঁই হাঁই করে ওঠে। গেঙ্কা ছুটে যায় বরকার দিকে, বলে, 'এত গরম দেখাচ্ছিস কাকে। ভেবেছিস আমরা কিছু জানি না, না। সব্ব জানি। তলকুঠুরি আর বাক্সের কথা বুঝলি।' শুনে থমকে গেল বরকা। আর একটা কথাও না বলে দড়ি তার সব গুটিয়ে কেটে পড়ল সেখান থেকে।

২৭.

গোপন রহস্য

খুব রেগে যায় মিশা. গেঙ্কাকে বলে, 'এটা কী হল। সব গোপন কথা ফাঁস করে দিলি কার হুকুমে।'

গেঙ্কাও সাফাই গায়, 'ওই বরকাটার ফোঁপর দালালি সহ্য করতে হবে, বলতে চাস? আমি মুখ বুঁজে থাকি আর থিয়েটারটা পণ্ড করুক আর কী।'

সবাই তখন স্লাভার ফ্ল্যাটে জড়ো হয়েছে। সুন্দর সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। মেঝেতে কার্পেট পাতা, টেবিলে বাহারে বাতিঢাকনা, সোফায় রংচং বালিশ। পিয়ানোর সামনে বসে রয়েছে গেঙ্কা। স্বরলিপির বইগুলোর মলাটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। ও বুঝতে পেরেছে যে বড় একটা ভুল করে বসেছে। তাই মনের বোকামি ভাবটা আড়াল করার জন্য অনবরত বকবক করেই চলেছে। একটা স্বরলিপির বইয়ের ওপর লেখা 'পাগানিনি'। গেঙ্কা ওটা পড়ে বলল, 'পাগানিনি আবার কে।' স্লাভা বুঝিয়ে বলে, 'পাগানিনি একজন নামজাদা বেহালাবাজিয়ে। একবার ওর শত্রুরা কনসার্টে বাজানোর আগে ওর বেহালাটার তার ছিঁড়ে রেখেছিল। একটা তার নিয়েই উনি এমন বাজিয়ে গেলেন যে কেউ বুঝতেই পারল না।'

— 'সে আর এমন কি ব্যাপার। বাবার ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান, পানফিলভ নাম, সে বোতল শিশি দিয়ে যে কোনও সুর বাজাতে পারত। তোর পাগানিনি বোতল দিয়ে বাজনা বাজাতে পারে?'

স্লাভা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তোর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, তুই গানবাজনার কী জানিস!'

— 'তো, আমি কি একটা কথাও বলতে পারব না, নাকি?'

মিশা গম্ভীরভাবে বলল, 'শোন গেঙ্কা, কথা বলার আগে একটু ভেবে চিন্তে

কথা বলবি। তা যদি করতিস তাহলে বরকার কাছে বাক্সগুলোর কথা ফাঁস করে দিতিস না।'

স্লাভা ফোড়ন কাটল, 'বিশেষ করে যখন বাক্সগুলোতে কিছুই নেই।'

গেঙ্কা আপত্তি করে, 'না খালি নয়, সুতো ভর্তি।'

— 'অত হলপ করে বলছিস কেন, ঠিক জানিস ?' স্লাভা জিজ্ঞাসা করে।

— 'না, আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

মিশা বলল, 'যা জানিস না তাই নিয়েই বকবক করে যাচ্ছিস। বাক্সগুলোতে রয়েছে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।'

— 'কী'।

— 'হ্যাঁ, বলে দিলাম আর কী। তারপরই তো ঢাকঢোল পিটিয়ে লোককজনদের জানাতে আরম্ভ করবি।'

— 'দিব্যি করছি, কাউকে বলব না। বললে এখানেই যেন মরে যাই ...'

— 'ওরকম দিব্যি তুই যমের দোরে যাওয়া অব্দি করে যেতে পারিস। তবু তোকে বলব না। কারণ, তুই কোনওদিনই পেটে কথা রাখতে পারবি না।'

স্লাভা বলল 'আমাকে তো বলবি। আমি তো আর কাউকে কিছু বলিনি।'

মিশা চটে ওঠে, 'না, কাউকে কিছু বলব না। কোনও জরুরি ব্যাপারেই তোদের বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।'

বন্ধুরা গুম হয়ে অভিমান করে বসে রইল। শেষমেশ স্লাভা বলল, 'সে যাই বলিস, নিজেদের মধ্যে কিছু লুকিয়ে রাখাটা ভাল না। আমরা তিনজনই তো তলকুঠুরিতে গিয়েছিলাম। তাই একজনের কাছে অন্যজনের কথা গোপন করা ঠিক নয়।'

গেঙ্কা সাফাই গাইতে চেষ্টা করে, 'কী করে বুঝব ওটা গোপন কথা। মিশা তো সাবধান করে দেয়নি। ও নিজেই লুকোচ্ছে আর সব দোষ চাপাচ্ছে আমার ওপর।'

মিশা বেশ ভাবনায় পড়ল কথাগুলো শুনে। ওরই উচিত ছিল ভালভাবে স্লাভা আর গেঙ্কাকে সাবধান করে দেওয়া। ঠিক বন্ধুর মতন ব্যবহারও ও করেনি ওদের সঙ্গে। উচিত ছিল বন্ধুদের ওপরে আস্থা রাখা। কিন্তু ছোরার ব্যাপারটা তো খুবই গোপনীয়। সেটাও কি বলা উচিত ছিল! অবশ্য ও জানে যে ওদের দুজনের কেউই ব্যাপারটা চাউর করে দিত না ঠিকই। আর গেঙ্কাও যদি সব ঘটনা জানত তাহলে নিশ্চয়ই বাইরে বলে বেড়াত না। ছোরার কথাটাও জানিয়ে দেওয়া উচিত কিনা বুঝতে পারছিল না মিশা। তাই ও ভাবল প্রথমে ফিলিন আর নিকিৎস্কির কথা বলা যাক। তবে ছোরার কথাটা জানা থাকলে ওরাও হয়ত সাহায্য করতে পারত। একা একা তো লড়াই করা যায় না। তবু গেঙ্কার দিকে তাকিয়ে মিশা বিড়বিড় করতে করতে বলল, 'ঘাড়ে মাথাটা শুধু বয়ে বেড়ানোর জন্য নয় বুঝলি, ওটার সদ্ব্যবহার করা উচিত। আহা বেচারি,

ওকে তো আগে থাকতে সাবধান করে দেওয়া হয়নি।' মিশার কথায় একটা আপোসের আঁচ লক্ষ্য করে গেঙ্কা আর স্লাভা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

গেঙ্কা বলে, 'আমার কথা তুই একটু ভেবে দেখ। আমি কী করে জানব বল। তুই যে আমাদের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখছিস সেটাই তো মাথায় আসেনি। আমরা তো কোনওকিছু লুকোই না তোর কাছ থেকে।'

স্লাভাও আহত গলায় বলে, 'যাক গে, যদি আমাদের কাছ থেকেও তোর লুকোবার কিছু থাকে, তো বলারই বা কী আছে বল।'

মিশা বলল, 'ঠিক আছে, বলব তোদের। কিন্তু মনে রাখিস সাংঘাতিক গোপন খবর একটা। যে আমাকে ভরসা করে বলে গেছে, সে কিন্তু হেঁজিপেঁজি কেউ নয়, স্বয়ং পলেভয়। সেই আমাকে গোপন খবরটা দিয়েছে।'

এর আগে পলেভয় সম্পর্কে অনেক গল্প ওরা শুনেছে মিশার কাছ থেকে, ফলে ওদের দুজনেরই চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে গেল। মুখ হাঁ হয়ে গেল।

মিশা বলল, 'ব্যাপারটা হল এই, বুঝলি। এখন তোরা আমাকে কথা দে যে কাউকে কিছু বলবি না।'

গেঙ্কা বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'হলপ করছি আমি।'

স্লাভাও বলল, 'দিব্যি কাটছি আমি।'

মিশা উঠে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেল। সাবধানের দরজা খুলে বারান্দাটা দেখে নিল একবার। তারপরে জোরে দরজাটা আটকাল। সতর্কভাবে ঘরের চারপাশ লক্ষ্য করল, সোফার নীচে দেখল। শোবার ঘরের দরজাটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কেউ আছে নাকি?'

— 'না।' স্লাভা ফিসফিস করে জবাব দেয়।

মিশা নিচু গলায় বলতে শুরু করল, 'শোন তাহলে। নিকিৎস্কির দলের ডান হাত যে তার নাম ... তার নাম ফিলিন। এবারে বুঝলি তো।'

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল ওরা দুজন। পিয়ানোর টুলটা শক্ত করে ধরে বসে রইল গেঙ্কা, ওর শরীর সামনে ঝুঁকে পড়েছে, মুখখানা হাঁ, চোখদুটো ভাঁটার মতন বড় বড়। এমনকি ওর মাথার চুলগুলোও যেন অদ্ভুতভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে। আর স্লাভাও এমনভাবে চোখ পিট পিট করছে যেন কেউ ওর চোখে একমুঠো বালি ছুঁড়ে দিয়েছে। মিশা বুঝতে পারল ওরা বেশ ভালরকমই নাড়া খেয়েছে। সেটা আরও জোরদার করার জন্য বলল, 'আর আমার মনে হচ্ছে, যে লম্বা ঢ্যাঙা লোকটাকে আমরা তলকুঠুরিতে দেখেছিলাম, যার গলার স্বর আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছিল, সেই — আসলে সেই হচ্ছে নিকিৎস্কি স্বয়ং।'

গেঙ্কা শুনে টুল থেকে পড়ে যায় আর কী। আর স্লাভা দাঁড়িয়ে উঠে ফ্যালফ্যাল করে মিশার দিকে তাকিয়ে থাকে। বলল, 'সত্যি বলছিস তো, না কি মজা করছিস আমাদের নিয়ে।'

মিশা বলল, 'বেশ বললি, তোদের সঙ্গে ঠাট্টা করব। তাছাড়া এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা করা যায়, তোরাই বল।' ওর গলার স্বর শুনেই চিনতে পেরেছিলাম। চোখে দেখতে পাইনি ঠিকই, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, ওই লোকটাই নিকিৎস্কি।'

অবশেষে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল গেঙ্কার। চিঁ চিঁ করে বলল, 'এক্কেবারে আক্কেল গুড়ুম করে দিলি আমার, মিশা।'

'হ্যাঁ, তোর আক্কেলের গুড়ুম হওয়াই ভাল, বিশেষ করে তোর ওই জিভটার জন্য।'

স্লাভা বলল, 'এক্ষুণি তাহলে মিলিশিয়াকে খবর দেওয়া উচিত আমাদের।'

মিশা রহস্যভরা চোখে জবাব দিল, 'না, এখনই সেটা আমরা করতে পারি না।'

— 'কেন পারি না?'

— 'পারি না,' আবার বলল মিশা।

— 'কিন্তু কেন বলবি তো।'

— 'এক নম্বর যে সেটা করার আগে সবকিছু স্পষ্ট করে জেনে নিতে হবে আমাদের', এড়িয়ে যেতে চাইল মিশা।

স্লাভা কিন্তু অনড় ওর কথায়, 'অত পরিষ্কার করে জানারই বা কী আছে, তা তো বুঝি না। যদি নিকিৎস্কি ঠিক নাও হয়, ফিলিন লোকটা তো সত্যি।'

স্লাভা কিছু ভুল বলছে না বুঝতে পারছে মিশা, কিন্তু সে নিজেও তো মনে মনে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না যে ওই লোকটাই সেই শয়তান ফিলিন, না কি অন্য কেউ।'

মিশা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'পুরো ঘটনাটাই বলা হয়নি। চল, আমার বাড়িতে।'

সবাই মিশার বাড়িতে চলে এল। উঠোনটা পেরোনর সময় গেঙ্কা একবার সন্দেহজনকভাবে দেখে নিল। এর মধ্যেই ওর মনে হাজারটা কল্পনার ভূত সওয়ারি হয়ে চেপে বসেছে। ও ভাবছে এই বুঝি নিকিৎস্কি স্বয়ং ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

২৮.

সাঙ্কেতিক লিপি

মিশার বাড়িতে এসে ওরা টেবিলটা ঘিরে বসে পড়ল। সন্ধে হয়ে গেছে, কিন্তু কোনও আলো জ্বালায়নি মিশা। দম বন্ধ করে মিশাকে লক্ষ্য করতে থাকে স্লাভা আর গেঙ্কা। খুব সাবধানে মিশা দরজার আঁকড়া তুলে দিল, তারপর জানলার পর্দা টেনে দিল। ঘরটা প্রায় পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে যায়। সবদিক থেকে সাবধান হয়ে বইয়ের তাক থেকে ওর সেই পুঁটলিটা টেনে বের করে টেবিলে

রাখল মিশা। রহস্যময় চাপা গলায় মিশা বলে, 'এই দেখ।' পুঁটলিটা ও খুলে ধরল ওদের সামনে। গেল্কা আর স্লাভা টেবিলে পারলে প্রায় শুয়ে পড়ে। মিশার হাতে সেই ছোরা।

গেঙ্কা ফিসফিস করে বলে, 'এ যে দেখছি একটা ছোরা।'

মিশা মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বলল, 'আস্তে, এই দেখ,' ছোরার ফলার গায়ে খোদাই করা চিহ্নগুলো দেখাল ও, — 'এই দেখ, নেকড়ে, কাঁকড়াবিছা আর পদ্ম। দেখেছিস, এবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ...' বলতে বলতে নাটকীয় ভঙ্গিতে ও ছোরার বাঁটটার প্যাঁচ খুলল। ভেতর থেকে একটা পাতলা ধাতুর পাত বের করে টেবিলের ওপর সমান করে মেলে ধরল।

মিশার দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল স্লাভা 'সাঙ্কেতিক লেখা।'

— 'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে মিশা বলল, 'এটা সাঙ্কেতিক লেখা, আর এ লেখার অর্থ বোঝার সূত্রটা আছে ছোরার খাপের মধ্যে, বুঝেছিস? আর নিকিৎস্কির কাছে আছে সেই খাপ, এই হল ব্যাপার, এবার শোন্ ...'

চোখ ঘুরিয়ে, হাত নেড়ে নেড়ে, প্রায় শুনতেই পাওয়া যায় না এমনি গলায় মিশা ওর বন্ধুদের কাছে 'রানি মারিয়া' জাহাজের কথা, জাহাজ ধ্বংস হওয়ার কথা আর ভ্লাদিমির নামে সেই অফিসারকে খুন করার কথা খুলে বলল। ছেলেরা পাথরের মতন মুখ করে বসে রয়েছে। অদ্ভুত কাহিনীটা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে। ঘরটা এতক্ষণে পুরোদস্তুর অন্ধকার। বাড়িতে যেন আর কোনও জনপ্রাণীও নেই এমন মনে হচ্ছে। শুধু জলের কল থেকে একটা চাপা কলকল শব্দ নিস্তব্ধতা ভাঙছে। গেঙ্কা হঠাৎ বলে ওঠে, 'লোকটা নির্ঘাত নিকিৎস্কি। ফিলিন আর নিকিৎস্কি তো একটা দলের লোক তাই না রে মিশা!'

মিশা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'তোদের তো সব কথাই বললাম। তাই এটাও বলা ভাল যে আমি নিজে এখনও নিশ্চিন্ত নই যে ওরাই সেই নিকিৎস্কি আর ফিলিন কিনা।'

— 'জানিস না মানে', গেঙ্কা আর স্লাভা দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে।

— 'মানে যা বললাম। পলেভয় আমাকে শুধু নামটাই বলেছিল। ফিলিন নামে তো হাজারটা মানুষ রয়েছে। এই লোকটাই সেই ফিলিন কি না সেটাই তো আগে নিশ্চিত করা দরকার। তবু আমার মনে হচ্ছে এই সেই লোক।'

স্লাভা বলে, 'এটা একটা অঙ্কের মতন হয়ে গেল না।'

গেঙ্কা রেগে ওঠে, 'এর মধ্যে আবার অঙ্ক টানছিস কেন! এই ফিলিনই নিকিৎস্কির ডানহাত ফিলিন নিশ্চয়। কোনও সন্দেহ নেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে লোকটা একটা আস্ত বদমাশ।'

— 'মনে হতে পারে, কিন্তু প্রমাণ করা যায় না।' স্লাভা তর্ক জুড়ে দেয়।

মিশা বলল, 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম যে কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু একটা হিসেব কষে দেখা যাক : লোকটার নাম ফিলিন, লোকটা ফাটকাবাজ, অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্রের লোক; দ্বিতীয় হল লোকটা নোংরা কাজ আড়াল করছে কি না — খুব সম্ভবত করছে। তলকুঠুরিতে ওদের বাক্স রয়েছে অথচ দরজা আটকে দিয়েছে; তৃতীয়, ঢ্যাঙা লোকটাও সন্দেহজনক চরিত্রের। কেমন চোরের মতন এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে সরে পড়ে। তারপর গলার স্বর। আমি গলার স্বর চিনি। যদি ধরেই নিই যে ও নিকিৎস্কি নয়, তাহলেও একটা খারাপ চক্র যে ওই তলকুঠুরিতে বসে খারাপ কাজ করছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হয়ত ওরা শ্বেতরক্ষী, কিংবা গুপ্তচর। আমরা হাত গুটিয়ে বসেই থাকব নাকি ওদের মুখোশ খুলে দেব।'

গেঙ্কা ওর কথায় সায় দেয়, 'হ্যাঁ, ওই দলটাকে আমাদের ধরতেই হবে। খাপটা কেড়ে নিয়ে গুপ্তধন আমরা তিনজনে সমান ভাগে করে নেব।'

— 'রাখ তোর গুপ্তধন। কাজে বাগড়া দিস না।' মিশা খুব রেগে গিয়ে বলে, 'আমরা মিলিশিয়াকে খবর দিতে পারি। কিন্তু সবটাই যদি মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়, তখন কি হবে। আমরা একেবারে বোকা বনে যাব। না, প্রথমে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, বুঝতে হব ওই লোকটাই আমাদের ফিলিন কিনা। তলকুঠুরিতে ওরা কী লুকিয়ে রাখে। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে ককেশিয় কুর্তা পরা ওই ঢ্যাঙা লোকটার ওপর নজর রাখা, ওর আসল পরিচয় বের করা।'

স্লাভা বলল, 'ব্যাপারটা সহজে হবে না, বুঝলি।'

আরও কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু গেঙ্কার চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, 'দলটার আসল চেহারা আমাদের খুলে দিতে হবে। তবে খুব সাবধানে মতলব ভাঁজতে হবে আমাদের।'

মিশা স্লাভার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস তুই। সব কিছু আগেভাগে ছক বেঁধে তৈরি রাখতে হবে। আমাদের মধ্যে একজন পালা করে নজর রাখবে, খুব সাবধানে, যাতে ফিলিন বা বরকা কেউই না সন্দেহ করতে পারে। তারপর যখন গোটা দলটার হদিশ পাব, সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন চটপট খবর দেব মিলিশিয়াকে, চেকাকে।'

গেঙ্কা স্ফূর্তিতে লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'দারুণ কাজ হবে একটা। গোটা দলটাকে পাকড়াও করতে পারব আমরা।'

মিশা বলল, 'আলবৎ, এইভাবেই তো বদমায়েশদের দলকে পাকড়াও করতে হয়। তখন আমাদের যথার্থ পরিচয় সকলে জানতে পারবে। এ তো আর মিথ্যে তড়পানি নয় — একটা কাজের মতন কাজ।'

তৃতীয় পর্ব

নতুন বন্ধুদের দল

২৯.

এলেন বুশ

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে মিশা আর স্লাভা স্মলেনস্কি বাজারে গেল সাজের রং কিনতে। ফিলিনের গুদামঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মিশা দেখল গেঙ্কা গেটের সামনেটায় পায়চারি করছে।

শুরা ওকে ডেকে বলল, 'আরে এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন! চল আমাদের সঙ্গে, বাজারে রঙ কিনতে যাচ্ছি আমরা।'

গেঙ্কা উত্তর দিল, 'না রে, বড্ড ব্যস্ত আছি এখন' বলে রহস্যময় চোখে মিশার দিকে তাকাল সে।

মিশা আর শুরা বাজারে পৌঁছল। বাজার ভর্তি লোক। দোকানে দোকানে খদ্দেরদের ভিড়। বাউণ্ডুলে ছোকরা ক'জন ভিড়ের ভেতরে ঘোরাঘুরি করছে। তারস্বরে গ্রামোফোন বাজছে। দুএকজন ঘড়ির দামদস্তুর করছে। ছন্নছাড়া পোশাক পরা সাবেকি আমলের টুপি মাথায় বেঁধে বুড়িরা ভাঙা তালা আর পেতলের মোমদানি বিক্রি করছে। গাঁয়ের একটা ছেলে একটা হারমোনিয়ামের দামদস্তুর করতে করতে ঘামে ভিজে গেছে। সঙ্গীতপিপাসুরা ওকে ঘিরে রয়েছে আর বেচারা একই গৎ ক্রমাগত বাজিয়েই চলেছে। কাছেই একটা টিয়াপাখি ঠোঁট দিয়ে ভাঁজ করা খাম তুলে নিচ্ছে। সেই খামে ভূতভবিষ্যৎ সব বিশদভাবে লেখা রয়েছে। বাহারে ওড়না আর চওড়া ঘাগরা পরা জিপসি মেয়েরা যাতায়াত করছে। মিশা আর শুরার মনে হল এই বাজারটার বুঝি শেষ বলতে কিছু নেই। সূর্যমুখির বীচি ছড়ানো রাস্তার পাশে পাশে বাজারটা চলেছে তো চলেইছে। রাস্তাটা গেছে নভিন্স্কি বুলেভার্দ অবধি। পৌর প্রতিষ্ঠানের মজুররা সেখানে জঞ্জাল ফেলা বাক্স বসিয়েছে আর চকচকে তার দিয়ে ঘিরে দিয়েছে আধমরা ঘাসগুলোকে।

'থিয়েটারের যাবতীয় জিনিস' — সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে একটা দোকানদার বসেছিল। মিশা আর শুরা সেই দোকানটায় ওদের জিনিসপত্র খুঁজতে থাকল। সেই সময় কে যেন মিশার কাঁধে হাত রাখল। মিশা পিছন ফিরে দেখে যে সেই খেলুড়ে মেয়েটা। পরনে সাধারণ পোশাক, মোটেই অভিনেত্রীর মতন দেখতে লাগছে না।

হাত বাড়িয়ে মেয়েটা বলল, 'এই যে দাঙ্গাবাজ মশাই।'

মিশার এইরকম সম্বোধন একদম ভাল লাগল না। তাই কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে উত্তর দিল, 'এই যে।'

— 'এত গোমড়া কেন মুখখানা?'

— 'কই না তো, আমি সবসময়েই এইরকম।'

— 'কী নাম তোমার?'

— 'মিশা।'

— 'আমার নাম এলেন।'

— 'ওটা আবার একটা নাম হল!'

— 'ওটাতো আমার থিয়েটারের নাম — এলেন বুশ। সব অভিনেত্রীদেরই ওরকম একটা আলাদা নাম থাকে। আমার আসল নাম ইয়েলেনা ফ্রলোভা।'

— 'তোমার সঙ্গে যে খেলা দেখাচ্ছিল সে কে?'

— 'ইগর, আমার ছোটভাই।'

— 'আর ওই দাড়িগোঁফ কামানো লোকটা।'

— 'কোন দাড়িগোঁফ কামানো লোক?'

— 'আরে, তুমি খেলা দেখানোর সময়ে যে পাশে দাঁড়িয়েছিল। ও কি তোমার দলের মালিক নাকি।'

— 'দূর, ও তো আমার বাবা।'

— 'তাহলে বুশ বলে ডাকছিলে কেন ওকে।'

— 'বললামই তো, বুশ হল আমাদের থিয়েটারি নাম।'

— 'এখনও কি তোমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেলা দেখাচ্ছ?'

— 'নাঃ। বাবা একটা কাজ নিয়েছেন। মরশুম শেষ হলেই সার্কাসে খেলা দেখাব আমরা। তুমি কোনওদিন সার্কাসে গেছ?'

— 'নিশ্চয়, এখন তো আমরা আমাদের বাড়িতেই একটা নাট্যচক্র খুলেছি। এ হল আমাদের স্টেজ ম্যানেজার।' শুরাকে দেখিয়ে দিল মিশা। শুরা বেশ মুরুব্বি চালে সামনে চলে এসে মাথা নোয়াল।

মিশা বলল, 'আমাদের প্রথম অভিনয় রোববারে বুঝলে। নাটকটাও ভাল। তোমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসো। অভিনয় শেষ হলে তোমরাও খেলা দেখাবে।'

ইয়েলেনা বলল, 'ঠিক আছে বলব বুশকে।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের কত দেবে তোমরা।'

— 'কত দেব মানে।'

— 'মানে খেলা দেখানোর জন্য কত টাকা দেবে।'

— 'টাকা, পাগল নাকি, ভোলগা অঞ্চলের উপোস করা ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা অভিনয় করছি। আমাদের সকলেই বিনে পয়সায় অভিনয় করছে।'

মাথা ঝাঁকাল ইয়েলনা, বলল, 'জানি না বুশ রাজি হবে কি না।'

— 'তাহলে তোমাদের আসার দরকার নেই। তোমাদের বাদ দিয়েই আমাদের চলবে। যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের জন্য অন্যরা যতটুকু পারে দিচ্ছে, আর তাতেও তোমরা ভাগ বসাতে চাও। লজ্জা করে না তোমাদের?'

— 'বাব্বা, অত রাগ কোর না বাপু। কী কড়া মেজাজ রে বাবা। আচ্ছা একটা মতলব ভেঁজেছি। ইগর্ আর আমি বেড়াতে বেরোনর নাম করে তোমাদের কাছে চলে আসব। হল তো!'

— 'ঠিক আছে।'

— 'তাহলে এখন চলি।' বলে ইয়েলেনা মিশা আর শুরার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিল, তারপর আবার বলল, 'তবে দোহাই তোমার, অত মেজাজ দেখিও না।'

— 'আমার মেজাজ খারাপ নয় একটুকুও।' মিশা বলল।

ইয়েলেনা চলে যাওয়ার পর মিশা শুরাকে বলল, 'মেয়েরা ভারী জ্বালাতন করে, তাই না রে!'

৩০.

কেনা কাটা

ইয়েলেনা চলে গেলে ওরা আবার রঙের দিকে নজর দেয়। রং বাছে। রং পেন্সিলের একটা বাক্স নাড়াচাড়া করে শুরা বলে, 'এগুলোই সবচেয়ে ভাল হবে। এই রংটার নাম 'বেগনি-লাল'। এটা নিয়ে নে রে মিশা।'

মিশা পকেটে হাত দিয়েই চমকে ওঠে, দেখে ব্যাগটা নেই। প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে যায় আর কী। ভীষণ ঘাবড়ে যায়। তারপর ভিড়ের ভেতর একটা বাউণ্ডুলে ছেলেকে ঢুকতে আর বেরুতে দেখে ওর সম্বিত ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে মরীয়া হয়ে চিৎকার করে ছেলেটাকে ধরার জন্য দৌড় লাগায়। দোকানের সারি থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় ছেলেটা। চট করে একটা গলিতে ঢুকে ছুটতে থাকে। মিশাও ওকে ধাওয়া করে যায়। লম্বা বড় কোট পরে থাকার জন্য ছেলেটার ছুটতে অসুবিধা হচ্ছে। কোটের ফুটো দিয়ে নোংরা তুলোর আস্তর বেরিয়ে পড়ছে, লম্বা হাতাদুটো মাটিতে লুটোচ্ছে। পাশেই একটা উঠোনের মধ্যে ছুটে যায় ছেলেটা। কিন্তু মিশা কিছুতেই ওর পিছু ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত একটা ফাঁকা জায়গায় মিশা ধরে ফেলে ছেলেটাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে মিশা চিৎকার করে ধমক লাগায়, 'দে, ফিরিয়ে দে বলছি ওটা।'

— 'ছুঁসনি আমাকে। আমি পাগল।' চিৎকার করে ওঠে ছেলেটা। এই বলে সাদা চোখদুটো গোল গোল করে ঘোরায়। কালো ঝুলকালি মাখা মুখখানা তাতে আরও ভয়ঙ্কর দেখায়। দুজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। ছোকরাটা চিল চেঁচিয়ে মিশাকে কামড়াতে চেষ্টা করে। মিশা ওকে মাটিতে ফেলে বিশাল কোটের ভেতরে ব্যাগটা খোঁজে। কোটের হাতাটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই ভেতর থেকেই ব্যাগটা বেরিয়ে পড়ে। ব্যাগটা তুলে নিয়েই রাগে গা শিরশির করে ওঠে মিশার। নাট্যচক্র গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওরা, সেটা প্রায় ভণ্ডুল করে দিয়েছিল আর কী! সবাই ভাবত ও নিজেই টাকাটা মেরে দিয়েছে। ছিঁচকে চোরটাকে আচ্ছামতন ধোলাই দেবে ঠিক করল মিশা। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েই থাকে ছেলেটা। ওর নোংরা ঘাড়টা দেখে মনে হয় ছেলেটা রোগা, কঙ্কালসার ওর চেহারা। মিশা ভাবল, ঠিক আছে, ঘায়েল হয়ে যাওয়া কারও ওপর হাত ওঠাবে এমন বান্দাই সে নয়। বলল, 'খুব শিক্ষা হয়েছে তো, জীবনে আর চুরি করবি না তো?' ছেলেটা তবু পড়েই থাকে যেমন ছিল। মিশা ফিরে যাওয়ার জন্য কয়েক পা এগোয়। তারপর আবার কী ভেবে ফিরে আসে।

— 'এই ওঠ তো, ভান করে শুয়ে থাকতে হবে না।'

ছেলেটা উঠে বসল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাতের মুঠো দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'প্রাণ ভরে গেছে তো। আর কী চাই?'

— 'আমার ব্যাগটা চুরি করেছিলি কেন। আমি কি কিছু করেছিলাম তোর?'

— 'চুলোয় যা তুই।'

— 'গালাগাল না যদি থামাস, তাহলে আরও কয়েক ঘা বসিয়ে দেব কিন্তু বলে রাখছি।'

বলল বটে কিন্তু মিশার মনে বিন্দুমাত্র রাগ আর নেই। ও জানে ছেলেটার গায়ে আর ও হাত তুলতে পারবে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। কোটটা খুলে গেছে, বড় হাতাটা ছিঁড়ে গেছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে উলঙ্গ একটা জীর্ণ রোগা শরীর। মিশা ওর ছেঁড়া আস্তিনটা হাতে নিয়ে বলল, 'কী করে সেলাই করবি এটা।' ছেলেটা কোনও কথা বলল না, শুধু মুখ ঘুরিয়ে ছেঁড়া আস্তিনটা একটু দেখল।

মিশা বলল, 'আমার কথা শোন, আমাদের বাড়িতে আয়, আমার মা ওটা তোকে সেলাই করে দেবে।'

সন্দেহের চোখে ছেলেটা ওর দিকে তাকায়, বলে, 'বাঃ, ধরিয়ে দেওয়ার মতলব এঁটেছিস, তাই না।'

— 'আরে না, কথা দিচ্ছি, তোর নাম কী?'

— 'মিখাইল।'

— 'বাঃ, আমারও ওই একই নাম। আমাদের ক্লাবে আয় না।'

— 'হ্যাঁ, ক্লাবে যাওয়ার জন্যই তো জন্ম থেকে অপেক্ষা করে আছি কি না।'

— 'ছাড় ওসব কথা। ওখানকার মেয়েরা এক নিমেষে তোর কোটটা সেলাই করে দেবে।'

— 'হ্যাঁ, বললাম তো ওইজন্যই জন্ম থেকে অপেক্ষা করে আছি।'

— 'ঠিক আছে ক্লাবে না যেতে চাস তো আমার বাড়িতে আয়। আমাদের সঙ্গে খাবি।'

— 'হ্যাঁ, ওটাই যা বাকি।'

— 'তুই তো আচ্ছা একগুঁয়ে।' চটে ওঠে মিশা। 'আয়, চল তো,' বলে ওর ছেঁড়া আস্তিনটা ধরে টান মারে। — 'এই ওঠ তো ছোকরা।'

ছেলেটা আঁতকে উঠে বলে, 'এই ছাড়। জামাটা ছাড় দেখি।'

কিন্তু বলতে বলতেই মিশার টানে দ্বিতীয় হাতটাও ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। দুটো আস্তিনই ছিঁড়ে যেতে ছেলেটার রোগা সরু হাত দুটো বেরিয়ে থাকে।

মিশা একটু থমকে যায়, 'এই দেখ। কি হল। তোকে বললাম না আসতে।'

— 'তুইই তো আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিলি।'

আস্তিনদুটো দু হাতে তুলে নিয়ে মিশা বলল, — 'এবারে তো তোকে যেতেই হবে মিখাইল। না গেলে আস্তিনদুটো দেবই না আমি। আস্তিন ছাড়াই কোটটা পরতে হবে তোকে।'

৩১.

মিখাইল করোভিন

ছেলেটাকে তো সঙ্গে নিল। ওকে পাশে নিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে মিশা ভাবছিল না জানি মা কী বলবে। খুব সম্ভবত দুজনকেই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবে। যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর তো কোনও উপায় নেই। গেস্কার ঘাঁটির সামনে গিয়ে মিশা স্লাভার হাতে লটারির সব টাকা গুণে দিয়ে বলল, 'এই নে সব টাকাটাই দিয়ে গেলাম। ওটা সঙ্গে রাখ। শুরা এলে ওকে বলবি রংটং সব কিনে নিতে। আমার সময় নেই। কাজ আছে, চলি এখন।' ওরা সবাই নতুন ছেলেটাকে-দেখে হাঁ হয়ে যায়।

বাড়িতে পৌঁছেই মিশা মিখাইলকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বলল, 'মা, এই ছেলেটা আজকে আমার সঙ্গে খাবে।' মা কিছু বলল না। মিশা আবার বলল, 'আমি ওর কোটের আস্তিনদুটো ছিঁড়ে ফেলেছি মা। ওর নাম মিখাইল।'

— 'পদবি কী?' মা জিজ্ঞাসা করল।

গম্ভীর মুখে ছেলেটা উত্তর দেয়, 'করোভিন'।

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'বেশ বেশ, তা কমরেড করোভিন, আপনি তাহলে একটু হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আসুন।'

মিশা ওকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেল, করোভিন কিন্তু হাত মুখ পরিষ্কার করার কোনও আগ্রহই দেখাল না। অবশ্য দেখালেও কোনও লাভ হত বলে মনে হয় না, কারণ যে পরিমাণে নোংরা ওর সারা শরীরে জড়িয়ে রয়েছে, সেটা পরিষ্কার করা চাট্টিখানি কথা নয়। একটু পরে ওরা খাওয়ার ঘরে এসে ঢুকল। খাওয়ার টেবিলে বসে করোভিন গম্ভীর মুখে খেতে শুরু করে। টেবিলে যেখানটায় ও কনুইয়ের ভর দিয়েছে, সেখানটায় কালো গোল গোল দাগ পড়ে গেল। মিশাও চুপটি করে খেয়ে নিচ্ছে। শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে মায়ের দিকে চেয়ে দেখছে। করোভিনের কোটটা মা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রেখে আস্তিন দুটো সেলাই করছে। মায়ের কুঁচকে ওঠা মুখের ভাব দেখে মিশা বুঝতে পারে যে করোভিন চলে গেলেই বেশ একহাত অপ্রীতিকর আলোচনার সূত্রপাত হতে চলেছে। তাই সে একটা কথাও না বলে চুপচাপ খাওয়া শেষ করছে। ঝোল শেষ করার পর মা একথালা আলুভাজা দিয়ে গেল। মিশা থালাটা ঠেলে সরিয়ে দেয়।

— 'থাক না, পেট ভরে গেছে আমার।'

— 'খা না, অনেকটাই তো আছে, সকলের হয়ে যাবে।'

আস্তিনদুটো সেলাই করার পর মা এখন কোটের হাতার আস্তর দুটো সেলাই করছে। করোভিন খাওয়া শেষ করে টেবিলে চামচ নামিয়ে রাখল। কোটটা

হাতে নিয়ে মা করোভিনকে বলল, 'এই নাও তোমার কোট, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এরকম গরমের সময়ে এই ভারী কোট পরতে কষ্ট হয় না তোমার।'

করোভিন কোনও উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'নাঃ, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

— 'তোমার কোনও আত্মীয় স্বজন নেই?'

করোভিন চুপ।

— 'মা, বাবা কেউ না?' করোভিন ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। জবাব দেয়ার বদলে ফোঁস ফোঁস করে কান্না চাপছে মনে হল। মায়ের দিকে না তাকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মিশা। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় চললি রে তুই এখন।' প্রশ্নটা শুনে ছেলেটা যেন অবাক হয়ে গেল। কোটটা জাপটে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা আসি কেমন।'

মিশা ওর পেছন পেছন গেল। বলল, 'একটু দাঁড়া, এখানটায় এত অন্ধকার।' বলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'যখনই ইচ্ছে হবে চলে আসবি, বুঝলি। আমাকে সব সময়েই হয় বাড়িতে নয়তো উঠোনে পাবি।'

মিশার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ছেলেটা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

৩২.

মায়ের সঙ্গে কথা

মিশা যখন ঘরে ঢুকল মা তখন সেলাই কলের সামনে বসে সূঁচে সুতো পরাতে ব্যস্ত। জানলার পাশে পরন্ত বিকেলের রোদে সেলাই মেশিনটা ঝকঝক করছে। মিশা একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করে। ঘরের ভেতরটা চুপচাপ। শুধু সেলাই মেশিনটা মা যখনই চালাচ্ছে তখনই একটা গুঞ্জন উঠছে। মিশা জানে কপালে বকুনি আছে আজ, তা থেকে রেহাই নেই। মা একসময়ে মুখ খুলবেই। মিশা ভাবছিল এই বকুনি পর্ব একটু তাড়াতাড়ি চুকে গেলে হয় না!

অনেকক্ষণ পরে মুখ না ফিরিয়েই মা প্রশ্ন করেন, 'ওর সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোর।'

— 'বাজারে, আমার টাকা চুরি করেছিল।' শুনে মা কলটা থামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, 'কোন টাকা?'

— 'লটারির। তোমাকে তো আগেই বললাম না, শুরা আর আমি রং কিনতে বাজারে গেছিলাম।'

— 'ও, তা টাকাটা ফিরিয়ে দিয়েছে?'

মিশা হাসল, বলল, 'আমি ধরে ফেলেছিলাম, তাই অমনি একটু হাতাহাতিও হল ...'

— 'এই ভাবেই বুঝি পরিচয় হল তোদের।' মা মাথা নেড়ে আবার কলটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর আবার বলল, 'মজা মন্দ নয় কী বলিস। রাস্তার বাউণ্ডুলে ছোকরাদের সঙ্গে লড়াই, ভালই তো।'

— 'না মা কেউ আমাদের দেখেনি। একটা ফাঁকা জায়গায় হাতাহাতি হল। তাছাড়া আমরা তো লড়িনি। আমি ওকে মাটির ওপরে ঠেসে ধরেছিলাম, ব্যাগটা উদ্ধার করার জন্য।'

— 'তা ঠিক। কিন্তু কী ভেবে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলি বলতো! এখানেও কিছু চুরি করুক সেই জন্য?'

— 'চুরি ও করত না মা।'

— 'কী করে জানলি।'

— 'আমার মনে হল তাই বলছি।'

তারপর আবার চুপচাপ, শুধু সেলাই করার শব্দ। মিশা অস্বস্তিবোধ করে, বলে, 'খুব বিরক্ত হয়েছ মা?' মিশার কথার জবাব না দিয়ে মা পাল্টা জিজ্ঞাসা করেন, — 'আচ্ছা ওকে এখানে কেন আনলি বল তো।'

— 'তা জানি না।'

মা ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'ওর জন্য খুব কি দুঃখ হচ্ছিল তোর?'

মিশা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'দুঃখ কেন হবে। ওই একটু ... . ওর আস্তিনগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলাম আমি, সেলাই করা দরকার, তাই।'

— 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' ফের সেলাই কল চালু করে মা। কলের ভেতর থেকে সাদা কাপড়ের ডাঁই বেরিয়ে আসতে থাকে। চেয়ারের পাশে ঢেউ খেলে ভাঁজ হয়ে যায়। মিশা বলে, 'মনে হচ্ছে ওকে এনেছিলাম বলে তুমি খুব রাগ করেছ।'

— 'আমি তো সে কথা বলিনি। তবে পরিচয়ের ব্যাপারটা সুখকর নয়। তাছাড়া তুই ওকে এখানে থাকার কথা বলছিলি। ওটা বলার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল বুঝলি। এই বাড়ির ব্যাপারটাতে আমারও কিছু বলার আছে, তাই না?'

মিশা মেনে নিয়ে বলল, 'সেটা ঠিকই মা, কিন্তু আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবে যে, ও আবার কোথায় চুরি চামারি করবে।'

মা বিষয়টাতে সায় দেন। বলেন, — 'হ্যাঁ, দুঃখ হওয়ারই কথা। অনেকে আবার এসব ছেলেমেয়েদের ঘরেও জায়গা দিচ্ছে। কিন্তু, তুই তো আমাদের নিজেদের অবস্থাটা ভাল করেই জানিস, আমরা পারব কীভাবে।'

মিশা বলল, 'অল্পদিনের মধ্যেই ওরা সব ছেলেকেই রাস্তা থেকে ঘরে তুলে নেবে দেখে নিও। এর মধ্যে কতগুলো শিশু আবাসও খুলেছে, তুমি জানো?'

মা উত্তর দেন, 'তা জানি না ঠিক। কিন্তু এসব ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে লিখিয়ে মানুষ করা সহজ কাজ নয়। রাস্তায় রাস্তায় বাউণ্ডুলেপানা করে করে এরা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে।'

— 'জানো মা, মস্কোতে একদল ছেলে আছে যাদের ওরা ইয়ং পাইওনিয়ার বলে। কতকটা কমসমোলের সদস্যদের মতই। ওরা অনাথ ছেলেদের মধ্যে কাজ করে, অবশ্য এটা সেটা আরও অনেক ধরনের কাজই করে। আমি, গেঙ্কা আর স্লাভা ঠিক করেছি ওদের সঙ্গে যোগ দেব। ঠিকানাও পেয়েছি। পান্তেলোয়েভ্কায়। রোববার আমরা যাব সেখানে।'

— 'আরে সে তো অনেকটা দূর।'

— 'তাতে আর কী হল। এখন তো গরমের ছুটি, হাতে অঢেল সময়। আর চোদ্দো বছর বয়স হলেই কমসমোলে যোগ দেব।'

চোখ তুলে মিশার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মা।

— 'এর মধ্যেই কমসমোলে ঢোকার ইচ্ছে হয়েছে।'

— 'এখন নয়, এখন তো নেবেই না আমাকে। পরে ...'

— 'কমসমোলে ঢুকলে দিনরাত এত ব্যস্ত থাকবি, আমার দিকে ফিরেও তাকাবি না।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন মা, করুণভাবে হেসে ফেলেন।

মিশাও হাসে, বলে, 'তা হবে কেন মা। তোমার কাছে থাকার অনেক ফুরসত পাব।' বলেই লজ্জা পেল মিশা। তাড়াতাড়ি একটা বই খুলে বসে।

সেলাই কলের হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে মা বলল, 'ঠিক আছে, দেখব সময় হলে।'

মায়ের দিকে লুকিয়ে তাকাল মিশা। কাজের মধ্যে ডুবে গেছে মা। শক্ত করে বাঁধা বাদামি চুলের খোঁপা সবুজ ব্লাউজের ওপরে এসে পড়েছে। জামাটা চকচকে, ছিমছাম, ইস্ত্রি করা, কলারে কোনও ভাঁজ পড়েনি।

মিশা উঠে পা টিপে টিপে মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। দুহাতে মায়ের কাঁধ জড়িয়ে তার চুলের ওপরে গালটা চেপে ধরল। হাঁটুর ওপরে সেলাইটা রেখে মা জিজ্ঞাসা করেন, 'কীরে, কী হল তোর, অ্যাঁ?'

মিশা বলল, 'জানো মা, আমি কি ভাবছিলাম।'

— 'কী।'

— 'তোমাকে শুধু সত্যি জবাব দিতে হবে, হ্যাঁ কিংবা না।'

— 'বেশ তো দেব, এখন বল।'

— 'তুমি আমার ওপর একটুও রাগ করনি তো, তাই না, সত্যি বল।'

মা ধীরে ধীরে মিশার হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করে। মিশা কিন্তু জোরে চেপে ধরে মায়ের কাঁধ। বলে, 'না বল, আগে বলতে হবে। আরও কি ভাবছি তুমি জানো।'

— 'কী।'

— 'ভাবছি, তুমি হলেও ঠিক একই কাজ করতে। করতে কি না বল। ঠিক বলেছি না।'

ওর হাতদুটো ছাড়িয়ে চুল সমান করতে করতে মা বলল, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তবে দেখিস বাড়িটাকে একপাল বাউণ্ডুলের আড্ডাখানা তৈরি করিস না যেন।'

৩৩.

কালো পাখা

আঙিনা থেকে গেঙ্কা ডাকল, 'মিশা!'

জানলা দিয়ে মিশা মাথা বাড়াল। দেখল ওদের জানলার দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে গেঙ্কা।

— 'কী ব্যাপার গেঙ্কা, কী চাই তোর।' মিশার একটুও বেরোতে ইচ্ছে করছে না এখন।

— 'তাড়াতাড়ি নেমে আয়, খুব জরুরি কথা আছে।' বলে গেঙ্কা ফিলিনের গুদামঘরটার দিকে ইশারা করে। — 'বুঝেছিস তো।'

মিশা ঘর থেকে একছুটে নীচে নেমে এল। উঠোনে পৌঁছতেই গেঙ্কা বলল, 'জানিস ওই ঢ্যাঙা লোকটা কোথায় আছে?'

— 'কোথায়?'

— 'সরাইখানায়।'

দুজনে রাস্তায় এসে সরাইখানার সামনে দাঁড়াল। বিশাল জানলার মধ্য দিয়ে ওরা দেখল ছোট ছোট মার্বেলের টেবিলগুলো ঘিরে লোকজন বসে আছে। ভেতরের ছাদে প্লাস্টারের মূর্তিগুলোকে মনে হচ্ছে যেন তামাকের ধোঁয়ার নীল ঢেউয়ের ভেতর সাঁতার কাটছে। ওরা দেখতে পেল ফিলিন একটা টেবিলে বসে আছে, কিন্তু একা, ওর সঙ্গে আর কেউই নেই। মিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কই রে গেঙ্কা তোর লোকটা কোথায়?' গেঙ্কা খুবই হতভম্ব হয়ে গেছে। বলল. 'আরে এতক্ষণ তো এখানেই ছিল। ফিলিনের ঠিক সামনের চেয়ারটায় বসেছিল। কোথায় যেতে পারে এর মধ্যে?'

মিশা বলল, 'যদি এখানেই থাকে তাহলে খুব একটা বেশি দূরে যাবার কথা নয়। তুই বাঁ দিক দিয়ে স্মলেনস্কায়া স্কোয়ারের দিকে যা, আমি ডানদিক দিয়ে আরবাত স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছি। বলেই মিশা হনহন করে হাঁটতে লাগল। মিশা খুব জোরে পা চালিয়ে হনহন করে আরবাত স্কোয়ারের দিকে চলছিল। রাস্তার প্রত্যেকটি লোককে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল সে। পাশের একটা গলি পেরোনোর সময় ও দেখল একটা লোক বাঁকটা ঘুরেই একটা সিঁড়ির কাছে আর একটা

গলির মধ্যে জোর পায়ে ঢুকে পড়ল। মিশাও ছুটল গির্জার দিকে। তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল যে ঢ্যাঙা লোকটা খুব জোরে আর একটা রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। মিশাও অনুসরণ করল ওকে। সেখান থেকে এই গলি সেই গলি ঘুরে অস্তোজেঙ্কা স্ট্রিটে প্রায় ধরে ফেলেছিল মিশা লোকটাকে, কিন্তু ওদের দুজনের মাঝে একটা ট্রাম এসে পড়তেই আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ট্রামটা চলে যেতেই মিশা দেখল লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় গেল লোকটা। মিশা হতভম্ব হয়ে চারদিকে নজর করে দেখতে চেষ্টা করল। রাস্তার উল্টোদিকে একটা স্ট্যাম্পের দোকান চোখে পড়ল ওর। এই দোকানটায় অনেকবার এসেছে সে। ডাকটিকিটের খাতার জন্য টিকিট সংগ্রহ করতে। ওর মনে পড়ল এটাই সেই দোকান যেটার কথা গেঙ্কা বলেছিল যে বরকা ফিলিন নাকি এই দোকানটাতে নিয়মিত যাতায়াত করে। মিশা দোকানটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজাটা ঠেলতেই ভেতরে ঘন্টা বেজে উঠল। দোকানে কেউ নেই, বাক্স আর অ্যালবাম সাজানো রয়েছে। ঘন্টার আওয়াজ শুনে দোকানের পিছন থেকে দোকানের মালিক বেরিয়ে এল। সারামাথা টাক, টকটকে লাল নাক, একজন বুড়ো মানুষ। পেছনের দরজাটা ভালভাবে বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

মিশা বলল, 'কয়েকটা স্ট্যাম্প দেখতে পারি?'

বুড়ো লোকটা কাউন্টার থেকে কয়েকটা খাম ছুঁড়ে দিয়ে আবার পিছনের ঘরটায় চলে গেল। যাওয়ার সময় দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখল যাতে দোকানের ওপরে নজর রাখতে পারে। বসনিয়া আর হারজিগোভিনার স্ট্যাম্প দেখার ভান করতে করতে মিশা চোরা চাউনিতে পেছনের ঘরটা দেখার চেষ্টা করল। ঘরটায় মনে হল কোনও জানলা নেই, একটা ঢাকাওয়ালা বাতি রয়েছে টেবিলের ওপরে। বুড়ো লোকটা ছাড়াও আর একজন রয়েছে ঘরটায়। চাপা গলায় কথা বলছে ওরা। সামনের উঁচু কাউন্টারটার জন্য অন্য লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল না মিশা। ওর মনে হল ওই লোকটারই পিছু নিয়েছে সে। পেছনের ঘরটায় চেয়ার সরানোর শব্দ হল। বুঝল ওরা এবার বাইরে বেরিয়ে আসবে। মিশা ঢ্যাঙা লোকটাকে দেখতে পাবে। ও মাথা আরও ঝুঁকিয়ে স্ট্যাম্পগুলো দেখতে লাগল। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে ওর। তারপর ও ক্যাঁচ করে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল। একটু পরেই বুড়ো লোকটা কাউন্টারে চলে এল। মিশা বুঝল যে ভয় করেছিল তাই হয়েছে, লোকটা খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বুড়োটা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার, বাছাই করেছ স্ট্যাম্প?'

মিশা খুব মনোযোগ দিয়ে স্ট্যাম্পগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'এক মিনিট।'

বুড়োটা বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।' পেছনের ঘরটায়

ফিরে গেল লোকটা। এবার আর পেছনের ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন মনে করল না বুড়োটা। টেবিলের ওপরটাতে বাতির আলো পড়েছে। সেই আলোতে মিশা লক্ষ্য করল বুড়োর হাড্ডিসার হাতদুটো টেবিল থেকে কাগজপত্র তুলে ভাঁজ করে একটা দেরাজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে। তারপর একটা কালো রঙের হাতপাখা হাতে তুলে নিল লোকটা। কিছুক্ষণ পাখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিল পাখাটা, ছোট একটা ছড়ির মতন হলে গেল সেটা। তারপর দুটো চকচকে ধাতুর মতন জিনিস হাতে তুলে নিল। একটা আংটির মতন অন্যটা একটা বলের মতন। পাখাটার সঙ্গে ও দুটো জিনিসও দেরাজে ঢুকিয়ে রাখল বুড়োটা।

৩৪.

পিসিমা

ধীরে ধীরে বাড়িতে ফিরে এল মিশা। রহস্যময় লোকটা ওর চোখে ধুলো দিয়ে পালাল। কিন্তু ডাকটিকিটের দোকানে ও যা দেখেছে খুবই সন্দেহজনক। পিছনের দরজা দিয়ে লোকটার চলে যাওয়া, বুড়ো লোকটার সন্দেহজনক চলাফেরা, আর বরকার ওই দোকানটায় ঘন ঘন যাওয়া সবটাই খুবই সন্দেহজনক। বাড়িতে পৌছে গেছে এমন সময় ধাঁ করে একটা কথা মনে হল ওর। বুড়োটা যখন হাত পাখাটা ভাঁজ করছিল তখন সেটাকে একটা খাপের মতন মনে হচ্ছিল, আর ওই আংটিটা; ওটা সেই ছোরাটার খাপটা নয় তো? চিন্তাটা মাথায় আসতেই খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ও বন্ধুদের খোঁজে ছুট লাগাল।

গেঙ্কার বাড়িতে গিয়ে পেয়ে গেল সবাইকে। ওখানে সবাই মিলে গোল হয়ে বসে কী সব করছে। গেঙ্কা লিখছে আর স্লাভা একটা কাগজে লাইন কাটিছে। আগ্রিপ্পিনা পিসি, নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে কী সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন ওদের। চশমার আড়াল থেকে মিশাকে দেখলেন তিনি, কিন্তু একটা কাগজ থেকে ডিক্টেশন দেওয়া থামালেন না। পড়তেই থাকলেন : রুবুৎসভা, আন্না গ্রিগোরিয়েভনা, লিখেছিস? আরও সুন্দর করে, পরিষ্কার করে লেখ, তড়বড় করিস না — সেমিওনভা, ইয়েভদকিয়া, গাভ্রিলভ্না।'

গেঙ্কা মিশাকে দেখে দুগাল ছড়িয়ে হেসে ফেলে, 'দেখ মিশা, নতুন একটা কাজ জুটেছে, মহিলা বিভাগের সচিব।' পিসি ধমকে ওঠেন — 'ছটফটানি বন্ধ কর গেঙ্কা, কাগজটা নোংরা করে ফেলবি।' গেঙ্কার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখল মিশা, কাগজটায় লেখা আছে — 'কারখানায় যে সমস্ত নারীশ্রমিক অশিক্ষা দূরীকরণ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেছেন তাদের নামের তালিকা।' প্রত্যেকটি নামের পাশে বয়স লেখা রয়েছে, কারও বয়সই চল্লিশের নীচে নয়।'

পিসি গজগজ করেই চলেছেন, 'দেখ তো স্নাভা কেমন শান্তভাবে লাইন টেনেই যাচ্ছে, আর তুই সমানে উসখুস করছিস। একটু চুপ করে থাকতে পারিস না। ... কীরে, গাভ্রিলভ্না লেখা হল?'

— 'হ্যাঁ, লিখেছি, বলে যাও। এই বুড়িগুলিকে কেন যে মিথ্যে পড়াবার চেষ্টা করছ কে জানে।' শুনে গেঙ্কার দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন পিসি কিছুক্ষণ।

— 'কেন জিজ্ঞেস করছিস, মানে? একটু তলিয়ে ভেবে দেখেছিস কখনও।'

— 'নিশ্চয়,' গেঙ্কার চটপট উত্তর। তবে প্রশ্ন শুনে একটু বিব্রত হয়েছে বোঝা গেল।

তারপর বলল, 'ওরে ব্যাস চুয়ান্ন। বলতে পার ইনি কিসের জন্য লেখাপড়া শিখতে চান।'

— 'ও, এই রকম ছেলে হয়েছিস তুই?' চশমাটা খুলে আস্তে আস্তে বললেন পিসি, 'তুই যে এমনটা হবি তা আমি ভাবতে পারিনি!'

গেঙ্কা ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'কী হয়েছে।'

পিসি বলল, 'বুঝেছি, তুই ভাবিস খালি তোরই লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে আছে, তাই না?'

— 'আমি তো?'

— 'চুপ কর, কথার ওপর কথা বলিস না। লেখাপড়াটা শুধু তোর জন্যই, নাকি? এই সব ব্যবস্থা শুধু তোর জন্যই তাই ভেবে রেখেছিস বুঝি। চল্লিশ বছর কারখানায় কাজ করার পর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটাখাটনির পর সেমিওনভা মুখ্যু থেকেই মারা যাক তাতে তোর কিছু যায় আসে না! তাহলে আমিও লেখাপড়া বৃথা শিখলাম বল। গৃহযুদ্ধে আমি আমার দু দুটো ছেলেকে হারিয়েছি, তার ফল হিসেবে গেঙ্কা পড়াশুনা করবে, আমি সুখে যেমনটি ছিলাম, তেমনটিই থাকব এই তো। আর আসাফিয়েভাকে যে কুঠরি থেকে একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হল সেটাও ঠিক হয়নি তাহলে? ষাট বছর সে ওই কুঠরিতে কাটাল, সেখানেই মরে পচুক তাই হলেই ভাল হত না? তুই তাহলে এরকমই ভাবিস, ঠিক করে বল।'

গেঙ্কা পিসির বকুনিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কেঁদে ফেলে, বলে, 'না পিসিমা, তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি। আমি ঠাট্টা করছিলাম শুধু।'

পিসির রাগ পড়ে না, বলেন, 'তোকে আমি ঠিকই বুঝেছি রে ছোকরা। তবে তোর মাথায় যে এরকম ভাবনা রয়েছে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কল্পনাও করতে পারিনি যে খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে তুই অন্তত এরকম ঠাট্টা ইয়ারকি করতে পারিস।'

মাথা নীচু করে গেঙ্কা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে থাকে, 'না পিসি না, আমি কোনও কিছু চিন্তা না করেই ফস করে বলে ফেলেছি।'

পিসির রাগ তবু যায় না, বলেন, 'কথা তো চড়ুই পাখি নয় যে উড়ে গেলে ধরা যাবে না। যা বলিস একটু ভেবেচিন্তে বলিস। যাকগে ঠিক আছে। দোষ স্বীকার করলেই অর্ধেক মাফ হয়ে যায়। কিন্তু এরপর থেকে একটু ভাবনাচিন্তা করে কথা বলবি।'

৩৫.

ফিলিন

পিসি চলে গেলেন রান্নাঘরে। গেঙ্কা খুব মন খারাপ করে টেবিলেই বসে রইল। মিশা ঠাট্টা করে বলল, 'কী রে খুব শিক্ষা হল তো। তোর ওই জিভের জন্যই ডবল শাস্তি পাওয়া উচিত।'

গেঙ্কাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্লাভা বলে, 'যাকগে মিশা, ছেড়ে দে। ও তো নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে না কি?'

মিশা বলল, 'ঠিক আছে যেতে দে সব। ওই ঢ্যাঙা লোকটাকে দেখতে পেয়েছিলি গেঙ্কা?'

গেঙ্কা গোঁজ হয়ে বসে থেকে উত্তর দেয়, 'কাউকেই দেখিনি আমি।'

— 'তাহলে শোন,' বলে শুরু করে মিশা, 'তোরা যখন এখানে বসেছিলি, সেইসময় খাপটা আমি দেখেছি।'

হঠাৎ বুঝতে না পেরে স্লাভা বলে, 'কোন খাপ।'

— 'সাধারণ একটা খাপ, আমার ছোরার।'

এবারে গেঙ্কা মাথা তোলে, অবিশ্বাসের চোখে তাকায়।

স্লাভা জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যিই দেখেছিস তুই?'

— 'হ্যাঁ, নিজের চোখে, এইমাত্র দেখে এলাম।'

গেঙ্কা এবারে উঠে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায়।'

— 'অস্তোজেঙ্কা স্ট্রিটের ডাকটিকিটের দোকানে।'

— 'মিথ্যে গুল দিচ্ছিস মিশা।'

— 'আরে না, আমি মিথ্যে কথা বলি না।'

— 'তাজ্জব ব্যাপার, কোথায় রাখে ওটা।' উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করে গেঙ্কা।

পিসি রান্নাঘরে থাকতে থাকতেই খুব চটপট মিশা ওর বন্ধুদের পুরো গল্পটা বলে দেয় — সেই ডাকটিকিটের দোকান, ঢ্যাঙা লোকটাকে অনুসরণ করে ছোটা, কালো পাখা আর আংটিটার কথা।

সবটা শুনে গেঙ্কা বলল, 'দূর, আমি ভাবলাম তুই নিজের চোখে বুঝি খাপটা দেখেছিস। তা না, কোথাকার এক কালো পাখার গল্প ফাঁদছিস।'

স্লাভা বলল, 'আসলে আগে দুটো অজ্ঞাত রাশি নিয়ে সমীকরণের অঙ্ক

করতে হচ্ছিল, এখন দাঁড়াল তিনটে : ফিলিন, নিকিৎস্কি আর এখন কালো পাখা। মিশা, তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস যে ওই লোকটাই যদি আমরা যাকে খুঁজছি সেই ফিলিন না হয় তাহলে বাকি সবটাই গাঁজাখুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

গেঙ্কা বলে, 'স্লাভা ঠিকই বলছে মিশা, সবটাই তোর কল্পনা নয় তো?'

মিশা কোনও উত্তর দেয় না। ছোট আলমারিটার ওপর ভর দিয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও। লেসের পাড় বসানো একটা কাপড় আলমারির দুপাশ দিয়ে ঝুলে রয়েছে। ড্রয়ার আলমারিটার ওপর একটা চারকোণা আয়না। আয়নাটার মাথায় বাঁদিকের কোণে একটা সবুজ ঝালর, একগুলি সুতো সূঁচগাঁথা অবস্থায় পড়ে আছে কয়েকটা পুরনো ছবির কাছে। বাঁধানো ছবিগুলির কাঠামোয় সোনালি অক্ষরে ফটোগ্রাফারদের নাম লেখা। নামগুলো আলাদা হলেও ছবির বিষয়বস্তু এক — ছাইরঙা ক্যানভাসের মধ্যে একটা পুকুর আর দূরে কুয়াশাঘেরা গ্রীষ্মাবাস। মিশা ভাবছিল স্লাভা ঠিকই বলেছে। কিন্তু ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে এ সব কিছুর মধ্যে কোনও একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। গেঙ্কার দিকে তাকিয়ে মিশা বলল, 'পিসির সঙ্গে ঝগড়া করতে ব্যস্ত না থাকলে এতক্ষণে ফিলিনের খবরটা তুই পেতিস।'

— 'তার মানে।'

— 'মানে যা বলছি তাই। ফিলিনকে উনি চেনেন। অন্তত এটুকু তো ওনার কাছ থেকে জানা যেতে পারে যে ফিলিন রেভস্কের মানুষ কি না।'

— 'তুই কেন ভেবে নিচ্ছিস্ যে পিসি জানলেও বলবে না। দেখিস নিশ্চয়ই বলবে।'

— 'হ্যাঁ, তুই ভাবলি আর পিসিও বললেন। তোর সঙ্গে এখন উনি কথাই বলবেন না।'

— 'কথা বলবেন না আমার সঙ্গে? তাহলে তোরা পিসিকে চিনিসই না। আমি তো মাফ্ চেয়েছি, কবে ভুলে গেছে সেসব কথা। তবে একটু কায়দা করে এগোতে হবে কাছে। এক মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবি।'

একটু পরেই পিসি ঘরে ঢুকলেন। পিসি ঘরে ঢুকতেই ওদেব কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। পিসি একনজর ওদের দেখেই টেবিল পরিষ্কার করতে থাকেন। গেঙ্কা এমন একটা ভান করল যে সে একটা গল্প করছিল, পিসি এসে পড়তেই বাধা পড়েছে।

— 'আমি ওকে বললাম, 'তোর বাবা তো তোদের বাড়ির আর সকলের মতই ফাটকাবাজ। রেভস্কের সবাই তোদের হাঁড়ির খবর রাখে।'

পিসি কৌতুহলি হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কার কথা বলছিস রে।'

— 'এই বরকা ফিলিনের কথা। আমি ওকে বলছিলাম রেভস্কের সবাই তোদের নাম জানে। আর ও কিনা বলল — রেভস্কে আমি ছিলামই না, কাদের কথা বলছিস আমি বুঝতে পারছি না।' গেঙ্কা উত্তর করে। পিসির উত্তরের অপেক্ষায় ওরা উদগ্রীব হয়। যেন রেগে গেছে এমনভাবে পিসি জোরে জোরে

ঝাড়ন চালিয়ে গেঙ্কাকে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন, 'ওর সঙ্গে তোর এত দহরম মহরম কিসের, অ্যাঁ? পই পই করে বলেছি, ওই ছোকরাটার সঙ্গে মিশবি না। তোকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।'

— 'তাহলে মিথ্যে কথা বলে কেন। রেভস্কের লোক যদি হয় সেকথা বললেই পারে, লুকোনোর কী আছে।'

— 'হয়ত ও কোনদিন রেভস্কে ছিল না।'

— 'ও ছিল সেকথা তো আমি বলিনি। কিন্তু ওর বাবা তো রেভস্কের লোক। চাপা দেওয়ার কী আছে এতে।'

— 'হয়ত বাপের কথা ও কিছুই জানে না।'

— 'কিন্তু ওর বাবা তো কাছেই বসে ছিল। সে শুধু হাসল আর বলল, 'আমরা খাঁটি মস্কোর লোক, মজদুর বুঝলে।'

— 'মজদুর বলেছে নাকি।' পিসি হার মানলেন, বললেন, 'তাহলে শুনে রাখ ওর বাপ ছিল ওয়ার্ডার, রেভস্কের গুপ্ত পুলিশের লোক। আর এখন কিনা মজদুর বলে নিজেদের চালাচ্ছে। মজদুরই বটে!'

— 'তার মানে ফিলিন নিজেই গুপ্ত পুলিশের লোক।' মিশা জিজ্ঞাসা করে।

— 'না, ওর বাপ ছিল। তা বাপও যেমন ব্যাটাও তেমনিই। ওদের সঙ্গে তোরা আর মিশিস না।' বলেল পিসি টেবিলঢাকা কাপড়টা ভাঁজ করতে করতে চলে গেলেন।

পেছন থেকে চোখ টিপে গেঙ্কা বলল, 'দেখলি তো। সব কথাই তো বলে দিলেন পিসিমা, আর তোরা ভাবছিলি কিছুই বলবেন না। আমি তো পিসিকে চিনি। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ফিলিনই সেই লোক যাকে আমরা খুঁজছি। অর্থাৎ নিকিৎস্কিও কাছেপিঠেই কোথাও আছে। আর ছোরার সেই খাপটাও। বেশ টের পাচ্ছি, গুপ্তধন এখন আমাদেব হাতের মুঠোয় আসতে চলেছে।' আনন্দে হাত কচলাতে থাকে গেঙ্কা।

স্লাভা কিন্তু প্রতিবাদ করে, 'কিছুই পবিষ্কাব হল না। তুইই তো বলেছিলি ফিলিন নামের লোব গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। হতেও তো পারে যে এ অন্য কোনও ফিলিন।'

গেঙ্কা বলে, 'কি যে বলিস স্লাভা। পুলিশের ছেলে। ওই হল আমাদের লোক। কোনও সন্দেহ নেই আমার।'

মিশা সকৌতুকে বলল, 'ঠিক আছে, ও লোকটাই আমাদের ফিলিন হতে পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু একটা কথা তো পরিষ্কার হল যে ও রেভস্কের লোক। এখন জানা দরকার যে ও 'রানি-মারিয়া' জাহাজে কাজ করেছে কি না।'

গেঙ্কা প্রশ্ন করল, 'কীভাবে সেটা বের করবি বল তো?'

— 'খুব সোজা। বরকা আমাদের বলবে না বলছিস?'

৩৬.

ইয়ং পাইওনিয়ার

রোববার তিন বন্ধু ভিন্ন মহল্লায় সেই ছাপাখানাটার দিকে রওয়ানা হল যেখানে ইয়ং পাইওনিয়ারদের সংগঠন রয়েছে। বিজলি ঘাটতি বলে রোববারে ট্রাম চলে না। তাই খুব ভোর থাকতেই রওয়ানা দিয়েছিল ওরা। আরবাত স্ট্রিট ঘন কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। রাস্তাঘাট জনশূন্য, ঝাড়ুদাররাও তখনও এসে উঠতে পারেনি রাস্তায় রাস্তায়। সকালবেলায় তরতাজা মন নিয়ে ওরা জোর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ঠাণ্ডা কনকনে অ্যাসফাল্টের ওপর ওদের জুতোর শব্দ ফাঁকা রাস্তায় প্রতিধ্বনি করছে। দোকানে দোকানে কাঁচের জানলাগুলোয় ওদের ছায়া পড়ছে। মিশার মনে হয় এই আরবাত স্ট্রিট রাস্তাটা ফাঁকা থাকলে কেমন যেন অদ্ভুত দেখায়। রাস্তাটা ছোট ঘিঞ্জি আর চুপচাপ বলে মনে হয়। মিশা চারদিকটা তাকিয়ে দেখছিল। বাড়িগুলো বেশ ভাল করে নজরে পড়ছে এখন। একদিকে 'কার্নিভাল' সিনেমা। পেছনে সামরিক আদালতের বাড়ি। আর ওই তো সেই বাড়িটা যেখানে পুশকিন থাকতেন এক সময়ে। খুব সাধারণ একটা দোতলা বাড়ি, তেমন নজর কাড়ার মতন নয়। এই বাড়িটাতে পুশকিন থাকতেন ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চ লাগে। অবশ্য উনি যখন এখানে থাকতেন তখন অন্য পাঁচজন মানুষের মতনই এখানে ঘুরে বেড়াতেন, কেউ খুব একটা নজর করত না। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ পুশকিন তার পুরনো বাড়িতে এসে উদয় হতেন তাহলে, না জানি কী কাণ্ডই না ঘটত। সারা মস্কো শহর হয়ত ভেঙে পড়ত এখানে। গেন্কা সারা পথ জুড়ে বকবক করেই চলেছে, 'ইয়ং পাইওনিয়াররা কেমন সেটা দেখতে হবে। হয়ত দেখা যাবে যে অবাক হওয়ার মতন কিছু নেই। হয়ত শিশুসদনের মেয়েদের মতন কাপড়ে ফুলের নকশা তুলছে দেখা যাবে।'

মিশা বলল, 'দূর বোকা। ওটা কমিউনিস্টদের একটা সংগঠন। তার মানেই কাজের মতন কাজ। কিছু না কিছু করেই ওরা।'

স্লাভা বলল, 'ওখানে যেতে কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে আমার।'

— 'কেন।'

— 'লাগছে তাই বলছি। গেলেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কে কী কেন, আমাদের নাড়ি নক্ষত্র সব। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে আমার।'

— 'না অস্বস্তি লাগার সত্যিই কোনও কারণ নেই। আমরাও তো ইয়ং পাইওনিয়ার হতে চাইতে পারি। সেই অধিকার আমাদের আছে। খারাপ কি আছে এতে।' মিশা জোরগলায় বলে। ছেলেরাও চুপ করে যায়।

সকাল পরিষ্কার হচ্ছে। বাড়িগুলোর পেছন থেকে ঝলমলে রোদ্দুর ভেসে আসছে। তেরছা আলোয়, দালান বাড়িগুলোর প্রকাণ্ড সব ছায়া পড়ছে চারকোণা

হয়ে, সেই ছায়াগুলো ক্রমেই ছোট হচ্ছে, আস্তে আস্তে রাস্তার একটা পাশ ধরে সরে সরে যাচ্ছে। ওপাশের উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো রোদ্দুর যেন সহ্য করতে পারছে না। রাস্তা জুড়ে প্রাণের সাড়া জাগল। ডাকঘর থেকে বড় বড় চামড়ার থলিতে ঠাসা খবরের কাগজ নিয়ে পোস্টম্যানরা সব বেরিয়ে আসছে। গেয়ালিনীরা টুং টাং শব্দ করতে করতে দুধের বালতি নিয়ে যাচ্ছে। ওরা কুদ্রিনস্কায়া স্কোয়ারে পৌঁছে গেল। মিশা কোণের দিকের একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখ গেঙ্কা,' বলে একটা বাড়ি দেখায়। বাড়িটার দেয়াল বুলেট আর কামানের গোলায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। — 'জানিস তোরা বাড়িটার এই অবস্থা কেন?'

— 'না তো।'

— 'অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে দারুণ লড়াই হয়ে গেছে এই খানটায়, ঠিক এই জায়গাটায়। ক্যাডেট বুর্জোয়ারা লালরক্ষীদের ওপরে কামান ছুঁড়েছিল। স্লাভার সঙ্গেই তো আমরা সব দেখেছি। মনে আছে স্লাভা।'

— 'আমি তখন ছিলামই না এখানে। তুইও ছিলি বলে মনে হয় না।'

— 'আমি। কতবার আমি এসেছি এখানে। শুরার সঙ্গে তো প্রায়ই আসতাম। একবার তো কার্তুজের একটা খাপও টুপির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে গেছি। অনেকদিন আগের কথা অবশ্য। আমার বয়স তখন আট বছর। তুই কোনওদিন আমাদের দেখিসনি তার কারণ অবশ্য আছে। কী করে দেখবি! তুই তো বাইরেই বেরোতিস না। তোর মা তো তোকে বাইরেই বেরোতে দিত না।'

ওরা ছাপাখানাটার সামনে এসে পড়ল। জানলা দিয়ে ওরা দেখল বড় একটা হলঘর জুড়ে কত মেশিন। কোনও লোকজন নেই। সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে — 'মস্কো প্রকাশনার ছাপাখানা'। ওরা দরজার কাছটায় এগিয়ে গেল। তক্তা দিয়ে তৈরি একটা ছোট ঘরে নীচু রেলিংগুলোর ওপাশে বসে রয়েছে একজন লোক। বড় একটা গামলা থেকে ঝোল ঢালছে, দেখতে কতকটা চৌকিদারদের মতন। পাশেই বছর দশেকের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাল ফিতে দিয়ে, ছোট ছোট দুটো বেণী বাঁধা। মিশারা কাছে যেতেই লোকটা মুখ তুলল। হাতের পেছন দিয়ে গোঁফ মুছল। তারপর সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে তাকাল ওদের দিকে।

মিশা বলল, 'ইয়ং পাইওনিয়াররা কোথায় আছে বলতে পারেন?'

— 'ইয়ং পাইওনিয়ার! কে পাঠিয়েছে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি? পার্টির জেলা কমিটি, না অন্য কেউ?'

— 'না এই আমরাই এসেছি, একটা কাজে' — আমতা আমতা করে বলে মিশা।

লোকটা ওর কাজ শেষ করল, ততক্ষণে মেয়েটাও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মনে হল। লোকটা বলল, 'কাছেই আছে ওরা, খুব সম্ভবত ক্লাবঘরে।'

— 'ক্লাবঘরটা কোথায় দয়া করে একটু বলবেন।'

মিশার প্রশ্ন শুনে মেয়েটা অবাক হয়। লোকটা বলে, 'হুম, তার মানে তোমরা ক্লাবঘরটার খবরও রাখ না।'

মিশা থতমত খেয়ে বলে, 'আসলে আমরা এসেছি অন্য পাড়া থেকে তো, তাই ঠিক চিনি না।'

লোকটা বলে, 'তা বেশ, বেশ, সদর ক্লাবঘরটা সাদোভায়া স্ট্রিটে। কাছেই।'

— 'কোন সাদোভায়া স্ট্রিট?'

এবারে মেয়েটা খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, 'বেশ মজার লোক এরা বাবা। ক্লাবের কথা জানে না, কোথায় তাও চেনে না!'

লোকটা ধমকে ওঠে, 'তুই থাম তো। বড়দের মধ্যে কথা। যা, বরং এদের জায়গাটা দেখিয়ে দে। হয়ত সত্যি খুব জরুরি কাজে এসেছে।' বেশ সন্দেহের চোখে তাকায় লোকটা।

— 'এক মিনিট সবুর করুন।' বাচ্চা মেয়েটা ছোট একটা চৌবাচ্চার জলে গামলা চামচ সব ধুয়ে, তোয়ালের মধ্যে বেঁধে রেখে ওদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। সারা রাস্তা বকবক করতে থাকে।

— 'ইয়ং পাইওনিয়ারদের আমি ভালরকমই চিনি বুঝলে। ভাসিয়া হচ্ছে ওদের দলের পাণ্ডা, সে ড্রাম বাজায়। ওদের একটা বিউগিলও আছে। ওদের আবার নিয়মের খুব কড়াকড়ি। বাব্বা।' মিশা কিছু বলে না, বিদ্রুপের চোখে দেখে মেয়েটাকে, কী হবে কাচ্চাবাচ্চাদের সঙ্গে তর্ক করে! মেয়েটা থামে না, বলেই চলে, 'বুঝলে ওদের বিউগিল আছে, আর ভয়ংকর কড়াকড়ি নিয়মকানুন — গালাগালি দেওয়া, ট্রামগাড়ির বাম্পারে ওঠা, পকেটে হাত গুঁজে চলা, মেয়েদের সঙ্গে খুনসুটি করা — না এসব চলবে না কিছুতেই, সব বারণ ওদের কাছে। ওরা শুধু লড়াই করতে পারে বুর্জোয়াদের সঙ্গে। আর সেইসব লড়াইয়ের আগে টাই খুলে নিতে হবে, টাই পরে লড়াই করা নিষেধ।'

মিশা কড়া গলায় বলে, 'আঃ, পা মাড়াচ্ছ কেন, ঠিকভাবে চল।'

মিশার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মেয়েটা বলেই চলে, 'মেয়েরাও অবশ্য ওদের দলে যোগ দিতে পারে, তবে সবাই নয়, যাদের বয়স হয়েছে তারা।'

স্লাভা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার ওই ভাসিয়ার বয়স কত?'

— 'আরে ও তো বড়, চোদ্দো বছর, পনেরোও হতে পারে। সাংঘাতিক কাজের ছেলে। সোজা বাড়িতে ঢুকে সবকিছু নিয়ে চলে যায়।'

ওরা অবাক হয় মেয়েটার কথা শুনে।

— 'সব নিয়ে চলে যায় মানে?'

— 'দূর সেটাও জানো না বুঝি। সব মানে — ওই অনাথ সব শিশুদের জন্য জিনিসপত্র। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইয়ং পাইওনিয়াররা জিনিসপত্র জোগাড় করে। আমার জামাটাও নিয়ে গেছে জানো।'

— 'তোমার জামা নিয়েছে?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কিন্তু এটা তো অন্যায়। কারও জিনিস নিয়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই।' গেঙ্কা বলে।

মেয়েটা গেঙ্কার কথায় লজ্জা পায়। — 'ওরা নিজেরা জোর করে নিয়েছে তা তো নয়। মা দিয়েছে তাই নিয়েছে।'

— 'আর তোমার খুব কষ্ট হয়েছে জামাটার জন্য।' স্লাভা হেসে জিজ্ঞাসা করে।

— 'না, একটুও নয়, আমি তো আমার গত বছরের টুপিটাও দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভাসিয়া বলল দরকার নেই, কারণ তাহলে এর পরের বারে দেওয়ার মতন কিছু থাকবে না। তবে সেকথা বলেছিল ঠিকই, কিন্তু সকালে জামাটা নিয়ে গেছিল, আবার বিকেলে টুপিটাও নিয়ে গেল। — জানো তো দেশে অনাথ ছেলেমেয়ে কত আছে। ওদের সকলের জন্য জামাকাপড় জোগাড় করতে অনেকদিন লেগে যাবে।'

ওরা সাদোভায়া স্ট্রিটে পৌঁছে গেল।

— 'ওই যে তেতলায়, তোমাদের এখানেই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি বাপু, নয়তো ভাসিয়া ফের দেখে ফেলবে আমাকে।' বলে মেয়েটা ক্লাবঘরটা দেখিয়ে একছুটে ফিরে গেল।

৩৭.

ভুল বোঝাবুঝি

ছোট মেয়েটা তো ওদের দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে ওরা। দরজার ওপাশ থেকে উঁকি মেরেই অদৃশ্য হয়ে গেল একটা ছেলে, তারপর কটাচুল আর একটা ছেলেও উঁকি মেরেই অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখেশুনে বেশ হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। মিশার একবার মনে হল দরকার নেই যাওয়ার, বরং বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক। ওরা হয়ত তাড়াই করবে এবার। কিন্তু গেঙ্কা আর স্লাভার সামনে তো আর নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা যায় না। তাই ঢোঁক গিলে সিঁড়ি দিয়ে গটগট করতে করতে ওপরে উঠতে লাগল, পেছন পেছন অবশ্যই স্লাভা আর গেঙ্কা।

তেতলায় পৌঁছে ভারী ওক কাঠের একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। একটা চারকোণা ঘর সেটা। উল্টোদিকের দেয়ালে সোনালি সুতোর গোছাওয়ালা ভাঁজ করা একটা নিশান কাত হয়ে আছে। নিশানের বর্শাফলকটা ব্রোঞ্জের, কতকটা ডিমের আকারের। নিশানের ওপর দিয়ে দেয়াল জুড়ে লাল রঙের

একটা ফিতে। ফিতেয় লেখা — 'কমিউনার্ডদের শিক্ষিত করার সবচেয়ে ভাল রাস্তা হল শিশুদের সংগঠন — লেনিন'। নিশ্যানের পাশে ছোট একটা টেবিলের ওপর রয়েছে একটা ড্রাম আর একটা বিউগেল। দেয়াল জুড়ে ছবি আর পোস্টার। চার কোণায় একেকটা ছোট পতাকা, আলাদা আলাদা প্রতীক চিহ্ন। ঘরে বা সিঁড়িতে কেউ নেই। একবার পায়ে শব্দ শুনতে পেল ওরা, তারপর আবার চুপচাপ। ঘরের মধ্যে নিশান দেখাবার কাগজ, নিয়ম কানুন, টেলিগ্রাফের কোড্ ইত্যাদি লেখা। পেরেকে ঝুলছে কয়েকটা এক্সারসাইজ খাতা, সেগুলোতে লেখা — 'উপদলের কাজের হিসেবখাতা'। ওরা খাতাগুলো দেখতে যেতেই পেছনে হালকা আওয়াজ শুনে ফিরে তাকায়। দেখে লাল টাই বাঁধা কয়েকজন চুপিসাড়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে উদ্দেশ্যটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অগত্যা ওরা তিনবন্ধুও আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হয়ে যায়।

পাইওনিয়াররা যখন বুঝল যে ওরা ওদের দেখেই ফেলেছে, তখন জোরে হাঁক ডাক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে হঠতে হল। মাঝখানে মিশা আর দুপাশে গেঙ্কা আর স্লাভা ওদের জোর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখছে। পাইওনিয়াররা চেষ্টা করছে ওদের তিনজনকে আলাদা করে দিতে, আর ওরাও চেষ্টা করছে যাতে তিনজন একই লাইনে দাঁড়িয়ে পাইওনিয়ারদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। দ্বিতীয়বার পাইওনিয়ারদের সর্দার গোছের একটা ছেলে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে থাকে। দ্বিতীয়বার ওরা একটু সফল হল, স্লাভাকে ওরা টেনে সরিয়ে দিতে পারল। লাইন ভেঙে মিশা বাঁচাতে গেল স্লাভাকে, ফলে এবার তিনজনকেই আলাদা আলাদা ভাবে লড়তে হল। সর্দার ছেলেটার মুখে খই ফুটছে, বলছে — 'বাজা পাগলা ঘন্টি'। 'জোর চেপে ধরে থাক এদের' — এইসব। দল ছেড়ে একটা ছেলে ছুটে গিয়ে ড্রাম বাজাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্লাভাকে বাঁচাতে পারল মিশা। হামলাবাজদের দিকে ঘুঁষি লাথি ছুঁড়ে তিনজনে আবার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, তৈরি হল ওদের আক্রমণ রুখতে। দুপক্ষেই বিশ্রীরকম ঘায়েল হয়েছে। কারোরই আর সেরকম দম বলতে কিছু নেই। পাইওনিয়ারদের টাই দুমড়ে গেছে। স্লাভার কলার ছিঁড়ে গেছে, গেঙ্কার মনে হচ্ছে একগোছা চুলই আর নেই।

মিশা হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে, — 'কী চাই তোমাদের?'

সর্দার ছেলেটি হুমকি দিয়ে ওঠে, 'চুপ কর, তোমরা আমাদের বন্দী।' ড্রামটা তারস্বরে বেজেই চলেছে, ঘর ভর্তি হয়ে গেছে আরও সব পাইওনিয়ারদের আসাতে। কটা চুল সর্দার ছেলেটা ছুটে অন্যদিকে গিয়ে চিৎকার করে বলে, 'হুশিয়ার, এরা আমাদের বন্দী, আমরাই এদের ধরেছি।'

সেই সময়ে গেঞ্জি গায়ে কালো প্যান্ট আর লাল টাই পরা গাট্টাগোট্টা চেহারার চওড়া কাঁধ একজন জোয়ান ছেলে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

ওকে দেখেই স্যালুট করে সব পাইওনিয়াররা। কটা চুল সর্দার ছেলেটা বলতে থাকে, 'আমাদের গ্রুপ তিনজন বয়স্কাউট-গোয়েন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে। ওরা আমাদের পতাকা চুরি করার তালে ছিল। রাস্তা থেকেই ওদের ওপরে আমরা নজর রাখছিলাম।'

ওর কথার মাঝখানে জোয়ান ছেলেটা বলে ওঠে, 'দাঁড়াও একমিনিট, ছেড়ে দাও ওদের।' পাইওনিয়াররা এতক্ষণ ওদের তিনজনকে ছেঁকে ধরেছিল। ওরা সরে যেতেই ঘরের কোণ থেকে ওরা তিনজন বেরিয়ে আসে। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ, ভাসিয়া এবার বল কী বলছিলে।'

কটা চুল ছেলেটা আবার দম দেওয়া পুতুলের মতন বলতে থাকে, 'আমরা রাস্তা থেকেই নজর রেখেছিলাম ওদের দিকে। ঘরে ঢুকতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রেপ্তার করেছি। এখন কী করা যায় এদের নিয়ে। নিজেরাই বিচার করব, না সোপর্দ করে দেব?'

জোয়ান ছেলেটা শুনে বলল, 'হুঁ, বুঝেছি। তা তোমরা কারা বল তো হে।'

মিশা বেজার মুখে বলল, 'কেউ না, দেখতে এসেছিলাম ইয়ং পাইওনিয়ারদের।'

সবাই ওর কথা শুনে হেসে ওঠে। ভাসিয়া চিৎকার করে ওঠে, 'মিথ্যে কথা, এরা সব, স্কাউট, একে তো আমি চিনি, ও একজন টহলদার', বলে স্লাভাকে দেখিয়ে দেয়।

— 'মোটেই না, কোনওকালে স্কাউট ছিলাম না আমি'। ভীষণ রেগে স্লাভা উত্তর দেয়।

— 'তাই নাকি? কোনওকালে না? মিথ্যে কথা বল না। আমি তোমাকে চিনি, অনেকবার দেখেছি। আমরা অনেকেই দেখেছি। তাই নারে সেরিওজা।'

ড্রাম-বাজিয়ে ছেলেটা সায় দেয়। ভাসিয়া বলে, 'দেখলে তো, অস্বীকার করতে পারবেই না আর। ব্রন্নয়া স্ট্রিটে থাকে'।

— 'মিথ্যে কথা, আমরা থাকি আরবাত স্ট্রিটে।'

জোয়ান ছেলেটা অবাক হয়ে বলে, 'আরবাত স্ট্রিট তো অনেক দূরে। এতদূরে উদয় হলে কী করে।'

— 'হেঁটে হেঁটে। কারণ একমাত্র এই জায়গাতেই ইয়ং পাইওনিয়াররা রয়েছে।'

ছেলেটি বলে, 'না, সেটা ঠিক নয়, তোমাদের কাছেই একটা পাইওনিয়ার ভবন আছে, সেখানে গেলে না কেন?'

— 'জানতাম না তাই, আমরা শুনেছিলাম মস্কোতে কেবল একটা দলই আছে, এখানে।'

— 'কে বলেছে তোমাদের?'

— 'কমরেড জুরবিন।'

— 'কমরেড জুরবিনকে চিনলে কী করে তোমরা।'

— 'আমাদের বাড়িতেই থাকেন তিনি।'

— 'ও, তাই বুঝি'। এবারে ছেলেটার মুখ প্রসন্ন হল। — 'কমরেড জুরবিনকে আমি চিনি। বলছ তিনি খবরটা দিয়েছেন। তা এখন মস্কোতে অনেকগুলি পাইওনিয়ার দল রয়েছে। যাকগে, তোমাদের বাবা মায়েরা কী করেন।'

গেঙ্কা বলল, 'কারখানায় কাজ করেন। বাড়িতে আমাদের একটা নাট্যচক্র আছে। একটা ক্লাবও আছে।'

মিশা বলল, 'হ্যাঁ আমাদের নিজস্ব ক্লাব আছে, নাট্যচক্র আছে, তবু আমরা ইয়ং পাইওনিয়ার হতে চাই কি না, তাই ... '

ছেলেটি হেসে ফেলে, বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে আমাদের মধ্যে। কিছু মনে কোর না, এক্ষুণি সব ঠিক করে নিচ্ছি আমরা।' বলেই বাঁশি বাজাল ছেলেটি। বাঁশি শুনে সব পাইওনিয়াররা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। এত দ্রুত, এত সুন্দরভাবে যে মিশারা অবাক হয়ে গেল। এখন ওদের দেখে একদল ছেলের বদলে একটা গোটা ফৌজ বলা যেতে পারে। এক একটা উপদল একজায়গায় সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেক উপদলের ডানদিকে তাদের পতাকা। মেয়েরা পরেছে খেলার পোশাক, ছেলেরা হাফ প্যান্ট। সবারই রোদে পোড়া চেহারা, সতেজ, সপ্রতিভ।

ছেলেটি হুকুম করে, 'বিউগিল সম্ভাষণ কর।' বিউগিল বেজে উঠল। বিউগিল থামতেই ছেলেটি বলল, 'ছেলেমেয়েরা শোন। এরা আমাদের অতিথি, এসেছে আমাদের কাজকর্ম দেখতে। এরা চায় পাইওনিয়ার হতে। আমরা এদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই। তোমাদের অভিনন্দন জানাতে অনুরোধ করছি।' শোনামাত্র সবাই তিনবার জয়ধ্বনি করে ওদের অভিনন্দন জানাল।

৩৮.

মনে যে ছবি আঁকা হল

ইয়ং পাইওনিয়ারদের অতিথি হয়ে সারাটা দিন চমৎকার কাটল ওদের। যা কিছু দেখল সবই খুব ভাল লাগল ওদের, সন্ধের সময়ে ওরা বাড়ি যখন ফিরল তখন ওদের মনটা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে রইল।

গেঙ্কা হাত পা নেড়ে বলছিল, 'পাইওনিয়াররা স্বাস্থ্যবান, শক্তিমানও হতে হবে। ওদের এই নিয়ম খুবই ভাল নিয়ম তো বটেই। আমাকে আরও ব্যায়াম করতে হবে, মাসলগুলো শক্ত করা দরকার।'

স্লাভা বলল, 'আরও অনেক দরকারি নিয়ম আছে বুঝলি।'

— 'আছে না কী, কী বল তো শুনি,' গেঙ্কা পাল্টা জিজ্ঞাসা করে।

— 'যেমন ধর, ওদের জ্ঞানপিপাসু হতে হবে। ওরা বলে শ্রমিকদের লক্ষ্যসাধনের সংগ্রামে জ্ঞান আর সামর্থই প্রকৃত শক্তি।'

— 'সেটাকেই তুই বেশি জরুরি মনে করিস নাকি! তাহলে তো তোর দৌড় ওই পর্যন্তই। দুর্বল হলে যে বুর্জোয়ারা দেখ না দেখ সাবার করে দেবে হে, তখন সারা বিশ্বের জ্ঞান নিয়েও কিছু হবে না। তাই না রে মিশা?'

মিশা ভারিক্কী চালে বলল, 'ওদের দুটো নিয়ম খুবই দরকারি। প্রথম — 'শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্যের প্রতি পাইওনিয়াররা অনুগত'। দ্বিতীয় — 'পাইওনিয়াররা নির্ভীক, অধ্যবসায়ী, কখনও নিরুৎসাহ হয় না'। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল যেটা লেনিন বলেছেন — 'শিশুরা হল ভবিষ্যতের শ্রমজীবী, তাদের কর্তব্য বিপ্লবের কাজে সাহায্য করা।'

স্লাভা বলল, 'আর সেই ছাপাখানার চৌকিদারই ওদের সম্পর্কে কেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলছিল।'

মিশা বলল, 'নিজেদের ছাপাখানার কথা বাদ দে, গোটা তল্লাটেই ওদের নামডাক বেশ। আমরা দল গড়তে পারলে আমাদের উপদলগুলোর অন্য নাম দেব এই ধর, স্পার্টাকাস গোছের। জন্তু জানোয়ারদের নাম দেব না উপদলগুলোর।'

গেঙ্কা বলল, 'সে তো ওরাও বদলাতে চাইছে। ওদের নেতা বলছিল শুনিসনি।'

— 'তা ঠিক, তবে আমি আগেই ঠিক করেছিলাম, যখনই ওইসব উপদলের নাম ওরা জন্তুজানোয়ারের নামে রেখেছে দেখলাম, তখনই। শুনলি তো আন্তর্জাতিক যুব দিবসে ওরা সেরা পাইওনিয়ারদের কমসমোলে পাঠাবে। ভাবতে পারিস ওই কটা চুল সর্দারটা কমসমোলে চলে যাচ্ছে, আর আমরা এখনও পাইওনিয়ারই হতে পারলাম না।'

গজগজ করে ওঠে গেঙ্কা, 'ও ওই ছেলেটা, আচ্ছামতন ধোলাই দিলে ঠিক হয় ছেলেটাকে।'

— 'দূর ওর দোষ কী, ও তো ওর পতাকা বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, কী করেই বা জানবে আমরা কে। যাই হোক ছোকরার বেশ লড়াকু মেজাজ আছে।'

স্লাভা বলল, 'এবারে তাহলে পাইওনিয়ার ভবনের খোঁজ করা যাক।'

মিশা বলল, 'না, আমাদেরই তো কারখানা রয়েছে। ওখানে শুনলাম না যে প্রত্যেকটি কারখানায় পাইওনিয়ারদের দল গড়ে তোলা হবে। এই ব্যাপারে কমসমোল সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

গেঙ্কা শিস দিয়ে বলল, 'দূর, কারখানার অবস্থা সঙ্গীন বুঝলি। কাজের জন্য সকলকে ধর্না দিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। পিসি বলে ওরা টাকাপয়সার ব্যাপারে হাড়কেপ্পন।'

স্লাভা রেগে যায়। বলে, 'তুই যা জানিস না তাই নিয়ে বকবক করেই যাচ্ছিস। অনেক কারখানা নতুন করে চালু করা যাচ্ছে না, কারণ প্রত্যেকটি কারখানাকেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারখানা চালানো চাট্টিখানি কাজ না।'

মিশা বলল, 'আমাদের যেতে হবে পার্টি অফিসে। তার আগে জুরবিনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। গতবার যখন দেখা করেছিলাম উনি পাইওনিয়ার হওয়ার কথা আমাকে বলেছিলেন।'

তিনজনে ওদের বাড়ির উঠোনে এসে পৌঁছল। পৌঁছেই একটা হই হট্টোগোলের শব্দ শুনতে পেল ওরা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে উঠোনে পৌঁছে দেখল, করোভিনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে এক দঙ্গল ছেলে। কারোভিন পেছনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে ফাঁদে পড়া নেকড়ের ছানার মতন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। বরকা ফিলিন করোভিনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, 'বল কেন এসেছিস এখানে। চুরি করতে তাই না। দে না সবাই মিলে রাম ধোলাই ওকে।'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল মিশা। ছেলেটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'বাঃ, একজনের পিছনে দল বেঁধে লেগেছিস তোরা। মাথা খারাপ নাকি তোদের।'

গেঙ্কা বলল, 'ছেড়ে দে তো মিশা। এই ছেলেটাই তো তোর পয়সা চুরি করেছিল। রাস্তার ছেলেগুলো সব এক ধাঁচের। খুদে চোর ছাড়া আর কিছু নয়।'

হঠাৎ ছেলেটা ফুঁসে উঠল, 'চোর তুই নিজে।' ওর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

মিশা বলল, 'আয় আমাদের সঙ্গে ক্লাবঘরে আয়।' বলে ছেলেটার আস্তিন ধরে টানতে গিয়েও ছেড়ে দিল। ওরে বাবা, আবার যদি ছিঁড়ে যায়।

গেঙ্কার দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে ছেলেটা বলল, 'না আমি যাব না।'

বরকা হঠাৎ বলল, 'ঠিক আছে যাস না। বরং এখানেই থাক, আমার সঙ্গে পয়সা মারার খেলা খেলবি।'

মিশা ওকে টানতে টানতে বলল, 'ওসব বাজে চালাকি ছেড়ে দে তো, আয় আমার সঙ্গে আয়।'

৩৯.

শিল্পী

নাট্যচক্রের ক্লাবঘরে সবাই মিলে সিনারি আঁকছিল। শুরা ওদের ডিরেকশন দিচ্ছে। স্টেজের ওপরে লম্বা সাদা কাগজের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট ভভকা বার বার চেষ্টা করছে একটা চাষীর কুটির আঁকতে। পারছে না।

শুরা কেবলই ধমকাচ্ছে ওকে — 'এই ভভকা, একটা কুঁড়েঘর আঁকতে পারছিস না। আর তুই কিনা একজন শিল্পীর ছেলে।'

ভভকাও কম যায় না। সেও ঝাঁঝিয়ে ওঠে — 'সেটার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? বাবা বাবা, আমি আমি ব্যস।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে করোভিন একটুকরো কাঠকয়লা নিয়ে ছবিটা আঁকতে শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে কাগজের ওপরে স্পষ্ট ফুটে উঠতে লাগল, উনুন, জানলা, আর লম্বা লম্বা বেঞ্চি। গেঙ্কাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে মিশা বলল, 'দেখলি তো।'

গেঙ্কা তবু মুখ বাঁকায়, — 'আঁকতে পারে এ আর এমন কী। তুই যে কেন খামোখা ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামাস।'

মিশা ধমকে ওঠে, 'ছাড় দেখি তোর ওসব কথা। আমাদের প্রত্যেকে যদি একজন করে রাস্তার ছেলের দায়িত্ব নিতাম তাহলে রাস্তায় আর কেউ ঘুরে বেড়াত না বুঝলি।'

করোভিন ছবিটা শেষ করে বলে উঠল, 'তুলিগুলো সবকটা পচা।'

শুরা ওকে আরও কয়েকটা তুলি দিতে চাইল। তুলিগুলো দেখে করোভিন নিতে চাইল না, বলল, 'না, অন্য জিনিস চাই।'

মিশা ওর পকেট থেকে ঝেড়েঝুরে সব পয়সা বের করে করোভিনকে দিয়ে বলল, 'যা, দোকান থেকে যা তোর দরকার নিয়ে আয়।'

কিন্তু করোভিন পয়সা না নিয়ে মিশার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

মিশা বলল, 'যা না, কিনে নিয়ে আয়। মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছিস কেন?'

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে করোভিন মিশার হাত থেকে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

গেঙ্কা বলল, 'ফুঃ, গেল মিশা তোর পয়সাকড়ি। ও আর ফিরেছে।'

শুরা বলল, 'মিশা, পয়সাকড়ি এমন নয়ছয় করলে আমি কিন্তু বাপু আর এই ব্যাপারে থাকব না বুঝলি।'

মিশা ধমকে ওঠে, 'না জেনেশুনে মাথা গরম করছিস কেন তোরা। আগে সবুর কর। ফিরে আসুক ও।'

মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে। বড়দের আসার সময় হয়ে গেল বড়রা আসতে শুরু করেছে অথচ করোভিনের পাত্তা নেই। মিশা ভাবনায় পড়ল, সত্যি সত্যি ছোকরাটা ঠকাবে নাকি ওকে। তারপর মনে পড়ল পয়সা নেওয়ার আগে করোভিন কেমনভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল। না, আসবে ছেলেটা ঠিকই। তবু করোভিনের কোনও পাত্তা নেই। শুরা অধৈর্য হয়ে বলে, 'নাঃ আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। নে ভভকা, কাজটা ধর, শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি।'

ভভকা রং গুলতে শুরু করে। এমন সময় ক্লাবঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল করোভিন। বব করা কালো চুলওয়ালা লম্বা কালচেপনা একটা মেয়ে ওর কাঁধ জোরে চেপে ধরে ওকে ঠেলে নিয়ে আসছে। মেয়েটার পরনে নীল স্কার্ট আর খাঁকি কোর্তা, পাতলা কোমরে চওড়া ফৌজি ফেট্টি বাঁধা, গলায় লাল টাই। একটা হাতে করোভিনকে জোরে চেপে ধরে আছে, অন্য হাতে তুলি ব্রাশের একটা বাণ্ডিল। ওদের কাছে পৌঁছে মেয়েটা সরাসরি প্রশ্ন করে, 'ওকে তুলি আনতে পাঠিয়েছিল কে?'

মিশা আমতা আমতা করে উত্তর দেয়, 'আমি, কেন কী হয়েছে?'

— 'তুলি দিয়ে কী করবে তোমরা?'

— 'থিয়েটারের সিনারি আঁকছি।'

করোভিনকে ছেড়ে দিল মেয়েটি। স্টেজের কাছে গিয়ে সিনারিটা দেখল।

— 'কি নাটক করছ তোমরা?'

এবারে বুক ফুলিয়ে শুরা এগিয়ে গেল বলল, 'কুলাক আর ক্ষেতমজুর'। আমি শুরা, শিল্প নির্দেশক আর স্টেজ ম্যানেজার।' বলে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটির দিকে। কেতামাফিক করমর্দন করল মেয়েটি তারপর হেসে ফেলল।

— 'আমি ভালিয়া। পাড়ার ইয়ং পাইওনিয়ার ভবন থেকে আসছি।'

শুরা প্রশ্ন করে, 'কী গোলমাল হয়েছে শুনতে পারি কি?'

মেয়েটা আবার গম্ভীর হয়ে গেল। কঠিন স্বরে বলল, 'আমরা বাউণ্ডুলে ছেলেমেয়েদের চুরিচামারি বন্ধ করার চেষ্টা করছি। আর তোমরা তাদের চুরি করতে শেখাচ্ছ। এই ছেলেটা আমাদের রং তুলি চুরি করছিল।'

করোভিন বিড়বিড় করে বলতে থাকে, — 'না আমি চুরি করিনি। শুধু ধার নেওয়ার কথা ভাবছিলাম।'

মিশা এতক্ষণ খুব অবাক হয়ে মেয়েটাকে দেখছিল। কত বয়স হবে ষোল সতেরো, তার বেশি নয়। অথচ এরই মধ্যে পাইওনিয়ারদের নেতা হয়ে গেছে। ইয়ং পাইওনিয়ার ভবনে কাজ করছে। ও অবিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের সংঘটা কোথায়?'

— 'এই তো কাছেই। সত্যি কথা বলতে কী সবে শুরু করেছি আমরা। কিন্তু

তোমাদের এই চক্রটা কিসের বল তো? কে তোমাদের পরিচালক। কোন সংগঠনের মধ্যে থেকে কাজ করছ তোমরা?'

— 'বাড়ি কমিটির মধ্য থেকে।' গেঙ্কা চড়া গলায় বলে ওঠে।

— 'সত্যি! তা ইয়ং পাইওনিয়ারদের কথা শুনেছ তোমরা?' বলে ছেলেদের দিকে তাকায় মেয়েটি। ওর প্রশ্ন শুনে মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভা সমস্বরে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ।' অন্য ছেলেরা চুপ করে থাকার বদলে এত জোরে 'না জানি না' বলে যে ওদের কথা চাপা পড়ে যায়।

হাত তুলে মেয়েটি বলে, — 'না না, এত জোরে কথা নয়। পাইওনিয়াররা হল কমসমোলের উত্তরাধিকারী। সব ছেলেমেয়েরাই এখন পাইওনিয়ার হচ্ছে। সেখান থেকেই তারা শেষ পর্যন্ত কমসমোলে যাবে। — তোমরা বুঝি ভাবছ আমি শুধু রং তুলিগুলোর জন্যই এসেছি? না, ওগুলো তো অনায়াসেই ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারতাম। কিন্তু ও যখন বলল একটা নাট্যচক্রের জন্য নিচ্ছে তখন নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম।'

— 'দেখবার মতই বটে আমরা।' গেঙ্কা জোরগলায় বলে। শুনে সবাই হেসে ওঠে। হাসির দমক শেষ হলে গেঙ্কা আবার বলে, 'আমরাও পাইওনিয়র হব।'

মেয়েটি উত্তর দেয়, 'নিশ্চয়। তোমাদের ক্লাবের খবর আমি দেব, কেমন করে সাহায্য করা যায় দেখব। তোমরা বরং একদিন এসো আমাদের পাইওনিয়র ভবনে। আমরা তো অনেক কারখানা আর চক্র গড়ে তুলছি। এসো কিন্তু। তুলিগুলিও তখন ফেরত দেবে। তা তোমাদের নেতা কে?' সবাই মিশাকে ঠেলে দেয় সামনে, গেঙ্কা বলে, 'এইযে আমাদের সভাপতি।'

— 'বেশ'। তারিফ করার ভঙ্গিতে বলে মেয়েটি। -- 'তা, তুলিগুলোর দায়িত্ব তোমার ওপরে রইল। এসো একদিন তোমার দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে।'

— 'আচ্ছা, যাব।' মিশা বলল, তারপর কী ভেবে আবার বলল, 'বোববার আমাদের অভিনয় দেখতে আসবেন আপনারা।'

মেয়েটি চলে যেতেই মিশাকে পয়সা ফেরত দিয়ে করোভিন ছবি আঁকতে শুরু করে।

মিশা জিজ্ঞাসা করে, 'তা, দোকানে গেলি না কেন তুই?'

— 'কী হবে, অযথা পয়সা নষ্ট করে। আমার নিজের জন্য তো আর কাজটা করিনি।'

গেঙ্কা মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'দোকানে পয়সা দেওয়ার অভ্যেস নেই তো। সে যাকগে আঁকতে শুরু করে দে বরং।'

৪০.

ঝানু গোয়েন্দা

স্লাভার বুকে গুঁতো মেরে গেঙ্কা বলল, 'দেখ, ওই তো যাচ্ছে রে লোকটা, চল দেখি।'

ফটকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ফিলিন। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে সোজা এগোতে লাগল। ওরাও ওকে অনুসরণ করতে থাকে।

গেঙ্কা বলে, 'কেমন করে হাঁটছে দেখছিস। জাহাজে কাজ করত নিশ্চয়ই। কেমন পা ফাঁক করে হাঁটছে দেখ, যেন জাহাজের পাটাতনে হাঁটছে।'

স্লাভা তর্ক করে, 'কী যে বলিস। ওরকম করে অনেকেই হাঁটে, তাছাড়া বুট পরেছে, জাহাজীরা তো সবসময় ঢোলা পাতলুন পরে।'

— 'পাতলুন টাতলুনের ব্যাপার নেই এখানে। মুখখানা একবার দেখিস। দেখবি টকটকে লাল। পরিষ্কার বোঝা যায় জাহাজে থেকে রোদে জলে ওইরকমটা হয়েছে।'

স্লাভা স্বীকার করে, 'তা মুখখানা লালই বটে। কিন্তু সবাই জানে ও ব্যাটা মদ খায়। ভদকা খেলেও, অনেকের মুখ লাল হয়।'

গেঙ্কা রেগে যায়, বলে, 'আজ্ঞে না, ভদকাতে নাকটা লাল হয়, কিন্তু মুখখানা বেগুনি হয়ে যায়।'

স্লাভা থামে না বলতেই থাকে,'তা ছাড়া দেখ, হাতদুটো পকেটে পোরা। খাঁটি জাহাজীরা কখখনও তা করে না। আসল জাহাজীরা সবসময় হাতদুটো দোলায়, কারণ জাহাজ চলার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস করতে করতে ওইরকমটি হয়ে যায়।'

গেঙ্কা ক্ষেপে যায়, বলে, 'ধুত্তোর হাতদুটো পকেটে পোরা।' জানিসই না কিছু, জানিস জাহাজীরা ঝড়ের সময় পকেটে হাত গুঁজে মুখে পাইপ ধরে রাখাটা খুবই হিম্মতের কাজ বলে মনে করে। ব্যাপারটা তাই। তা ছাড়া তোর যদি বিশ্বাসই না হয়ে থাকে যে লোকটা সেই ফিলিনই, তাহলে তোর বরং বাড়িতেই থেকে যাওয়া উচিত ছিল।'

আর কোনও কথাবার্তা না বলে দুজনেই চুপচাপ ফিলিনের পিছু নেয়। ফিলিন অনেক গলি ঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই ডাকটিকিটের দোকানের সামনে থামল, এদিক ওদিক তাকিয়ে তারপর টুক করে ঢুকে পড়ল দোকানটায়।

স্লাভা বলল, 'সবই তো বোঝা গেল। এখন আর কিছুই করার নেই আমাদের।'

গেঙ্কা বলে, — 'চল না ভেতরে যাই?'

স্লাভা ওকে ধমক লাগায়, 'তোর লজ্জা করা উচিত গেঙ্কা। আগেই ঠিক হয়ে আছে যে আমরা ঢুকব না। মিশাও বারবার নিষেধ করে দিয়েছে। বুড়োটা মিশাকে ভাগিয়ে দিয়েছিল, আমাদেরও দেবে।'

— 'না, ভাগাবে না, আমরা যদি ডাকটিকিট কিনি তাহলে কে ঠেকাবে শুনি। আয় আয়।'

স্লাভা ওকে আটকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে গেঙ্কা দোকানের দরজাটা খুলে ফেলেছে। বুড়ো ডাকটিকিটওয়ালা কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে ফিলিনের সঙ্গে কথা বলছিল। ছেলেদের ঘরে ঢুকতেই কথা বন্ধ করে বুড়োটা কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই তোমাদের।'

গেঙ্কা বলল, 'স্ট্যাম্প দেখব।'

— 'দেখবার মতন কিছুই নতুন নেই। রোজই তোমরা আসো, অথচ একটা স্ট্যাম্পও কেনো না। যাকগে কী স্ট্যাম্প চাই তোমাদের।'

বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেঙ্কা বলল, 'গুয়েতামালার।'

তাক থেকে একটা বাক্স নামিয়ে তার থেকে বেছে একটা খাম ছুঁড়ে দেয় ওর দিকে বুড়োটা। বলে, 'নাও, এর থেকে বেছে নাও।'

গেঙ্কা এলোমেলোভাবে স্ট্যাম্পগুলো হাতড়াতে থাকে। সবাই ওকে নীরবে লক্ষ্য করছে। শেষ অবছি ওই চাপ আর সহ্য করতে না পেরে ও একটা স্ট্যাম্প দেখিয়ে বলে — 'এইটা।'

বুড়োটা খামটা সরিয়ে দিয়ে শুধু গেঙ্কার বাছাই করা স্ট্যাম্পটা রেখে দিল কাউন্টারে, বলল, 'কুড়ি কোপেক।'

গেঙ্কা অসহায়ভাবে স্লাভার দিকে তাকাল। স্লাভা বুঝল গেঙ্কার পকেট ফাঁকা। আর ওর নিজের কাছেও কিছু নেই। বুড়ো লোকটা আর ফিলিন একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বুড়োটা আবার বলে, 'হ্যাঁ, কুড়ি কোপেক দাম।'

জবাব দেবার বদলে গেঙ্কা পিছন ফিরে ছুট লাগাল বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে স্লাভাও। দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ওরা হনহন করে রওনা হল বাড়ির দিকে।

স্লাভা বলল, 'তোকে বললাম যাসনে ভেতরে।'

গেঙ্কা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, 'গেছি তো গেছি, কী হয়েছে তাতে?'

স্লাভা এবার রেগে যায়। বলে, 'বলছিস কি তুই। ওরা আমাদের খুব ভাল করেই চিনে নিল, আমরা যে নজর রাখছি সেটাও বুঝে গেল।'

— 'কেমন করে বুঝবে, গণ্ডা গণ্ডা ছেলেমেয়েরা পয়সা না নিয়ে দোকানে ঢোকে সকাল বিকাল, বললেই হল!'

— 'সবুর কর, মিশার কাছে খাবি একচোট।'

— 'ওর হুকুমে চলি না কি আমি। আমি কাউকে পরোয়া করিনা, বুঝলি?'

— 'মিশা কাউকে হুকুম করে না। কিন্তু ছোরাটা তো ওরই। তুই বোকার

মতন কাজ করে সব পণ্ড করে দিলি।'

— 'আমার কাজ আমি বুঝি, বুঝলি। আমারও চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা রয়েছে।'

ততক্ষণে ওরা বাড়িতে পৌঁছে গেছে। এসে দেখল মিশা জুরবিনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। গেঙ্কা যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে ডাকল, 'এই মিশা শোন, তোর জন্য খবর আছে।'

— 'কী খবর রে।'

— 'খুব ভাল।' ফিসফিস করে বলে গেঙ্কা। 'ফিলিনের পিছু নিয়েছিলাম। বুড়ো স্ট্যাম্পওয়ালার দোকানে গেল। কীভাবে হাঁটে লক্ষ্য করলাম, জাহাজী না হয়েই যায় না।'

মিশা বলল, 'দেখ তাহলে, আমার খবরও ভাল। জুরবিনের সঙ্গে দেখা করেছি। পাইওনিয়ার ভবনেও গিয়েছিলাম। কমসমোল বিভাগের সভাপতির সঙ্গে কথা হল।'

— 'কী খবর পেলি।'

মিশা রহস্য করে বলল, 'রোববারেই সেটা তোরা জানতে পারবি।'

— 'এখন বলতে পারবি না?'

— 'সময় হলেই দেখতে পাবি। সব ঠিক আছে। এখন আমাদের পাকাপাকিভাবে জেনে নিতে হবে যে, ফিলিন জাহাজে কাজ করত কি না। তারপর বুড়ো স্ট্যাম্পওয়ালাকে দেখব। তবে সে কাজটা তোদেরই করতে হবে। আমাকে আর কক্ষনও দোকানে ঢুকতে দেবে না বুড়োটা।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল স্লাভা। এবার বলল, 'সে আর ভাবতে হবে না মিশা। আমাদেরও এ কাজ করতে হবে না।' বলে অর্থপূর্ণভাবে গেঙ্কার দিকে তাকাল স্লাভা।

— 'মানে।'

— 'কারণ আমাদেরও আর দোকানে ঢুকতে দেবে না।'

মিশা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, — 'সে কী রে, কেন? কী হয়েছে বলতো।'

গেঙ্কাকে দেখিয়ে স্লাভা বলল, 'ওই বলুক।'

গেঙ্কা মুখ লাল করে বলে ফেলল, 'বুঝলি মিশা, আমবা তো ফিলিনের পিছু নিয়েছিলাম। ও যখন দোকানটায় ঢুকল আমরাও ঢুকে পড়লাম। স্ট্যাম্পের দাম দেবার মতন পয়সা ছিল না। তাই ধীরে ধীরে বেবিয়ে এলাম। ব্যাস, এই পর্যন্ত।'

মিশা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বাঃ, হুঁ বুঝলাম। সোজা কথা হল তোরা ধরা পড়ে গেছিস। কতবার তোদের বারণ করলাম ভেতরে যাবি না। আর সেই গেলি তোরা। এখন সবটাই তো গণ্ডগোল পাকিয়ে গেল। আমাদের কারোরই

আর যাওয়া চলবে না ওখানে। এই দ্বিতীয়বার তুই কাজটা পণ্ড করে দিলি গেঙ্কা। প্রথমবার বাক্সগুলোর কথা বরকাকে জানিয়ে দিয়েছিলি। আর এবার ঝামেলা বাঁধালি দোকানে। নাঃ, তোর ওপরে আর ভরসা করা যায় না। তোকে বাদ দিয়েই চলতে হবে আমাদের।' গেঙ্কা চুপ করে থাকে। জানে তর্ক করে লাভ নেই। মিশা ওকে বাদ দিতেই পারবে না। ওকে বাদ দিয়ে মিশা কখনই কিছু করবে না।

৪১.

উৎসবের দিন

ক্লাবের দরজায় পোস্টার টাঙানোই রয়েছে — 'রবিবার ছোটদের জন্য তিন অঙ্কের অভিনয় — 'কুলাক আর ক্ষেতমজুর' — স্টুডিও পরিচালক শুরা। স্টেজ ম্যানেজার শুরা, প্রধান ভূমিকায় শুরা, আর একেবারে নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা শিল্পী শুরার পরিচালনায় মিখাইল করোভিন।'

ঘোষণার মধ্যে নিজের নাম দেখে করোভিন খুবই খুশি। রাস্তার সবাই দল বেঁধে পোস্টারটা পড়ছে। অভিনয় শুরু হওয়ার অনেক আগেই থেকেই টিকিট বিক্রি করা শুরু হয়েছে। বিক্রির সব টাকা পয়সা জড়ো করে ছেলেরা 'ইজভেস্তিয়া' খবরের কাগজের দপ্তরে চলে গেল। ভোলগা এলাকার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য সবটা জমা দেবে। রোববার ক্লাব ঘর ভরে গেল ছেলেমেয়েতে। তুই হট্টগোল, এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, চিৎকার চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল সবার। আশেপাশের বাড়ি থেকে অনেক ছেলেমেয়ে এসেছে। করোভিন তার বাউণ্ডুলে ছেলেদের একটা বড় দল নিয়ে এসেছে। খেলোয়াড় ইগর্ আর ইয়েলেনাও এসেছে। মিশা সামনের সারিতে বসিয়ে স্লাভাকে বলছে ওদের দেখাশোনা করতে। ব্যবস্থা যখন সব পাকা, মিশা ছুটতে ছুটতে গেল জুরবিনকে ডেকে আনতে। সেখানে গিয়ে দেখে ভালিয়া রয়েছে, সঙ্গে আর একজন কমসমোল সভ্যও উপস্থিত রয়েছে। ছেলেটার পরনে টুপি আর চামড়ার জ্যাকেট, পকেট থেকে একগাদা খবরের কাগজ উঁকি মারছে। জ্যাকেটের বোতাম খোলা, ভেতর থেকে নীল রঙের জামা দেখা যাচ্ছে, জামাতে কমসমোলের ব্যাজ আটকানো।

মিশাকে দেখিয়ে জুরবিন বললেন, 'এই ছেলেটিই শুরু করেছে ব্যাপারটা।'

ভালিয়া বলল, 'আমাদের পরিচয় আগেই হয়েছে।'

কমসমোলের সদস্যটি হাত বাড়িয়ে দিলেন মিশার দিকে। বললেন, 'আমার নাম নিকোলাই সেভস্তিয়ানভ, সংক্ষেপে কোলিয়া।' কথা বলতে বলতে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে লোকটা মিশাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। লোকটি লম্বা,

কপালের ওপর একগোছা শণ রঙা চুল ঝুলে পড়েছে। মিশাকে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল যে মনে হল বুঝি ওর সবটাই দেখে নিচ্ছে, ভেতর অবধি। জুরবিন বললেন, 'কমরেড সেভস্তিয়ানভ তোমাদের অভিনয় দেখতে চান। অভিনয়ের পরে উনি কিছু ঘোষণা করবেন।' তারপর সবাই মিলে ক্লাবঘরে চলে এল।

স্টেজের পর্দা ওঠার আগে ম্যানেজার মিতিয়া সাখারভ একটা বক্তৃতা দিলেন। — 'কমরেডগণ, আপনারা এবারে আমাদের ক্লাবের শিশু নাট্যচক্রের অভিনয় দেখবেন। এই অভিনয়ের জন্য ক্লাবের তরফ থেকে ওদের সব রকম সাহায্য করা হয়েছে। কারণ আমরা মনে করি শিশুদের সব রকমের কাজেরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আমরা আশা করি সব খরচই আমাদের উঠে আসবে। এবারে আসুন আমরা সবাই অভিনেতাদের সাদর আহ্বান জানাই।' উনি হাততালি দিতেই হলঘরের সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। স্টেজের পর্দা উঠল, অভিনয় শুরু হয়ে গেল। খুব সুন্দর অভিনয় হল। জিনার অভিনয় দেখে সবাই খুব খুশি। বিশেষ করে যখন ও উনুন খুঁচুনি দিয়ে শুরাকে প্রচণ্ড প্রহার করছিল, আর শুরাও খাঁটি অভিনেতার মতন সব ব্যথা হজম করছিল মুখ বুঁজে, তখন তো সবাই একসঙ্গে বলে উঠছিল — 'লাগাও, আরও দু ঘা বসিয়ে দাও ওর পিঠে।' অভিনয়ের শেষে সবাই মিলে নাচ গান করল কিছুটা। ইগর্ আর ইয়েলেনা খেলা দেখিয়ে অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ করল। ওদের সঙ্গে সঙ্গত করল স্লাভা। সব হয়ে যাওয়ার পর কোলিয়া স্টেজে উঠে এলেন। তারপর বললেন — 'তোমাদের সকলেরই ভাল লেগেছে তো?' সবাই একসঙ্গে জবাব দিল, — 'হ্যাঁ।' কোলিয়া বলল, 'তাহলেই দেখছ, আমাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূর ভোলগা অঞ্চলের দুর্গতদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমরাই বল ওরা ভাল কাজ করেছে কি না?' সবাই আবার একসঙ্গে উত্তর দিল, — 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।' কোলিয়া বলল, 'ভাল, এখন বল দেখি, তোমরা কি ইয়ং পাইওনিয়রদের নাম শুনেছ?'

গেঙ্কা তারস্বরে চিৎকার করতে চাইল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' তারপর মিশার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে চুপ করে গেল। মিশা বলল, 'চেঁচাসনে থাম। তুই জানিস কিন্তু অন্যরা তো জানে না।' ততক্ষণে হলে প্রচণ্ড কোলাহল শুরু হয়ে গেল। সবাই বলার চেষ্টা করছে একসঙ্গে, 'না, জানি না তো।' এমন কী হাতাহাতিও শুরু হয়ে গেল। কোলিয়া হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বলতে শুরু করে — 'যে সব শিশুরা ইয়ং পাইওনিয়র হচ্ছে তারাই ভবিষ্যতে কমসমোল সভ্য হবে। তাদের বাবা দাদারা যে কাজ শুরু করে দিয়েছে সেই কাজ শেষ করতে হবে পাইওনিয়রদেরই। কাজটা হল কমিউনিজম গড়ে তোলা। আমাদের মহল্লায় এই রকম তিনটি দল রয়েছে, রবার কারখানায়, লিভারস ওয়ার্কসে আর গজনাক কারখানায়।'

মিশা প্রশ্ন করলে, 'তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে না কেন?'

কোলিয়া উত্তর দেন, 'সেই কথাই তো বলছি। সেই জন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আমাদের কারখানা এই ক্লাবটাকে নিয়ে নিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে কারখানায় একটা ইয়ং পাইওনিয়রদের দল তৈরি করব।'

গেঙ্কা হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হুররে, আমরা সবাই পাইওনিয়র হব।' আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার মিশার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে চুপ করে যায়। কোলিয়া তার বক্তব্য এবার শেষ করে, 'আর খুব একটা বেশি কিছু বলার নেই আমার। যারা পাইওনিয়র হতে চাও তারা আমার কাছে এসে এখুনি সই করে দিয়ে যাও। আজই আমাদের প্রথম বৈঠক বসবে।'

গেঙ্কা মিশাকে ঠেলা দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, 'মিশা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ওনাকে?'

— 'কী?'

— 'বয় স্কাউটদের সঙ্গে মারামারি করার অনুমতি আছে কিনা পাইওনিয়রদের।'

— 'আবার আজেবাজে প্রশ্ন,' চটে যায় মিশা, 'কিছু একটা বলতে হবে বলে কথা বলছিস। এই অভ্যেসটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না তোর। যখন কথা বলবি তখন একটু ভেবেচিন্তে নিজের আসল কথাটা বলবি।'

চতুর্থ পর্ব

সতেরো নম্বর দল

৪২.

পাইওনিয়র উপদলের ঘাঁটি

একটা কাঠের মইয়ের একেবারে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেঙ্কা ছাদের প্রায় কাছাকাছি দেয়ালে পেরেক দিয়ে পোস্টার আটকাচ্ছে একটা। সেখানে দাঁড়িয়েই হাতুড়ি দোলাতে দোলাতে বলছে, 'পাইওনিয়ররা সব কাজ চটপট করে, গুছিয়ে।' স্লাভা মইয়ের নীচটা চেপে ধরেছিল। গেঙ্কার চিৎকার শুনে বলল, 'হ্যাঁ সে তো ঠিকই চটপট করে গুছিয়ে। তুই ব্যাটা এরই মধ্যে গোটা একটা ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছিস, সে খেয়াল আছে।'

অনেকদিন পরে কারখানাটা পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। সেই উপলক্ষ্যে ছোট খাট একটা উৎসব করছে ওদের ক্লাব। ফার গাছের ডাল দিয়ে তৈরি মালা

ছাদে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাঝে মাঝে রঙিন বাতি। ইয়ং পাইওনিয়ররা শেষবারের মতন সব কাজ খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। সর্বত্র শিরিষ আঠা আর রঙের গন্ধ। পাইওনিয়ররা প্রত্যেকেই নতুন উর্দি পরেছে। ওরা যখন শপথ নিচ্ছিল তখনই কারখানার কর্তৃপক্ষ ওদের এই উর্দি দিয়েছিল। বলেছিল, 'দেশ জুড়ে এখন জুতোর অভাব, কাপড়ের অভাব। ধ্বংসের মধ্য থেকে গড়ে উঠছে দেশ। তবু তোমাদের জন্য আমরা সব করতে পারি মনে রেখ।' গেঙ্কার কাজকর্ম নীচে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল মিশা। পোস্টারটা টাঙানো শেষ হলে ও গেঙ্কাকে নেমে আসতে বলল। গেঙ্কা নেমে আসার পর তিনজনে মিলে দেখতে লাগল পোস্টারটা, লেখা আছে — 'এক নম্বর উপদল, লাল নৌবহর'। একটা পাতলা তক্তা কেটে অক্ষরগুলো বের করে আনা হয়েছে। পিছনে লাল কাগজ সাঁটা হয়েছে। তক্তাটার পেছনে একটা ইলেকট্রিক বাল্ব বসানো, ফলে আলোটা জ্বললেই পুরো ব্যাপারটা জ্বলজ্বল করে উঠছে। চমৎকার দেখাচ্ছে জিনিসটা। গেঙ্কা বুক ফুলিয়ে বলল, 'দেখ মিশা, পছন্দ হচ্ছে? আর কারও মাথাতে আসেনি কিন্তু।' সত্যি সত্যি অন্য উপদলদের সাইন বোর্ডগুলো ওদের মতন অতটা সাজানো নয়। সাদামাটাভাবে লেখা।

সেই সময় কোলিয়া সেভস্তিয়ানভ এসে উপস্থিত হতেই গেঙ্কা তাকে ডেকে বলল, 'এই যে দেখ কোলিয়া, খুব চমৎকার হয়েছে না! ওদের সকলের চেয়ে ভাল।'

কিন্তু কোলিয়া তেমন কোনও উৎসাহ দেখায় না। বলে, 'মন্দ নয়, তবে গর্ব করার কী আছে। অন্যদের চাইতে তোমরা বয়সে বড়। তোমাদের সাজানটা তাই অন্যদের চাইতে ভাল হবে সবচেয়ে।' তারপর মিশার দিকে তাকিয়ে বলল, — 'মিশা।'

— 'আজ্ঞে।'

— 'তোমার উপদলকে নিয়ে খেলার মাঠে এস। করোভিন ওর দল নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

— 'বেশ।'

কোলিয়া আবার মনে করিয়ে দেয়, — 'শোন মিশা, ওদের সঙ্গে প্রথমবার যে দেখা হবে সেইটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি মিতালি করে ফেলতে পার তাহলে ওরা রোজই আমাদের এখানে আসবে। আর তা যদি না পার তাহলে কোনওদিনই আসবে না। মেলামেশা করবে, বুঝতে চেষ্টা করবে ওদের। খেলাধুলোর মধ্যে টেনে আনতে চেষ্টা করবে ওদের। বুঝলে। বেশ, এবার যাও।'

মিশা সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দেয়, 'লাল নৌবহর, উপদল। সারি বাঁধ।'

৪৩.

খেলার মাঠ

উপদলের সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে। মিশা এই উপদলের নেতা। আর আছে স্লাভা, গেঙ্কা, শুরা, জিনা আর আশপাশের বাড়ির বেশ কয়েকটি ছেলে। সারি না ভেঙে সবাই খেলার মাঠে দৌড়ে গেল। পেছনের উঠোনটার নাম হয়েছে খেলার মাঠ। শুধু একটা ভলিবলের নেট টাঙানো, আর কিছু বদলায়নি জায়গাটার। বাড়ির কাছে অ্যাসফল্টের ওপরে জনাদশেক বাউণ্ডুলে ছেলে বসে রয়েছে। ওদের মধ্যে কয়েকজন আবার সিগারেট ফুঁকছে। সকলেরই ছন্নছাড়া, নোংরা চেহারা, উস্কোখুস্কো লম্বা লম্বা চুল, জট পাকানো। একজনের মাথায় শুধু একটা ছাই রঙের টুপি, আজই নিশ্চয় কোথাও থেকে জোগাড় করেছে। ওরা বসে বসে গল্প করছে আর টীকা টিপ্পনি কাটছে। অন্যসব ছেলেমেয়েরা যে ওদের কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছে সেদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপই নেই। পাইওনিয়ররা খেলার মাঠে পৌঁছেই দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। গেল ভলিবল মাঠের দিকে। আগে থেকেই সেটা ঠিক করা ছিল।

মিশা জোর গলায় বলল, 'আরে, আরও যে জনা ছয়েক খেলুড়ে চাই।' রাস্তার ছেলেদের এইভাবে খেলার মধ্যে টানতে চেষ্টা করল মিশা। ছেলেগুলো কিন্তু নড়ল না একচুলও। পাইওনিয়ররা খেলতে শুরু করল। ওরা নির্বিকার, খেলায় এমন কী আশেপাশের কোনও ব্যাপারে উৎসাহ নেই ওদের।

গেঙ্কা ফিসফিস করে মিশাকে বলল, 'ভবি ভোলবার নয় বুঝলি।'

জবাব না দিয়ে মিশা বল মারল। বলটা গিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কিন্তু তাতেও কোনও প্রতিক্রিয়া হল না ওদের। অলসভাবে পা দিয়ে বলটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল করোভিন। হইচই করে খেলতে থাকে পাইওনিয়ররা। কিন্তু বাউণ্ডুলে ছেলেদের কোনও উৎসাহের লক্ষণই দেখা গেল না। কেউ কেউ দেয়ালে হেলান দিয়ে রোদে ঝিম মেরে পড়ে থাকতে লাগল। মিশার ভাবনা হল। ও ভাবছে — 'আমাদের দৌড় কতটা সেটাই হয়ত লক্ষ্য করছে। চট করে ওদের টেনে আনা যাবে না। ওর ভয় হচ্ছে পাছে ওরা উঠে অন্যত্র না চলে যায়। ভাবতে ভাবতেই ও হুইসিল বাজিয়ে দিল। খেলা থেমে গেল। মেয়েরা মাঠের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেরা এসে বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোর পাশে বসে পড়ল হাঁপাতে হাঁপাতে।

মিশা বলল, 'আরে করোভিন যে, কেমন চলছে বন্ধু।'

করোভিন গাঁইগুঁই করে জবাব দিল, 'মন্দ না।'

হঠাৎ ওদের একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওই দণ্ডটা কিসের রে?' দুটো গাছের ওপর লোহার পাইপ বসিয়ে হরাইজন্টাল বার বানানো হয়েছে। সেদিকটায়

দেখাল ছেলেটা আঙুল তুলে। ছেলেটার সারা মুখে মেচেতার দাগ খুব গভীর।

মিশা উৎসাহ পেয়ে উত্তর দিল, 'ওটা হরাইজন্টাল বার।'

— 'কী হয় ওটা দিয়ে।'

— 'চল দেখিয়ে দি কী হয়।' বলে মিশা বারটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ভর দিয়ে বারে উঠে কয়েক পাক খেয়ে মাটিতে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তারপর ছেলেটাকে ডেকে বলল, 'তুই করতে পারবি নিশ্চয়ই।'

— 'জানি না, করিনি তো কখনও,' ছেলেটা আমতা আমতা করে উত্তর দেয়।

মিশা বলল, 'তাতে আর কী হল, পারবি নিশ্চয়, দেখ না চেষ্টা করে।'

ছেলেটা অলসভাবে উঠে হেলেদুলে এগিয়ে গেল বারটার কাছে। মিনিটখানেক ওটা দেখল, তারপর সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়ল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে এসে হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। ওর গায়ের কোটটা মাথার ওপরে সোজা নেমে এল, শূন্যে ঝুলতে লাগল নোংরা রোগা খালি পা। কিন্তু ঠিক ঠিক দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপরই আবার একটা লাফ দিয়ে নীচে নেমে এল সে, হেলেদুলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। ছোকরাগুলো দাঁত বের করে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে তাকাল ওদের দিকে।

মিশা বলল, 'সাবাস, খুব ভাল হয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ পারবে না। এই গেঙ্কা তুই একবার চেষ্টা করে দেখতো।'

গেঙ্কা জবাব দেয়, 'না বাবা, আমি পারব না।'

মিশা বলল, 'আরে দেখই না একবার চেষ্টা করে। ক্ষতি তো নেই।'

গেঙ্কা বারটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। লাফ দিয়ে ধরল বারটা তারপর বারটা ধরে জোরে জোরে দুলতে থাকল। তারপর বারের ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে জোরে জোরে পাক খেল। কিছুক্ষণ এরকম করে লাফ দিয়ে নীচে নামল গেঙ্কা।

করোভিন বলল, 'মন্দ হয়নি।'

মিশা বলল, 'এটাকে বলে সূর্যের চারদিকে ঘোরা।'

— 'আমাদের আর ও নিয়ে কী দরকার।'

শুরা ওদের কথার মধ্যে বলে উঠল, 'লাগতেও পারে। সবই তো আমাদের জানতে হবে, শিখতে হবে।'

ছোকরাগুলোর নজর পড়ল শুরার দিকে। খিলখিল করে হেসে উঠল খুদে ছেলেটা, 'ওরে, সেই কুলাক ছেলেটা। খুব পিটিয়েছিল তোকে উনুনখুচুনি দিয়ে।'

শুরা বলল, 'তাতে কী। খাঁটি অভিনেতাকে সব কিছুই অভ্যেস করে নিতে হয়। ত্যাগস্বীকার না করলে আর্ট হয় না বুঝলি।'

টুপি পরা ছেলেটা বলল, 'তা ঠিক। বাজিকরটা যখন খেলা দেখায়

সবসময়েই ওর ঘাড় ভেঙে পড়ার ভয় থাকে। তা সত্ত্বেও তো খেলা দেখায়।'

মেচেতামুখ ছেলেটা সায় দেয়, 'সার্কাসেও তো কত উঁচু থেকে লাফ দেয় ওরা। অথচ ভয় পায় না একটুও।'

এরকমভাবেই শুরু হল ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার। নতুন একটা সিনেমা নিয়ে কথা উঠতে যাচ্ছে তখনই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ওদের ওই চমৎকার আড্ডাটায় ছেদ পড়ল।

৪৪.

য়ুরার সাইকেল

স্কাউট য়ুরা আর বরকা উপস্থিত হল উঠোনে। এল বাইসাইকেলে চেপে। লেডিজ সাইকেল হলেও, একেবারে আনকোরা নতুন সাইকেল। পেছনের চাকার ওপর রংচঙে সিল্কের নেট। য়ুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করছিল আর বরকা বসেছিল পিছনের সিটে। উঠোনের চারদিক জুড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে ওরা। মুখে বিজয়ীর হাসি। সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতন ওরা নামিয়ে, পা ফাঁক করে হেলে দুলে মজা করতে থাকে। যেন দেখাতে চায় ওদের কত বেশি কেরামতি। সকলের চোখ পড়ে ওদের দিকে। পাইওনিয়রদের সঙ্গে বাউণ্ডুলেদের আলাপ আলোচনা বাধ্য হয়েই থেমে গেল। মিশা ভাবছিল য়ুরা আর বরকা নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই করছে এসব; ওদের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য। গেঙ্কা ফিসফিস করে মিশাকে বলে, 'এই মিশা, বলিস তো মজা দেখিয়ে দিই।'

কিন্তু মিশা ওকে থামিয়ে দেয়। মারামারি বাঁধিয়ে লাভ নেই। তাতে সব কাজই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। একটা কথা মাথায় আসতেই মিশা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিজেকে শান্ত করে ও ডাকল, 'এই য়ুরা, এদিকে আয় না একটু।' মিশা দেখতে পাচ্ছিল যে য়ুরার বাবা উঠোনের একটা কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মিশার ডাক শুনে য়ুরা চমকে যায়, ইতস্তত করে। মিশা আবার ডাকে, 'এই য়ুরা, ভয় পাস না, এদিকে আয় একটু।'

য়ুরা সাইকেলটা নিয়ে একটু এগিয়ে এল। মিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী সাইকেল রে এটা।'

— 'রয়াল এনফিল্ড।'

— 'ও, রয়াল এনফিল্ড।' সাইকেলটার গায়ে হাত বুলিয়ে মিশা বলে, 'বাঃ, বেশ সাইকেলটা তো তোর।'

করোভিন আর অন্য ছেলেগুলোও সাইকেলটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে থাকে। আর ঠিক সেই সময়টাতে গেঙ্কা মুখে আঙুল ঢুকিয়ে জোরে শিস দিয়ে ওঠে।

য়ুরার বাবা চমকে এদিকে তাকান। ওদের দেখতে পেয়ে হনহন করে ওদের দিকে এগিয়ে এসে য়ুরাকে ধমক লাগান, 'য়ুরা বাড়িতে যাও।'

য়ুরা আপত্তি করতে চেষ্টা করলে, আবার বিকট ধমক দেন তিনি।

— 'না, এক্ষুনি বাড়িতে যাও।' তারপরে অন্য ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় নাক সিঁটকালেন। যেমন দ্রুত এসেছিলেন তেমনিই দ্রুত ফিরে গেলেন বাড়ির দিকে।

সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে ওনার পিছন পিছন চলতে থাকল য়ুরা। সেই দেখে ছেলের দল হো হো করে হেসে ওঠে।

করোভিন বলল, — 'এবারে এক্কেবারে বোকা হয়ে গেছে।'

মেচেতার দাগওয়ালা ছেলেটা বলে, 'দেমাক করা উচিত নয়।'

৪৫.

ফিতের রহস্য

সবাই আবার আগের মতই গল্প করতে শুরু করে। ঘন্টাখানেক পরে ওরা চলে গেল। অবশ্য যাওয়ার আগে বলে গেল যে কাল আবার আসবে। প্রথম সাফল্যের ফলে ওরা সত্যিই খুশি। সকলে রাস্তার ওই ছেলেদের চালচলন নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। একটু দূরে বরকা একা একাই পয়সাবাজির খেলা খেলছিল।

গেঙ্কা ওকে ডেকে বলল, 'এই হাড়কিপটে, সাইকেল কী হল তোর?' বরকা কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। গেঙ্কা থামে না, বলে, 'বুঝলি, আমাদের কাজ পণ্ড করার চেষ্টা যদি করিস এমন শিক্ষা দেব না এক বছরের মধ্যে ভুলতে পারবি না। এটা তোর ওই স্কাউট বন্ধুটাকেও বলে দিস।' তবু বরকা একটা কথাও বলল না। মিশা নরম গলায় বলল, 'তুই ওর পেছনে লাগিস না তো গেঙ্কা। ঝগড়া করার কী দরকার। বরকা তো ঠিকই আছে, তবে ওই স্কাউটটার সঙ্গে ওর বেশি মাখামাখি করাটা ভাল নয়।' এবারে মনে হল বরকা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওদের কথা।

মিশা বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারি না ওদের অত খাতির কিসের। দেখলি তো য়ুরা ওকে মানুষই মনে করে না। ওর বাবা কেমন ঘেন্নার চোখে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে।' বরকা একটা কথাও বলছে না, শুধু শুনছে মিশার কথা।

মিশা এবারে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল বরকাকে, 'যা বললাম সত্যি কিনা তুইই বল।'

বরকা এবারে উত্তর দিল, 'কেন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিস বল তো। পাইওনিয়রদের দলে নাম লেখাতে বলছিস! দেখ, তোদের ওই পাইওনিয়র

হওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও লাভ নেই। তোরাও শুধু শুধু সময় নষ্ট করছিস, বুঝলি।'

গেঙ্কা চিৎকার করে ওঠে, 'কে তোকে দিচ্ছে রে নাম লেখাতে।'

মিশা গেঙ্কাকে থামায়, বলে, 'এক মিনিট দাঁড়া না গেঙ্কা।' তারপর বরকার দিকে ফিরে বলে, 'নারে আমি তোকে বোঝাতে চেষ্টা করছি না। শুধু কথাটা বলছিলাম মাত্র। যাকগে, একটা কাজে আমাদের সাহায্য করবি? বিরাট ব্যাপার কিন্তু। ওই তো কালই স্লাভাতে আমাতে কথা হচ্ছিল। তাই নারে স্লাভা?'

মিশার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে না পারলেও স্লাভা উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, কাল কথা হচ্ছিল বটে।'

বরকা খুব সাবধানে জিজ্ঞাসা করে, 'কী চাই তোদের।'

মিশা বলল, 'বুঝলি, আমরা আর একটা নতুন নাটক করতে যাচ্ছি। নাবিকদের নিয়ে নাটক, তাই একটা জাহাজি উর্দির দরকার। বুঝলি তো। আসল ডোরাদার গেঞ্জি, পাতলুন আর টুপি। নতুন কী পুরনো তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু জাহাজের নামটা স্পষ্ট থাকা চাই। যেমন ধর টুপির ফিতেটা। আরে সেই জন্যই তো তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম। তুই তো এইসবের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখিস, তাই তোর কথা ভাবছিলাম আমরা। হয়ত তোর পক্ষেই সম্ভব হবে ওটা আমাদের জোগাড় করে দিতে।'

বরকা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'বাঃ, বেড়ে বলেছিস তো। ধরেই নিয়েছিস যে তোদের কাজটা আমি করে দেব, বিনি পয়সায় নাকি। তোরা কি মনে করিস আমি একটা আকাট মুখ্যু?'

— 'আরে বিনি পয়সায় কে বলল, আমরা টাকা দেব তার জন্য।'

— 'কত টাকা দিবি?'

— 'দেখ বরকা, সেটা তো নির্ভর করবে আমাদের তুই কী জোগাড় করে দিচ্ছিস তার ওপর, তাই না। কী রে জোগাড় করে দিতে পারবি তো?'

— 'কী যে বলিস, বাঘের দুধও জোগাড় করতে পারি আমি, বুঝলি।' তারপর একটু ভেবে আবার বলল, 'ঠিক আছে টুপি ফিতে জোগাড় করে দিচ্ছি এক্ষুণি, কিন্তু তার বদলে মিশা তোর ছুরিটা আমাকে দিতে হবে।'

— 'সত্যিকারের জাহাজি ফিতে!'

— 'বলছি তো, তাই।'

— 'বেশ তো নিয়ে আয়।'

— 'ঠকাবি না তো,' বলে উঠে দাঁড়ায় বরকা।

— 'আরে বাবা, কথা তো দিচ্ছি। ফিতেটা নিয়ে আয়, ছুরিটা পাবি।'

বরকা ছুটল বাড়ির দিকে। এদিকে শুরা ততক্ষণে চটে লাল। বলল, 'তোর মতলবটা কী বলত মিশা, আবার কোন নতুন নাটক করতে যাচ্ছিস? আমাকে এই ব্যাপারে কোনও কিছু জানানো হয়নি কেন?'

— 'সেসব পরে বোঝাব তোকে। এটা অন্য ব্যাপার।'

— 'পরে মানে। নাট্যচক্রের পরিচালক আমি আর আমাকেই বাদ দেবার চেষ্টা করছিস।'

গেঙ্কা বলল, 'অত মেজাজ দেখাসনে শুরা। মিশা জানে ও কি করছে। সেইজন্যই তো উপদলের নেতা হয়েছে।'

— 'আর আমি না স্টেজ ম্যানেজার, নাটকের দায়িত্ব তো আমারই।'

— 'তোর দায়িত্ব তোরই আছে, সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না, এটা অন্য কোনও ব্যাপার হবে।'

ওদের দুজনকেই থামিয়ে দেয় মিশা, বলে, 'ওই দেখ বরকা আসছে।'

বরকা দৌড়তে দৌড়তে ওদের কাছে হাজির। ওর হাতে একটা কী জিনিস রয়েছে।

— 'এই মিশা, তোর ছুরিটা দে।'

— 'দেব, আগে দেখা কী আনলি তুই।'

বরকা হাতের মুঠো খুলে একটা দলা পাকানো কালো ফিতের একটা কোণ দেখাল।

হাত বাড়িয়ে মিশা বলল, 'আরে দে না দেখি, আসল জিনিস কিনা দেখতে দিবি তো।'

খপ করে হাতের মুঠি বন্ধ করল বরকা। বলল, 'হ্যাঁ, দিয়ে দিই, আর তুই কেটে পরিস। আগে ছুরিটা দে। ঘাবড়াস না, আসলি জাহাজি মালটাই এনেছি। জান কবুল করে বলছি।'

— 'আচ্ছা দেখাই যাক।' নিঃশ্বাস ফেলে মিশা ওর ছুরিটা বরকার হাতে তুলে দেয়।

বরকা ছুরিটা চেপে ধরে মিশাকে ফিতেটা দিল। মিশা ফিতেটার ভাঁজ খুলল, গেঙ্কা আর স্লাভা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর ওপর।

ওরা দেখল পুরনো হয়ে যাওয়া ফিতেটার ওপরে রূপোলি অক্ষরে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, পরিষ্কার পড়তে পারা যাচ্ছে — 'রানি মারিয়া'।

৪৬.

ফন্দি ফিকির

সেদিনের পর থেকে রাস্তার ওই বাউণ্ডুলে ছেলেরা রোজই আসতে লাগল খেলার মাঠে। ক্রমে আরও অনেক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে শুরু করে। এসে গল্প করে, ভলিবল খেলে, পাইওনিয়রদের সঙ্গে রীতিমতো দোস্তি হয়ে গেল ওদের। জুলাই মাস পড়ে গেছে, বেশ গরম বেড়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই ওদের গা থেকে ওই ঢোলা শতছিন্ন জোব্বা কোট জামা নামানো গেল না। বিশাল বিশাল সাইজের বয়লারে অ্যাসফল্ট গলানো হচ্ছে। পোড়া অ্যাসফল্টের ধোঁয়া, তার

গন্ধে সবসময়ই চারদিক ভরপুর হয়ে থাকে। গরম ঝাঁঝালো গন্ধ। রাস্তার দুপাশে দড়ি দিয়ে আলাদা করে রাখা জায়গাগুলোতেও গলানো অ্যাসফল্ট ঢালা হচ্ছে। ট্রামগুলোতে নতুন রঙ করা হয়েছে, বাড়ির ছাদে ছাদে রঙিন বিজ্ঞাপন উঠছে। রাস্তায় কাজ করা মজুরদের জন্য বারবার ঘন্টা বাজাচ্ছে ট্রামের ড্রাইভাররা। পুরো উঠোনটা ভরে গেছে বয়লার, রেডিয়েটার, ইট চুন পাইপ আর সিমেন্টের পিপেতে। নতুন করে তৈরি হচ্ছে মস্কো শহর।

গেস্কা সবসময়ই টাটকা খবরের জোগানদার হতে চায়। দূরে দূরে একটা দুটো চিমনিতে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে দেখিয়ে গেস্কা বলল, 'আজ ওই কারখানাটা চালু হল রে মিশা। কাল খুলবে এখানকার বন্ধ সুতোকলটা।'

মিশা ঠাট্টা করে বলে, 'তুই তো সব খবরই জানিস। কার চিমনি থেকে কবে ধোঁয়া উঠছে, সব খবর। তা বলত এখানে কী হচ্ছে।' বড় বড় খাম্বাগুলোয় ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কাজ করছিল তাদের দেখিয়ে মিশা প্রশ্ন করল।

— 'আরে এটা তো সবাই জানে। তার মেরামত করছে।' গেস্কা উত্তর দেয়।

— 'তার মেরামত করছে। খুব খবর রাখিস, কেন মেরামত করছে বল তো?'

— 'বোধহয় ছিঁড়ে গেছিল তাই।'

— 'হ্যাঁ, খুব জানিস তাহলে। ভাল করে জেনে নে, শোন — শাতুরা বিজলি স্টেশনে কাজ শুরু করা হয়েছে। কয়লার পিট থেকে জ্বালানি নিয়ে কাজটা করা হচ্ছে। এখন থেকে সারা রাত আলো জ্বলবে আর রাস্তার দুপাশেই থাকবে বাতি। ওরা কাশিয়া বিজলি কেন্দ্রের কাজও প্রায় শেষ করে এনেছে। সেটা চলবে কয়লাতে। তাছাড়া ভলখভ্ নদীতে জলবিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনাও শেষ। শিগগিরই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে সেখান থেকে।'

গেস্কা বলে, 'ওসব খবর আমি জানি। তুই একাই খবরের কাগজ পড়িস তা তো নয়।' আসলে গেস্কার বাড়িতে অনেকগুলো খবরের কাগজ আসে। ইজভেস্তিয়ার একটা সংখ্যায় ওদের নিয়ে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটা এইরকম — '২৬৭ নম্বর বাসিন্দা সমিতির শিশুদের তরফ থেকে ৮৭ রুবল' ভোলগা তীরবর্তী দুর্গতদের জন্য সাহায্য পাওয়া গেছে। খবরটা পড়ে সকলেই ভারী খুশি। গেস্কা তো খবরের অংশটা কেটে পকেটে নিয়ে ঘুরছে, যাকে পাচ্ছে তাকেই দেখাচ্ছে।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। ছেলেরা ছোরার খাপটা উদ্ধার করার কোনও কায়দাই বের করে উঠতে পারে না। এখন ওরা স্থির নিশ্চিত যে এই ফিলিনই 'রানি মারিয়া' জাহাজের সেই কুখ্যাত ফিলিন। এবারে ওদের নিশ্চিত হতে হবে যে মিশা যেটা ডাকটিকিটের দোকানে দেখেছে সেটাই ছোরাটার খাপ। কিন্তু কীভাবে সেটা জানা যেতে পারে ওরা ভেবেই পাচ্ছে না।

গেঙ্কা পরামর্শ দেয়, 'বুড়োটা যখন থাকবে না তখন স্রেফ দোকানে ঢুকে পড়ব আমরা। ওরা নিজেরাই তো ডাকাত, অত সমঝে চলার কী আছে।'

— 'কীভাবে ঢুকব শুনি?'

— 'সোজা, জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ব। এর চেয়েও ভাল হয় যদি করোভিনকে দিয়ে কাজটা করা যায়। ও তো এই ব্যাপারে খুবই ওস্তাদ।'

মিশা রেগে যায়। বলে, 'গেঙ্কা তুই তোর ওই লম্বা জিভটিকে একটু সামলা তো। তোর দোষেই আমরা ওই দোকানে আর ঢুকতে পারছি না। কাল একবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বুড়ো আমাকে কিছুতেই ঢুকতে দিল না। আসল কথা হল সন্দেহ করছে আমাদের। আর করোভিনকে এই ব্যাপারে টানার দরকার নেই। ওকে জানলায় তুলে দিয়ে আমরা মজা দেখব নীচে দাঁড়িয়ে। বাঃ ইয়ং পাইওনিয়রদের সম্পর্কে কী সুন্দর ধারণা হবে ওর। ছোরাটা সম্পর্কে ও তো কিছুই জানে না। না, আমাদের অন্য ফন্দি আঁটতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত মিশাই একটা উপায় খুঁজে বার করল। তবে কয়েকটা দিন পরে যখন ওরা সবাই মিলে হ্রদের ধারে ক্যাম্পিং করতে গেল তখন।

৪৭.

ক্যাম্পে যাওয়া

যেদিন ক্যাম্পে যাওয়ার কথা মিশা সেদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। ঘরের মধ্যে ইতিমধ্যেই রোদ এসে পড়েছে। ভোরের কুয়াশায় জানলার ভেতর দিয়ে আশেপাশের বাড়িগুলোর দেয়াল আবছা নজরে পড়ছে। কয়েকটা জানলায় টিম টিম করে আলোও জ্বলছে। ঘুম ভাঙতেই বিছানা থেকে একলাফে নেমে মিশা জিজ্ঞাসা করে, 'কটা বেজেছে মা।'

—'পাঁচটা। যা ঘুমো। অনেক সময় আছে এখনও।'

ঘরের ভেতরে মা চলাফেরা করছে। সকালের খাবার সাজাচ্ছে। মিশা হন্তদন্ত হয়ে জামা পরতে শুরু করল। বলল, 'না, উঠে পড়তে হবে। সবাইকে জড়ো করতে হবে আমাকেই। ওরা বোধহয় এখনও ঘুমোচ্ছে মা।'

—'একটু কিছু খেয়ে তো নিবি আগে।'

—'এক মিনিট।' বলে মিশা তাড়াহুড়ো করে নিজের ব্যাগটা গোছাতে শুরু করে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, 'মা আমার চামচটা কোথায়?'

—'ওখানেই কোথাও আছে।'

—'পাচ্ছি না যে!' বলল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিটা ভালভাবে হাৎড়াতে থাকে। পেয়েও গেল চামচটা। বলল, 'ও, এই যে পেয়েছি।'

মা ওদিক থেকে বলে, 'টেবিল ঘাঁটাঘাঁটি করিস না, সব এলোমেলো হয়ে যাবে।'

মা হাই তোলে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকে। —'এই নে তোর চা। সর কম্বলটা গুছিয়ে দিই আমি।'

—'না, তুমি গোছাতেই পারো না।' তারপর কম্বলটা পাকিয়ে ঝোলার সঙ্গে বেঁধে নিল। একটা মগ আর রান্নার পাত্র আগেই ওর ঝোলাতে ঝুলছিল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইভাবে করতে হয় বুঝলে।'

—'বেশ তো, তুই নিজেই কর না, তা ওখানে গিয়ে আবার কিছু হারাস না। জলে নামলে বেশি দূরে আবার সাঁতরে যেও না।'

চা খেতে গিয়ে জিভ পোড়াল মিশা। বলল, 'সে আমি ভাল জানি। আমি যে আর ছোটটি নেই, সেটা তুমি বুঝতেই চাও না মা। ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে ওইটা আমি প্রথম ভাঙব দেখো।' বলে ইটের উনুনটাকে দেখায় মিশা, 'বাষ্পের উনুন চালু হয়েছে জানো। সেটাই আগে বানাব।'

—'ঠিক আছে, আগে তো বানা, তারপর ভাঙতে দেব তোকে।'

ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়ল মিশা। সিঁড়ির কাছে গেঙ্কার সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি লাগে আর কী। গেঙ্কাও পুরোদস্তুর তৈরি। মিশা গেঙ্কাকে বলল অন্যদের জড়ো করতে। বলে নিজে ছুটল স্লাভাদের বাড়িতে। গিয়ে দেখে যা ভেবেছে ঠিক তাই। স্লাভা তখনও ঘুমোচ্ছে। মিশা চটে গিয়ে ডেকে তুলল স্লাভাকে। —'এই স্লাভা, আর কত ঘুমোবি রে তুই!'

স্লাভা হাত পা টানটান করে ঘুমেভরা চোখে বলল, 'কথা ছিল তুই এসে ডাকবি আমাকে।'

—'নিজের ওপরেও নির্ভর করা চাই স্লাভা। যাকগে ওঠ তাড়াতাড়ি।' তাড়া দিয়ে বিরক্ত মিশা পিয়ানোর ওপরে রাখা স্বরলিপিগুলো দেখতে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন স্লাভার বাবা। প্যান্ট ভেদ করে ওনার ভুঁড়িটা অনেকদূর বেরিয়ে এসেছে। খোলা সার্টের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে তার চওড়া বুক, লাল লাল চুলে ভর্তি। ফুলো মুখে দয়ামায়া যেন ভর্তি। আর তার মধ্যে ঘুমে জড়ানো চোখ দুটোতে মনে হচ্ছে একটা চেরা দাগ। হাই তুলে তিনি মিশাকে দেখে বললেন, 'এই যে পাইওনিয়র, ক্যাম্পে চলেছ তাহলে? সুপ্রভাত সেনাপতি মশাই, এত সকাল থেকেই বকুনি লাগাতে শুরু করেছ। ভাল, এই তো চাই', বলে মিশার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—'সুপ্রভাত, এই একটু আলাপ করছিলাম শুধু ওর সাথে।' কী কারণে যে মিশা স্লাভার বাবার সামনে পড়লেই কেমন যেন ঘাবড়ে যায়। মনে হয় এই বুঝি উনি পাইওনিয়রদের নিয়ে ঠাট্টা করবেন। অবশ্য উনি একজন হোমরাচোমরা মানুষ, পিসি বলেন, কারখানা বিশেষজ্ঞ।

—'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।' বলে তিনি চটি ফটফট করতে করতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন। আর তারপরেই প্রাইমার স্টোভের সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠতে থাকে। মিশা আরও বিরক্ত হল, ভাবল এই রে আবার চা করতে চলেছেন উনি। আবার দেরি হয়ে যাবে। সব ওই স্লাভার দোষে। শোবার ঘর থেকে স্লাভার মায়ের গলা শোনা গেল বাবাকে ডাকছেন।

স্লাভা উত্তর দেয়, 'বাবা রান্নাঘরে মা।'

—'বাবাকে বল কাটলেটগুলো মোম কাগজে জড়িয়ে দিতে।'

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে স্লাভা বলল, 'বলছি।'

—'বলছি না এক্ষুনি গিয়ে বলে আয়।' স্লাভা চুপ করে থাকে।

আবার মায়ের গলা শোনা যায়, —'ও কে রে তোর সঙ্গে।'

—'মিশা।'

—'মিশা, এই যে মিশা।'

—'নমস্কার।' উঁচু গলায় মিশা বলে।

বিছানা থেকেই স্লাভার মা বললেন, 'মিশা স্লাভাকে সাঁতার কাটতে দিও না, ডাক্তারের বারণ আছে। আর ওর ওপর একটু নজর রেখ। তুমি যাচ্ছ বলেই ওকে যেতে দিলাম। তোমার একটু বোধসোধ আছে আর স্লাভা তোমার কথাও বেশ মানে শোনে।'

মিশা স্লাভার দিকে মুখ ভেংচে বলল, 'নিশ্চয়ই।' স্লাভা রেগে গিয়ে জুতোর ফিতেটাই টানাটানি করতে থাকে।

কেতলি আর তারের স্ট্যান্ড নিয়ে ঘরে ঢুকলেন স্লাভার বাবা। টেবিলে কেতলিটা রেখে বললেন, 'এই যে ক্যাম্পওয়ালারা, চা চলবে তো?'

মিশা উত্তর দেয়। — 'আমার না, আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি।'

শোবার ঘর থেকে স্লাভার মায়ের গলা শোনা যায়। কথা বলেই চলেছিল। স্লাভার বাবা বললেন, 'সব ঠিক আছে, তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও বরং।'

—'ঘুমোই কী করে বল তো। তুমি ছেলেটাকে দুদিনের জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিলে। এই দুদিন কীরকম দুশ্চিন্তায় কাটবে ধারণা আছে! আজ আবার গানের জলসাও আছে আমার।'

ছেলেদের দিকে চোরা চাউনি দিয়ে স্লাভার বাবা বলে, 'কিছু দুশ্চিন্তা করতে হবে না, যেতে দাও। ওরা বড় হয়ে গেছে না!'

— 'না না, খুবই পাগলামি করলে। পুরো দুটো দিনের জন্য বাইরে পাঠাচ্ছ। তাও আবার তেমন কোনও জরুরি কারণে নয়। স্লাভা, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াবি না কিন্তু খবরদার।'

চা শেষ করে স্লাভা বিড়বিড় করে, 'ঠিক আছে।'

স্লাভার বাবা মিশাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হে সেনাপতি, তোমাকে একটা চিমটে দিয়েছিলাম সেটা কি কাজে লাগছে?' হাসতে হাসতেই বলছিলেন উনি।

মিশা বলল, 'খুব কাজ দিয়েছে জিনিসটা। ইয়ং পাইওনিয়র ভবনে আছে। ফিটার মিস্ত্রির ঘরে।'

—'সে কী, গোটা ভবনেই কি ওটার ব্যবহার হচ্ছে?'

—'না, সমস্ত পাড়া থেকেই আমরা যন্ত্রপাতি জোগাড় করেছিলাম যে।'

—'কথাটা বিশ্বাস করতে বল আমাকে?'

—'নিশ্চয়, ফিটার মিস্ত্রির ঘর ছাড়াও আমাদের রয়েছে ছুতোর মিস্ত্রির ঘর, সেলাই ঘর, জুতো বানানোর ঘর, বই বাঁধাইয়ের ঘর।'

—'বল কী, এ যে একটা গোটা কারখানা হে!'

কাঁধের ওপর ঝোলাটা নিয়ে স্লাভা বলল, 'শুধু তুমিই কিপটেমি করেছ। ওই দিককার, ওই কারখানার পরিচালক তো গোটা একটা লেদ মেশিনই দিয়েছে আমাদের।'

—'তাই নাকি, কিন্তু আমার যে লেদ মেশিন নেই। যদি চাও তো একটা গোটা তাঁতকল দিতে পারি। এই ঘরটার মতন বড়। চাও না? ঠিক আছে, তাহলে কী আর করা যাবে।'

—'তোমার খালি ঠাট্টা, চল রে মিশা।'

দরজা অবধি এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর বললেন, 'হাত পা না ভেঙে ফিরে আসার চেষ্টা কর। মাথাটা না ভাঙলে তো আরও ভাল।'

৪৮.

ক্যাম্পে

মিশার উপদল একটা কাঠের ভেলা তৈরি করেছে। সেটাতে চড়ে অনেকটা দূরে গিয়েছিল ওরা। তারপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে ফিরে এসে বিশ্রাম করছে। একটা বিরাট হ্রদ ওদের সামনে। দূরে আবছা হ্রদের কিনার ঘেঁষে তুষার ঘেরা পাহাড়ের মতন থরে থরে মেঘ জমেছে। নীল জলের ওপর তীরবেগে ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে গাংচিল। পার ঘেঁষে হাঁটু জলে হাজার হাজার ক্ষুদে মাছ ছোটাছুটি করছে। ডাঙার ধারে নলখাগড়ার সঙ্গে শাপলার সবুজ নাল জড়িয়ে আছে। ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ লেজের ঘাই মারছে ছপাৎ ছপাৎ করে। ব্যস্ত সমস্তভাবে গেঙ্কা কাঁধে বুকে মলম মালিশ করছিল আর বলছিল —'মোদ্দা কথা হল শরীরের চামড়া রোদ্দুরে পুড়িয়ে পাকাপোক্ত করা। ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণই হল পোড় খাওয়া চামড়া। মিশা আমার পিঠে একটু মালিশ করে দে না। তোর পিঠেও আমি মালিশ করে দেব।'

মিশা টিনটা হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর নাক সিঁটকে বলল, 'এ বস্তুটা কী রে।'

—'ভারী তো জানিস তুই। এটা বাদাম তেল, সবচেয়ে সেরা জাতের। গন্ধটা টিনের, পুরনো জুতোর কালির কৌটো কিনা তাই।'

—'ভেতরে তো ডিমের খোলা, রুটির গুঁড়োও রয়েছে রে।'

—'ও কিছু না, ঝোলাটাতে সব ওলট পালট হয়ে গেছে তাই। তুই মালিশ কর তো।'

—'না রে, তুই নিজেই কর। ওটা ছুঁতেই ইচ্ছে করছে না আমার।' কৌটোটা ফিরিয়ে দেয় মিশা।

—'ঠিক আছে, তাহলে করিস নে। দেখবি বিকেলের আগেই আমার চামড়া কেমন চকচকে হয়ে ওঠে।'

স্নাভা সবাইকে ডাকে, 'এই তোরা এদিকে আয়, কোলিয়া এসেছে।'

ছেলেরা দল বেঁধে চলল ক্যাম্পে। বনের ধারে চূড়োওয়ালা ছোট ছোট ছাই রঙের তাঁবু টাঙানো হয়েছে। ক্যাম্পের মাঝখানটায় একটা পতাকার খুঁটি পোঁতা হয়েছিল। আগামীকাল পতাকা তোলার উৎসব হবে। খুঁটির পাশে নতুন তোলা মাটি ছেলেমেয়েরা পা দিয়ে দুরমুশ করে দিয়েছিল। একটা ঢিবির মতন হয়েছিল। চারপাশেব মাটি বাদামি। পাইনের ছাল, হলদে কাঁটা আর মুচমুচে ডাল ছড়ানো রয়েছে সেখানে। ক্যাম্পের শেষ প্রান্তে একটা তাঁবু থেকে মেয়েদের হই হুল্লোরের শব্দ ভেসে আসছে। আগুন ঘিরে ভিড় জমিয়েছে ওরা। দুদিকের দুটো ফেঁকড়াওয়ালা ডালেব মাঝখানে একটা ডাণ্ডা বসানো। ডাণ্ডায় বাঁধা হাড়িগুলো আগুনেব ওপরে ঝুলছে। পোড়া পরিজের গন্ধ দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সারা ক্যাম্প জুড়ে।

গেস্কা কথা বলবেই। চুপ করে থাকা ওর মধ্যে নেই। ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে, 'মেয়েগুলো এত চেঁচায় কেন বলতো! পরিজ রাঁধা একটা কাজ নাকি! অথচ এমন করছে যেন একটা আস্ত হরিণের রোস্ট বানাচ্ছে।'

বনেব মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কোলিয়া, সঙ্গে সেই দশজন বাউণ্ডুলে ছেলে। সকলেবই পরনে ছেঁড়া জামা। শুধু করোভিনেরই কোমর অবধি খোলা। মিশা ভাবছিল কোথায় ওদের নিয়ে গিয়েছিল কোলিয়া, নিশ্চয় কোনও মতলব ছিল। এদিকে যখন সব যোগাড়যন্ত্র হচ্ছে, ততক্ষণ বসে বসে ওরা হাই তুলছিল। কোনও কাজ করার অভ্যাস নেই তো। হয়তো কেটেও পড়তে পারত ক্যাম্প থেকে। কোলিয়া তাই নির্ঘাৎ কোথাও নিয়ে গিয়েছিল।

—'কোথায় গিয়েছিলি রে?' মিশা জিজ্ঞাসা করে করোভিনকে।'

পাশের ছেলেদের আড়চোখে দেখে করোভিন উত্তর দেয়, 'গ্রাম।'

—'কেন রে?'

—'এই সব দেখতে। ফসল দেখলাম, গম মাড়াই কল দেখলাম। আমরাও একটা সময় তো — আমাদেরও গরু ছিল কিনা —।' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করোভিন।

মিশা তারিফ করার চোখে তাকাল কোলিয়ার দিকে। মেয়েরা ওকে ঘিরে রয়েছে। ক্যাম্পের আগুনের কাছে বসে ও পরিজ চাখছিল চামচে ফুঁ দিয়ে দিয়ে।

মিশা ভাবছিল —'কী বুদ্ধি কোলিয়ার। ওদের সবাইকে নিয়ে গাঁয়ে চলে গেল। ওরা সবাই গাঁয়ের ছেলে তো, তাই নিজেদের বাড়ি ঘর পরিবারের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই কোলিয়া ওদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল।

করোভিন মিশাকে বলল, 'আমরা স্টেশনেও গিয়েছিলাম রে।'

—'কেন, স্টেশনে কেন রে?'

—'স্টেশনে অনাথ ছেলেদের একটা বাড়ি আছে, দেখলাম কী কষ্ট করে, দিন কাটাচ্ছে বাচ্চাগুলো। ওরাও একসময়ে ... মানে আমাদের মতনই তো ছিল।' একটু ইতস্তত করে বলে করোভিন।

—'কেমন লাগল তোদের?'

—'মন্দ নয়। ওদের নিজেদের রান্নাঘরের জন্য সবজির বাগান আছে।'

মিশা বুঝল কোলিয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে। ধীরে ধীরে মিশা কোলিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে জিনা মেয়েটা গজরাচ্ছে — 'কিভাবে ভাগ হবে এসব এখন! একশো রকমের চিজ, কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। আর ওই মাছ বা মাংস, ডিম সব এলাহি কারবার।' আগুনের আঁচে জিনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

জিনার কথা শুনে কোলিয়া হাসে, বলে, 'মাছগুলো ছোট ঠিকই, কিন্তু সব মিলিয়ে আমাদের খাওয়াটা আজ দারুণ হবে সন্দেহ নেই।'

৪৯.

কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল

সেদিনের খাওয়াদাওয়াটা হল এককথায় চমৎকার। পরিজে ধোঁয়ার গন্ধ, শুকনো মাছেও তাই, আর চায়ের ওপর ভাসছিল পাইনের কাঁটা, চর্বির দলা আর ভাঙা ডিমের খোলা। আগুন ঘিরে সবাই খেতে বসেছে। সবাই বার্চ গাছের বাকল দিয়ে তৈরি চামচ দিয়ে খাচ্ছে। বাতাসে পাইনের চূড়া আওয়াজ তুলছে। দাঁড়কাকগুলো ডাকছে ভারী উত্তেজিতভাবে।

কোলিয়া একটা তার সোজা করে ওর মাংসের টুকরোটা আরও একটু ঝলসে নিল আগুনে। প্রত্যেকেরই ভাগে পড়েছে ছোট ছোট এক এক টুকরো। কিন্তু তবু সকলেরই মনে হচ্ছে যে এমন চমৎকার খাবার ওরা জীবনে কখনও খায়নি।

খাওয়াদাওয়ার পর কোলিয়া সবাইকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আগামীকাল অনাথ শিশু সদনের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের একটা নকল যুদ্ধের মহড়া হবে। আজ তাই একটু তালিম নেওয়া দরকার, যাতে আমাদের বদনাম না হয়ে যায়। ওই যে জায়গাটা দেখছ ওখানটায় থাকবে শ্বেতরক্ষীদের সদর ঘাঁটি, ওই যে হ্রদের ডানপাড়ে বনটাতে। উদ্দেশ্য হল শ্বেতরক্ষীদের সদর ঘাঁটিতে হামলা করে তাদের পতাকা কেড়ে নেওয়া। দু নম্বর আর চার নম্বর উপদল হবে শ্বেতরক্ষী, তাদের নেতা হবে শুরা, সে সাজবে ভরাঙ্গেল। গেক্কা হবে তার প্রধান সেনাপতি।'

গেক্কা প্রতিবাদ করে, 'আমরা শ্বেররক্ষী হতে যাব কোন দুঃখে। আমাদের উপদল হল লাল উপদল। আমরা লাল ফৌজ হব।'

শুরা বলল, 'ঠিক কথা, তা ছাড়া শ্বেতরক্ষীদের কোনও. প্রধান সেনাপতি ছিল না। যে ছিল·তাকে বলা হত কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল।'

কোলিয়া হাসল। বলল, 'বেশ, ভাল কথা। গেক্কা কোয়ার্টারমাস্টারই সাজবে। এখন সবাই কিন্তু হুকুম ঠিকঠাক মেনে চলবে। যেই বিউগিলের আওয়াজ হবে, সবাই খেলা বন্ধ করে ছুটে আসবে ক্যাম্পে।'

শুরা আর গেক্কা ভয়ানক চটে গেল ওদের ওই শ্বেতরক্ষীদের ভূমিকা পালন করতে হল বলে। যখন শ্বেতরক্ষীদের ঘাঁটি দখল করা হল, তখন দেখা গেল ভরাঙ্গেল আর তার কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল দুজনেই উধাও। অনেকক্ষণ ধরে ওদের খোঁজাখুঁজি করা হল। অনেকবার বিউগিল বাজানো হল। কিন্তু তবু ওদের পাত্তাই পাওয়া গেল না।

কোলিয়া বলল, 'ওরা ঠিকই ফিরে আসবে। এবার তোমরা চা খেয়ে নাও। তারপর বনের দিকে যাবে শুকনো ডালপালা জোগাড় করতে। মস্ত আগুন জ্বালানো হবে ক্যাম্পে।

সন্ধের সময় শুরা আর গেক্কা গুটি গুটি ফিরে এল। আগে শুরা, ওর পেছনে ধুঁকতে ধুঁকতে গেক্কা। এসে চুপটি করে কোলিয়ার পাশে বসে পড়ল। ওরা এমনভাবে গোঙাচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে যেন এইমাত্র বেদম প্রহার করেছে কেউ ওদের।

শুকনো গলায় কোলিয়া প্রশ্ন করে, 'কী চাও তোমরা?'

শুরা গম্ভীরভাবে বলল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করছি।'

—'সঙ্কেত জানানোর পরেও চলে আসোনি কেন।'

শুরা, বোধহয় বক্তৃতা ঠিক করেই রেখেছিল, গড়গড় করে বলতে থাকে, 'আমরা ইতিহাসের সত্যি ঘটনাটাকেই মেনে চলব ঠিক করেছিলাম। যেমন যেমনটি ঘটেছিল তেমন তেমনটিই ঘটানো দরকার। ভরাঙ্গেল ক্রিমিয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তাই আমরাও গা ঢাকা.দিয়েছিলাম। তবে তোমার যদি মনে হয় আমাদের ওই ভূমিকায় আমাদের অভিনয় ঠিক হয়নি, তাহলে দয়া করে ভরাঙ্গেলের পার্টটা আমাকে দিও না আর।'

কোলিয়া অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখল। তারপর বলল, 'বেশ তো, তা এখন ফিরে এলে কেন।'

গেঙ্কার দিকে হাত তুলে, শুরা বলল, 'আমার কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল অসুস্থ হয়ে পড়ল যে।'

কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলকে কাহিল দেখাচ্ছিল। থর থর করে কাঁপছে, মুখখানা জ্বরের ঘোরে লাল। চোখের কোটর লাল টকটকে। সারা শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, যেন কেউ ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

কোলিয়া বলল, 'কী ব্যাপার গেঙ্কা?' গেঙ্কা কোনও কথার উত্তর দিল না। তার হয়ে শুরা বলল, 'ওর চামড়ার ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে।' গেঙ্কার জামা তুলে কোলিয়া দেখল, সারা পিঠ বড় বড় ফোস্কায় ভরে গেছে।

—'কিছু মালিশ করেছিলে নাকি গায়ে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী?'

—'বাদাম তেল।'

—'দেখি তো।'

পকেট থেকে কৌটোটা বের করতেও যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে গেঙ্কা।

—'কোথা থেকে জোগাড় করেছ এটা?'

—'নিজেই বানিয়েছি, অনুপান দেখে।'

—'আর অনুপানটা কোথায় পেলে।'

—'বরকা দিয়েছিল।'

—'হুঁ, এটা তো দেখছি দস্তা আর জুতোর কালির মিক্সচার। ভারী ডাক্তার হয়েছ নিজে।'

বেচারি গেঙ্কাকে তখন ভেসলিন মালিশ করে একটা তাঁবুর মধ্যে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

৫০.

ক্যাম্পের আগুন ঘিরে

হ্রদের ধারে বিরাট আগুন জ্বালানো হয়েছে। সেই আগুন ঘিরে গোটা দল বসে গল্প করছে। জ্যোৎস্নার আলো হ্রদের জলে রুপালি ঝিকমিকে একটা রাস্তা এঁকে দিয়েছে। ঘন কালো বনাঞ্চল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পাশে আবছা আলোয় সাদা সাদা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। শুধু মিটমিটে তারার দলই যেন পরস্পরকে সংকেত জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়া পৃথিবীকে পাহারা দিয়ে চলেছে। কোলিয়া ওদের গল্প বলছিল। দূর দূর দেশের গল্প। সিংহলের চা বাগিচায় যে সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাজ

করে তাদের গল্প; সাইলেশিয়ার খনি-শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর অকল্পনীয় দারিদ্র্যের গল্প; আমেরিকার নিগ্রোদের গল্প যারা মানুষের মতন বেঁচে থাকার অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত, তাঁদের গল্প। গল্প শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েদের উত্তেজিত মুখে আর লাল লাল টাইয়ের ওপরে নাচতে থাকে জ্বলন্ত আগুনের আভা। সেই আভা কোলিয়ার রোগাটে আর ফ্যাকাশে মুখের ওপরে ঝুলে থাকা হালকা চুলের গোছার ওপরেও এসে পড়ে। আগুনে ছোট ছোট ডালগুলো মটমট করে ভেঙে ছোট ছোট লাল কয়লায় রূপান্তরিত হচ্ছে, আর হালকা বেগুনি শিখা তুলে জ্বলছে। মাঝে মাঝে আগুনের মধ্যে ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে একটা আধটা গরম কাঠকয়লা। ছেলেদের কেউ তখন সেটাকে সাবধানে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে গনগনে জ্বলন্ত কাঠগুলোর মধ্যে। কোলিয়া বিশ্ববিপ্লবের বীর যোদ্ধাদের গল্পও করে। কমসমোলের সভ্যদের গল্প, পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিস্টদের গল্পও বলে।

হাতের তেলোয় থুতনিটা রেখে মাটিতে উপুড় হয়ে মিশা শুনছিল। আগুনের খুব কাছে শুয়েছে বলে ওর মুখটা গনগনে লাল হয়ে উঠেছে। হ্রদের দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়া এসে ওর পিঠটা জুড়িয়ে দিচ্ছে। কোলিয়ার কথা শুনতে শুনতে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব নির্ভীক মানুষগুলোর দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ। আগুনের বৃত্তের বাইরে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যেই যেন ওরা সব জেগে রয়েছে। ও কল্পনা করে যে ধীরে ধীরে তারা যেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে হেঁটে যাচ্ছে; জেলখানা আর নির্যাতনকক্ষের অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করছে বীরের মতন। একটা সংকল্প গড়ে ওঠে মিশার মনে। ও ভাবে, ওইরকমই বীরত্বের কাজ ও করবে, কোলিয়া যাদের গল্প বলছিল তাদের মতনই হোক ওর জীবন। মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত সে ওদের মতন কাজ করে বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে দেবে। এরকমই স্বপ্ন সে দেখতে থাকে। কোলিয়ার গল্প শেষ হয়। সে এবারে সবাইকে ঘুমোতে যাওয়ার সংকেত দেওয়ার হুকুম দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিউগিলের একটানা সুর বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠল। গাছের মাথার ওপর থেকে দূর থেকে ভেসে আসতে থাকে তার প্রতিধ্বনি। ছেলেমেয়েরা সবাই আসর ভেঙে যে যার তাঁবুতে চলে যায়। ক্যাম্প জুড়ে ঘুম নেমে আসে।

কিন্তু মিশার চোখে ঘুম আসে না। তাঁবুর একপাশে শুয়ে সে পর্দার ফাঁক দিয়ে আকাশের তারাগুলো দেখে। পাশে শুরা কম্বলে মাথা ঢেকে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, শুরার ওপাশে হাঁটু মুড়ে স্লাভা ঘুমিয়ে পড়েছে, অল্প অল্প নাক ডাকছে ওর। স্লাভার পাশে গেঙ্কা। ঘুমের ঘোরে উশখুশ করছে। ব্যথায় কোঁকাচ্ছে। ওদের বিছানা হয়েছে নরম ফার গাছের ডাল বিছিয়ে, মাথায় দিয়েছে ঘাসের বালিশ। কোলিয়া এতসব খবর কিভাবে রাখে মিশা ভাবছিল। খুব পড়াশুনা করে নিশ্চয়। এত কিছু করেও পড়ার সময় পায় কী করে। কারখানায় কাজ করে, শ্রমিক ফ্যাকাল্টিতে পড়াশুনা করে, ইয়ং পাইওনিয়রদের নেতা হয়েছে, তাছাড়া কারখানায় কমসমোল পরিষদের

সদস্যও। হ্যাঁ, লোকের মতন লোক বটে, খাঁটি কমসমোল যাকে বলে। কোথায় যেন মট করে একটা গাছের ডালভাঙার শব্দ হল। কান পাতল মিশা। না, পাহারাদার। মেয়েদের তাঁবু থেকে নীচু গলায় চাপা হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জিনা, সবতাতেই মজা পায় মেয়েটা। হঠাৎ ইগর্ আর ইয়েলেনার কথা মনে পড়ে গেল মিশার। অনেকদিন দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে। সারা গরমকালটা। কোথায় আছে কে জানে। ভবঘুরে দুজন আর ওদের পোস্টার গাড়িটা। পোস্টার গাড়িটা খুব পছন্দ মিশার। বেশ হত গাড়িটা পেলে, বিজ্ঞাপন দেখাত সারা শহর জুড়ে, হয়তো সিনেমার একটা পাশও পেয়ে যেত। মিশা নিজেকে কল্পনা করল যে মস্কো শহর জুড়ে সে সেই পুরনো গাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। মনে হতেই উত্তেজিতভাবে উঠে বসল মিশা বিছানায়। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে পুরো ছকটা ভাবতে থাকল। জব্বর প্ল্যানটা তো, আগে যে কেন মাথায় আসেনি! এখন কাজ হল ইগরদের খুঁজে বের করা। মিশার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ঘুম ভাঙিয়ে স্লাভা আর গেঙ্কাকে ওর প্ল্যানটার কথা বলে। কিন্তু ভাবল না, সকাল পর্যন্ত বরং অপেক্ষা করা যাক। অবশেষে চোখ বুঁজে এল ওর। ওদিকে পাহারাদারদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের তাঁবুতেও হাসাহাসি থেমে গেছে, চারদিক নিঝুম। হ্রদের পাশে আগুনও নিভে গেছে। এখানে সেখানে শুধু দু এক টুকরো কাঠ জ্বলে উঠছে আবার নিভে যাচ্ছে।

৫১.

গোপন প্রস্তুতি

আগস্ট মাস শেষ হয়ে এল। শহরের বুলেভার্দে শীত শীত ভাব। ক্রমেই সেগুলো ঢেকে যাচ্ছে ঝরা পাতার পুরু গালিচায়। গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে। তার শেষ বিদায়ের হালকা সুবাতাসে ভরে যাচ্ছে চরাচর। একদিন পাইওনিয়রদের সভা শেষ করে ওরা তিনজন মাঠে এসে বসল। মাঠের উঁচু দেয়ালগুলির ফাটকে পাতিকাকের বাসা। কাকের ডাকে নির্জনতা ভাঙছে কবরখানার। কবরের ওপরের বিমর্ষ ঘাসগুলো হলুদ হয়ে গেছে। লোহার রেলিংগুলো দমকা হাওয়া এলেই কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মিশা বলল, 'সবুর করতে হবে এবার।'

একটা নিচু বেঞ্চিতে ওরা বসেছে। বেঞ্চিটা বেঁকে প্রায় মাটি ছুঁয়ে গেছে। গেঙ্কা বলল, 'এখানকার অর্ধেক লোকেরই জ্যান্ত কবর হয়েছিল।'

—'এ কথা বলছিস কেন রে!'

—'অনেক সময় হয় কী, মনে হয় যে লোকটা বুঝি মরেই গেছে। অথচ হয়ত খুব গাঢ় ঘুমের মধ্যেই রয়েছে। সেই অবস্থাতেই কবর দেওয়া হয়ে যায়।'

মিশা বলে, 'এরকমটা হয় না তা নয়, তবে কদাচিৎ।'

গেঙ্কা আপত্তি তোলে, 'না, হয় ওর উলটো। শরীরে ইলেট্রিক কারেন্ট চললেই সেরকমটা হয়। যাকগে কখন আসবে রে ওরা?'

স্লাভা বলল, 'কাজটা আমাদের শুরু না করলেই হত। তাই না রে?'

—'কেন?'

—'মিলিশিয়াকে খবর দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত।'

গেঙ্কা খেপে ওঠে, 'খেপেছিস নাকি। তারপর মিলিশিয়া এসে সব গুপ্তধন নিয়ে যাক আর কী।'

মিশা বলল, 'মিলিশিয়াকে তো যে কোনও সময়েই খবর দিতে পারি আমরা। কিন্তু তার আগে আমাদের নিজেদেব তো পুরো জিনিসটা জানা দরকার, নাহলে সবাই হাসবে আমাদের দেখে। বরং যেরকম প্ল্যান করেছি সেবকমই করা হোক।'

মিশার কথা শেষ হতে না হতেই পাঁচিলের ওপাশ থেকে এসে হাজির হল ইগব আর ইয়েলেনা। স্বাগত সম্ভাষণ সেরে ওদের কাছে অন্য একটা বেঞ্চিতে এসে বসল ওরা। ইয়েলেনা পরেছে শরৎকালের কোট, মাথায় বেঁধেছে উজ্জ্বল রঙের একটা রুমাল, ইগরের পরনে স্যুট টাই, মাথায় দুরন্ত টুপি, মুখটা অবশ্য আগের মতনই গম্ভীর। গুছিয়ে বসে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখে বলল, 'ঠিক সমযেই এসেছি আমরা কি বল!' ইয়েলেনা মিশার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। বলল, 'তোমাদের খবর কী।'

মিশা উত্তব দিল, 'ভাল, তোমাদের খবর?'

—'আমরাও ভাল আছি। এই তো একদফা বেরিয়ে এলাম।'

—'কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?'

—'অনেক জায়গায় — কুরস্ক। ওরিয়ল, ককেশাস।'

ইগরের দিকে তাকিয়ে মিশা প্রশ্ন করল, 'তারপব সেই ব্যাপারটার কী হল।'

ইগর্ উত্তর দিল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

ইয়েলেনাও বলল, 'হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি। তোমরা নিতে পারো জিনিসটা। কিন্তু কেন নিচ্ছ বল তো, একেবারে ভেঙেচুরে গেছে যে, টায়ারগুলোও রদ্দি।'

—'যাকগে, আমরা সারিয়ে নেব।'

ইয়েলেনা জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু সত্যি বল তো, গাড়িটা নিয়ে কী করবে তোমরা।'

মিশা সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বলে, 'এই একটা কাজ করব ভাবছিলাম।'

ইয়েলেনা বলে, 'তোমরা নিশ্চয়ই গুপ্তধনের খোঁজ করছ। আমি জানি বুঝলে।'

মিশা চোখমুখ লাল করে জিজ্ঞাসা করে, 'হঠাৎ তোমার এ কথা মনে হল কেন ইয়েলেনা।'

—'সে তোমাকে দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়,' বলে হাসল ইয়েলেনা।

—'কেমন করে?'

—'সত্যি বলব? যে সব লোক গুপ্তধন খোঁজে তাদের ভয়ানক বোকা বোকা দেখায়।'

মিশা কথা ঘোরায়, 'যাকগে ওসব। বল তো, তোমাদের গাড়িটা কবে পাব। তার জন্য কত দাম দিতে হবে বলো তো।'

—'যখন খুশি গাড়িটা নিতে পার। কিছু দিতেও হবে না তোমাদের। ওটা আমাদের সার্কাসে কোনও কাজে লাগবে না।' তারপর ঘড়ি দেখে ওরা উঠে পড়ল। বলল, 'এবারে যাই।'

ট্রাম পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল ওরা। ট্রামস্টপের কাছে কয়েকটা মিষ্টি কিনল ওরা। ভাগ করে নিল সবাই। তারপর ওরা দুজনে ট্রামে উঠে চলে গেল। ছেলেরাও বাড়ি ফিরল হাঁটতে হাঁটতে।

৫২.

পোস্টার গাড়ি

শরতের বাতাস নির্জন রাস্তায় শুকনো পাতা নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। ন্যাড়া গাছগুলোর চারপাশে জড়ো করে আনছে, তারপর পাক খাইয়ে গির্জার পাথুরে সিঁড়িতে ছুঁড়ে দিচ্ছে। কখনও খালি বেঞ্চিগুলোর ওপরে বিছিয়ে দিচ্ছে, আবার কখনও পথচারীদের পায়ের কাছে দলা পাকিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। আবার রাস্তায় রাস্তায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মোড়ের মাথায় ঝলমলে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাজান যে ঠেলাগাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে তার নীচে। গাড়িটার ওপর দুটো পাতলা তক্তা জুড়ে একটা ত্রিভুজ গড়া হয়েছে, সেখানে নতুন একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন — 'ব্রিগেড সেনাপতি ইভানোভ'। পাতলা কাঠে 'আর্ট সিনেমা হল' এই কথাটাও কায়ক্লেশে বসানো হয়েছে তক্তাদুটোর জোড়ের মাথায়। এই রাস্তায় যারা যাতয়াত করে, তাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে গাড়িটা। কয়েকদিন ধরেই গাড়িটা ওই কোণটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে ছেলেটা রোজ ওই ডাকটিকিটওয়ালার দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে যায়, বুড়োটা যাকে গালিগালাজ করে, সেই ছেলেটা গাড়িটাকে ঠেলে ঢোকাল একটা খিড়কির উঠানে। তারপর গেল দারোয়ানের ঘরে। দারোয়ানকে বলল, 'খুড়ো, আমার গাড়িটা ভেঙে গেছে। উঠোনে রেখে যাব?'

দারোয়ান অলসভাবে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'তা রেখে যাও, ক্ষতি আর কী।' শুনে ছেলেটা ফের উঠোনের দিকে গিয়ে সাবধানে গাড়ির ওপরে নজর বুলিয়ে

ওপরের কজাটা ছুঁয়ে তক্তার ওপরে আলতো টোকা মেরে সরে পড়ল। ক্রমে উঠোনটা খালি হয়ে গেল। জানলার আলো নিভল। অন্ধকার আর একটু গভীর হলে বুড়ো ডাকটিকিটওয়ালা আর ফিলিন বেরিয়ে এল খিড়কির দরজা দিয়ে। গাড়িটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। ফিসফিস করে বুড়োটা বলল, 'তাহলে সব ঠিকঠাক তো?'

ফিলিন বিরক্তভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আর কতকাল অপেক্ষা করবে ও। পুরো একটা বছর ধরে ওকে তুমি ঘোরাচ্ছ।'

বুড়োটা গাঁইগুঁই করে, 'সংকেতের ভাষাটা খুব প্যাঁচালো, মনে হয় গুপ্ত ভাষায় লেখা। সূত্র না জেনে পড়ার চেষ্টা করেই দেখ না। মনে হচ্ছে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে ভাল করতে।'

বুড়োর দিকে ঝুঁকে ফিলিন বলল, 'না, আর সে অপেক্ষা করতে চাইছে না। তোমার মাথায় কি কথাটা ঢুকল? দেখ রোববারের মধ্যে সব তৈরি রেখো। আমি কিন্তু নিজে আসব না, ছেলেকে পাঠাব।'

ফিলিন চলে গেল। বুড়োটা অনেকক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর দরজা দিয়ে ঘরে চলে গেল। আলো জ্বলা ঘরে বুড়োকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল রান্নাঘরে ঘোরাফেরা করছে। প্রাইমাস স্টোভে কেতলি বসাল। আলুর খোসা ছাড়াতে থাকল। বেশ গুছিয়ে কাজ করে লোকটা। একটু পরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে গেল। সেখানে টেবিলের ওপর ঝুঁকে মন দিয়ে অনেকক্ষণ কী যেন দেখল। তারপর একবার মাথা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওই জানলাটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। লোকটা পর্দা টেনে দিল। একহাতে পর্দা যখন টানল তখন ওর অন্য হাতে ছোরার খাপটা দেখা গেল। বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কালো চামড়ার খাপ। মাথায় ধাতুর পাত বসানো। একেবারে ডগায় একটা বল।

সেই সময় দারোয়ান তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে মাথাটা চুলকে হাই তুলল। তারপর ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ফটকটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময়ে সেখানে এল স্লাভা আর গেক্কা। দারোয়ান ওদের দেখে বলল, 'এই ছেলেরা, তোমাদের গাড়িটা নিয়ে যাও। খারাপ হয়েছে বলে তো মনে হয় না। যাও, গাড়িটা নিয়ে যাও।' চাকার তলা থেকে পাথরটা ঠেলে সরিয়ে ওরা গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল রাস্তায়। দারোয়ান দরজায় তালা মেরে দিল। নির্জন রাস্তার মোড়ে গাড়িটাকে টেনে আনল ওরা, তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ওপরের খিল খুলে দুটো পাল্লা আলাদা করে ফেলতেই একলাফে ভেতর থেকে মিশা বেরিয়ে এল। অনেক রাতে বাড়ি ফিরল মিশা। জামা খুলে সটান বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সে। চিন্তাগুলো সব গজগজ করছে ওর মাথায়। গাড়ির ফন্দিটা কিন্তু খুবই লাগসই হয়েছিল। পুরো এক সপ্তাহ ধরে প্রত্যেকটা দিন ওরা নজর রেখেছে ডাকটিকিটের দোকানটার ওপরে। বুড়ো লোকটা কাউকে এগিয়ে দিতে দরজা পর্যন্ত এসেই গাড়িটার কাছে একটু দাঁড়িয়ে আলাপ করছিল, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি যে গাড়িটার ভেতরে

কেউ আছে। রাতে গাড়িটাকে ওরা উঠোনের ভেতরে রাখত। এইভাবে বুড়োটার নাড়িনক্ষত্র জেনে নিয়েছিল ওরা। ছোরার খাপটাও দেখেছে অনেকবার। বলের স্ক্রু আলগা করে ধাতুর পাতটা খুলে নিতেই জিনিসটা হাত পাখার মতন হয়ে যায়। পাখাটার ওপরে কী যেন লেখাও রয়েছে। শুধু একটা জিনিস মিশা বুঝতে পারছিল না। সেটা হল বুড়োটা ফিলিনকে বলছিল, সূত্র না জানলে সাংকেতিক লিপি পড়তে পারবে না সে। খাপের মধ্যেই তো সূত্রটা রয়েছে। তাহলে — সে যাকগে এখন কাজ হল খাপটা হাতিয়ে নেওয়া। বরকাকে ঠকানো কঠিন হবে না। গাড়িটাকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। গাড়িটার ওপরে বরকার অনেকদিনের লোভ। গাড়িটা অবশ্য হাতছাড়া হবে। বিজ্ঞাপন দেখিয়ে সিনেমার টিকিট পাচ্ছিল ওরা। কিন্তু সে আর কী করা যাবে। তা ছাড়া স্কুলই তো খুলে যাবে। সোমবার। তখন তো আর সিনেমা দেখা যাবে না। আবার পাইওনিয়রদের ওসব কাজের মধ্যে থাকাটাও ঠিক নয়। এইসব ভাবতে ভাবতে পাইওনিয়রদের চিন্তা ওর মাথায় ভিড় করে এল। অনেক কাজ এখন ওদের সামনে।

৫৩.

ছোরার খাপ

গলির মোড়ে খোশমেজাজে শিস দিতে দিতে আসছে বরকা। ওর হাতে সুন্দর করে বাঁধা একটা পুঁটলি। রাস্তায় একটুও দেরি করেনি ও। বাবা বলে দিয়েছিল কোথাও যেন না থেমে খুব সাবধানে পুঁটলিটা নিয়ে বাড়িতে ফিরতে। বাবার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ও মানত ঠিকই যদি না 'আর্ট সিনেমা'র পোস্টার আঁটা গাড়িটা ওর নজরে না পড়ত। গির্জার উঠোনে রয়েছে গাড়িটা। গাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে মিশা, গেঙ্কা, স্লাভা আর করোভিন। জোর কথা কাটাকাটি চলছে ওদের মধ্যে। বরকা কৌতূহল সামলাতে পারল না, ছেলেগুলো কী নিয়ে ঝগড়া করছে দেখা দরকার। এগিয়ে গেল ওদের কাছে।

মিশা বলছিল, 'শুধু টায়ারগুলোই ধর না।' বরকাকে আসতে দেখে চাকার ওপর পা দিয়ে গুঁতো মেরে বলল, 'যে কোনও সময়ে ওগুলোর জন্য ভাল দাম পাবি।'

করোভিন নাক সিঁটকে বলল, 'দাম তো আমি বলেই দিয়েছি।'

গেঙ্কা বলল, 'হ্যাঁ, রেখে দে তোর দাম। এই গাড়ির জন্য মাত্র পাঁচ রুবল।'

ছেলেদের গা ঘেঁষে বরকা জিজ্ঞাসা করে, 'গাড়িটা বেচবি না কি রে।'

— 'হ্যাঁ, তাতে তোর কি?'

— 'না, এমনি জানতে চাইছি, জিজ্ঞেস করতেও দোষ না কি?'

— 'ভাগ এখান থেকে। আমাদের সময় নষ্ট করিসনি।'

— 'কিনতেও তো পারি।'

— 'বেশ তো কিনে ফেল।'

— 'কত দাম চাইছিস?'

— 'দশ রুবল।'

শুনে বরকা হাঁটু মুড়ে বসে গাড়িটা পরীক্ষা করতে থাকে, পাশে নামিয়ে রাখে পুঁটলিটা। গাড়ির হাতল দুটো ধরে মিশা বলে, 'এই টায়ার টিপে কোনও লাভ নেই। চাকায় বলবিয়ারিং দেওয়া আছে। দেখ না কেমন চমৎকার চলে। শুনতে পাচ্ছিস।' বলে গাড়িটাকে একটু একটু করে ঠেলে এগোতে লাগল। গাড়ির সঙ্গে হাঁটতে থাকে বরকা। বিশেষজ্ঞের মতন চাকার শব্দ শুনতে থাকে। মিশা বলল, 'আপনা আপনিই চলে, দেখ না একবার চালিয়ে নিজেই।' শুনে বরকা হাতল ধরে গাড়িটা ঠেলে দিল কিছুটা। সত্যিই বেশ গড়গড়িয়ে চলে। গেঙ্কা আর স্লাভাও গাড়ির পেছন পেছন চলল। সাবধানে করোভিনকে ওরা আড়াল করে আছে। পুঁটলিটার কাছেই বসেছে করোভিন। ওপরের কব্জা খুলে পাতলা কাঠের পাল্লাদুটো পাশে সরিয়ে দিয়ে মিশা বলল, 'আসল মজাটা দেখবি এবার! এই দেখ, ইচ্ছে করলে শুয়েও থাকতে পারবি পিছনে।'

বরকা বলল, 'মিছেই দর বাড়াচ্ছিস। রবারগুলো তো সব ক্ষয়ে গেছে।'

— 'কী, চোখ খুলে ভাল করে পড়ে দেখ। পয়লা নম্বরের জিনিস।'

— 'যাই লেখা থাক না কেন। রং তো উঠে গেছে। আরও সস্তায় দে।'

করোভিন ওদিক থেকে হাঁক ছাড়ে, 'মিশা, ঠিক আছে, ওই দামই দেব, আমিই গাড়িটা কিনব বুঝলি।' বরকাকে বেচার আগ্রহ নিমেষে উবে গেল মিশার।

— 'সাবাস, নিয়ে নে। তুই আর পেলি নেরে হাড়কিপটে।'

— 'আমি হয়ত আরও বেশি দাম দিতাম।'

— 'এখন আর না। সে তুই দিবিনে।'

— 'কেন', বলে পুঁটলিটা বগলদাবা করে বরকা।

— 'কেন তা জানতে চাস।' বলে একগাল হেসে ফেলে মিশা। অন্যরাও। বরকা বুঝল ওকে নিয়েই মজা করছে এরা। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ও শিস দিতে দিতে চলে গেল বাড়ির দিকে। বরকা বাঁক ঘুরতেই ছেলেরা একলাফে গির্জায় পেছনে নির্জন জায়গায় গিয়ে হাজির হল। পকেট থেকে করোভিন ছোরার খাপটা বের করল। উত্তেজিতভাবে মিশা ছিনিয়ে নিল ওটা। হাতের ওপরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সাবধানে পাতটা সরিয়ে প্যাঁচ খুলে বল টেনে বের করল। ভাঁজ খুলতেই হাত পাখার মতন হয়ে গেল খাপটা। সবাই বিস্মিত হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। খাপের ভেতর দিকটায় তালিকার আকারে কয়েকটা ফুটকি ড্যাশ আর গোল গোল দাগ সাজানো। ঠিক ছোরার ভেতরের সেই পেঁচিয়ে রাখা ধাতুর পাতেরই মতন। ব্যস, আর কিছুই নেই।

পঞ্চম পর্ব

সপ্তম শ্রেণী

৫৪.

ব্রশা মাসি

অঙ্কের দিদিমণি ক্লাসে ঢুকে পড়ানো শুরু করতে গিয়ে দেখলেন চক নেই। খুব রেগে মিশার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমকে ওঠেন, 'মনিটর, ক্লাসে চক নেই কেন?'

ডেস্ক ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে মিশা। 'নেই নাকি! ক্লাস শুরু হওয়ার আগেও তো ছিল।'

—'উড়ে গেল নাকি। যাও নিয়ে এস এক্ষুনি।' ক্লাসরুম থেকে ছুটে গেল চকের খোঁজে। স্টোররুমে গিয়ে দেখে সেখানে স্কুলের ঝি-মা ব্রশা মাসি বসে

বসে কাঁদছে। মিশা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল, কাঁদছ কেন মাসি, কেউ কি তোমাকে কিছু বলেছে?' রুমালে চোখ মুছে মাসি বলল, 'তিরিশ বছর এই স্কুলে কাজ করছি। কোনওদিন কারও গালমন্দ শুনিনি। আর আজ কিনা আমি বোকা হাঁদা বুড়ি হয়ে গেছি। ভালই পুরস্কার জুটল কপালে।'

—'কে, কে বলেছে এ কথা তোমাকে?'

উদাসীনভাবে মাসি বলে, 'যাই হোক, ভগবান তাকে ক্ষমা করবেন।'

মিশা রেগে গিয়ে বলল, 'এর সঙ্গে ভগবানের কী সম্পর্ক। তোমাকে অপমান করার ক্ষমতা কার আছে! কে তোমাকে অপমান করেছে বলবে তো?'

—'য়ুরা। দেরি করে স্কুলে এসেছিল। আমার ওপরে হুকুম আছে দেরি করে এলে স্কুলে ঢুকতে না দিতে। আমি বললাম যাও না হেডমাস্টারের অনুমতি নিয়ে এস। তো বলে কিনা, —'হাঁদা বুড়ি কোথাকার। কিন্তু শোন মিশা কাউকে বলিসনে আবার ...।' মাসির কথা শেষ হওয়ার আগেই মিশা তিনলাফে ক্লাসে গিয়ে হাজির। ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ফিলিয়া। দিদিমণি যেভাবে মুখ বুঁজে আছেন তাতে মনে হচ্ছে অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। এই দিদিমণি খুব কড়া মেজাজের। এতটুকু এদিক ওদিক সহ্য করেন না। তিনি ক্রমাগত পায়চারি করছেন ক্লাস জুড়ে। পিছন ফিরতেই জিনা ইশারায় সবাইকে জানিয়ে দিল যে ছুটির আর কয়েকটি মিনিট মাত্র বাকি আছে। দেয়ালের দিকে য়ুরা ওর ডেস্কে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মিশা নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে হাতের আড়ালে রেখে লিখল : —'য়ুরা ব্রশা মাসিকে 'হাঁদা বুড়ি' বলেছে। মাসি কাঁদছে। বিষয়টি নিয়ে জরুরি সভা ডাকা দরকার।' চিঠিটা ও এগিয়ে দিল স্লাভার দিকে। স্লাভা দেখে পাঠাল গেঙ্কা আব শুরার দিকে। ওরা পাঠাল মেয়েদের দিকে। কয়েকটা হাত ঘুরে চিঠিটা মিশার হাতে ফিরে এল। ভাঁজ খুলে ও পড়ল, শুরা লিখেছে, 'সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করাও। অভিযোগ তুলব আমি নিজে।' কী ভেবে চিঠিটার ওপরে আরও কিছু লিখতে যাচ্ছে, দেখে ফেললেন দিদিমণি। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করছ মিশা?' তারপর মিশার ডেস্কে পড়ে থাকা একটা বই তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাঠ্যবইয়ের বাইরে এসব বই ক্লাসে পড়ছ কেন? তুমি মনিটর আবার ইয়ং পাইওনিয়র। তোমার লজ্জা করা উচিত। যাই হোক বইটা হেডমাস্টারের কাছ থেকে ফেরত নেবে। এখন ক্লাস থেকে বাইরে চলে যাও। হুঃ কী বই না — প্রাচীন কাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত তরবারি, কৃপাণ ইত্যাদির ইতিহাস, বর্ণনা আর নকশা।' বাব্বা।'

৫৫.

ছাত্রদের সভা

বারান্দায় জানলার চৌকাঠে বসে আছে মিশা। জানলার সামনেই বরফে ঢাকা ইস্কুলের খেলার মাঠ আর গলি। সন্ধ্যা হয়নি কিন্তু গলির ওপাশে রাস্তায় দুটো বাতি জ্বলে উঠেছে। বারান্দায় সব চুপচাপ। কোথায় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ, ওপর তলার ব্যায়াম ঘরে পিয়ানো বাজানোর শব্দ, সেই সঙ্গে নাচের তাল। একটু বেকায়দায় পড়েছে মিশা সন্দেহ নেই। হেডমাস্টার মশায়ের কাছ থেকে বইটা আনতে যেতে হবেই। গেলে কী, কেন, কোত্থেকে সব জানতে চাইবেন উনি। ওঁর কাছে মিথ্যে কথা বলে পার পাওয়ার উপায় নেই। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সব বুঝে নেবেন তুমি বল আর নাই বল। সব ওই য়ুরা বদমাসটার জন্য। সব সময় দেমাক নিয়ে চলে। ঘন্টা বাজল। দরজা খোলার শব্দ, চেঁচামেচি আর হাসাহাসি হুড়োহুড়িতে সব নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে এল য়ুরা। মিশা ওর পথ আটকাল।

—'ব্রশা মাসিকে অপমান করেছিস কেন?'

—'তাতে তোর কী?' নাক সিঁটকে উত্তর দেয় য়ুরা।

—'তোর দেমাক রাখ। নয়তো কী করে চলতে হয় শিখিয়ে দেব।'

ক্লাসের বন্ধুরা ওদের ঘিরে দাঁড়ায়।

মিশা বলল, 'স্কুলের কর্মচারীদের গালমন্দ করা তোর স্বভাব। আমরা এটা একদম পছন্দ করি না। এটা তোর বাড়ি নয়, তোর চাকর চাকরানি নয় যে তম্বি করবি।'

ছেলেমেয়েদের ভিড় ঠেলে য়ুরার দিকে এগিয়ে আসে গেঙ্কা।

—'কথা বলে কেন সময় নষ্ট করছিস মিশা। কেমন করে ওকে শিক্ষা দিতে হয় এই দেখ।' বলেই ঘুষি পাকিয়ে য়ুরার দিকে এগিয়ে গেল গেঙ্কা। কিন্তু মিশা ওকে থামিয়ে দিল। তারপর য়ুরাকে ডেকে বলল, 'য়ুরা শোন, তোকে ব্রশা মাসির কাছে মাপ চাইতে হবে।'

—'কী বলছিস, একটা ঝাড়ুদারনির কাছে মাপ চাইব আমি?' য়ুরা খুব অবাক হয়।

—'আজ্ঞে।'

য়ুরা আবার নাক সিঁটকায়, 'আজ্ঞে না, তা হবে না।'

কড়া গলায় মিশা বলল, 'তাহলে ঘাড় ধরে মাপ চাওয়াব। যদি না চাস তাহলে ক্লাস সভায় কথাটা তুলব আমি।'

—'তোর ক্লাস সভার নিকুচি করেছে।' উদ্ধতভাবে জবাব দেয় য়ুরা।

—'ঠিক আছে, আমরাও দেখে নেব।'

সেদিনের শেষ ক্লাস ছিল জর্মান পড়া। মাস্টারমশাই আসেননি, ক্লাস হবে না। গেঙ্কা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে —'বই গোছাও, ছুটি, ছুটি।' মিশা তাড়াতাড়ি ওকে থামিয়ে দেয়। বলে —'ঠিক আছে, ক্লাসসভার মিটিং হবে।' সবাই ক্ষেপে যায়, গেঙ্কা বলে, 'কী আপদ, দুঘন্টা আগে বাড়ি যেতে পারতাম।'

লিওলিয়া বলে মেয়েটা বিড়বিড় করে বলে, 'সভা যেন অন্যসময় করলে হয় না।'

শুরা বলে, 'মিশাটার মাথায় কেবল বদবুদ্ধি।'

মিশা বলল, 'না সভা করব বলেছি, সভা হবে। বিষয়টা জরুরি' বলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসে মিশা।

মিশা তারপর ঘোষণা করে, 'আজকের সভা য়ুরাকে নিয়েন যা যা ঘটেছে সব তোমাদের সামনে পেশ করবে গেঙ্কা।'

গেঙ্কা উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে হাত পা নেড়ে :

— 'য়ুরা আমাদের ক্লাসের সুনামে কালি দিয়েছে। ব্রশা মাসিকে হাঁদা বুড়ি বলেছে। কেলেঙ্কারি ব্যাপার। এটা তো আর জারের আমল নয়। যদি হেডমাস্টার মশাই হতেন তাহলে য়ুরা ও কথা বলতে সাহস পেত না। কিন্তু ব্রশা মাসি সামান্য ঝাড়ুদারনি। তাই তাকে অপমান করা যেতে পারে। এইসব বাবুগিরি ছাড়ার সময় হয়েছে। স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক প্রস্তাব করছি আমি।'

এরপর বলতে ওঠে স্লাভা। বেশ ভেবেচিন্তে গুছিয়ে বলে. 'য়ুরার উচিত নিজের চালচলন খতিয়ে দেখা। খুসিমত চলব, ক্লাসের কারও ধার ধারব না, এটাই ওর দস্তুর। য়ুরাকে মাপ চাইতে হবে ব্রশা মাসির কাছে। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা একটু বেশি কড়া শাস্তি হবে বলে আমি মনে করি।'

লিওলিয়া বলে, 'পাইওনিয়ররা কেন য়ুরাকে আক্রমণ করছে বুঝতে পারছি না। গেঙ্কা তো ওর চাইতে হাজার গুণ বেশি গুণ্ডা! এটা ঠিক নয়। আগে য়ুরার বক্তব্য শোনা যাক। হয়ত এমন কোনও ব্যাপারই ঘটেনি।'

ডেস্ক থেকে উঠলই না য়ুরা। বসে বসেই বলল, 'গেঙ্কা স্কুলের হেডমাস্টার নয় যে যাকে খুশি তাড়িয়ে দেবে। বড় বেশি মাতব্বরি করছে ও। তারপর স্টোররুম বন্ধ রাখা হবে এটা মানতে পারি না। আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হচ্ছে। আমার ব্যবহারের জন্য কারও কাছে কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ক্ষমা আমি চাইব না। হেঁজিপেজি যার তার কাছে নিজেকে ছোট করতে চাই না। তোমাদের যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পার।'

এরপর বলতে ওঠে শুরা, 'বন্ধুগণ, ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিলে চলবে না। একটু খতিয়ে বিবেচনা করতে হবে। প্রথম কথা একজন স্ত্রীলোককে অপমান করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে 'হাঁদা'। এইসব ভাষা আমাদের

ভাষাকে কলঙ্কিত করছে। আমার প্রস্তাব হল এই ধরনের ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক।'

মিশা তখন অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর কেউ কি কিছু বলবে?'

জিনা হাত তুলল।

— 'ব্রশা মাসিকে আমি কাঁদতে দেখেছি। মেয়েরা শোন, ব্যাপারটা কিন্তু সাংঘাতিক। য়ুরার পক্ষে বলবার কিছুই নেই।'

সবশেষে মিশা বলতে ওঠে, 'ব্রশা মাসিকে য়ুরা অপমান করেছে, তার কারণ ওর ধারণা ব্রশা মাসির চাইতে ও অনেক উঁচুদরের লোক। কিন্তু নিজেরই বা কী গুণ আছে? কিছু না। ব্রশা মাসি তিরিশ বছর এই স্কুলে কাজ করছে। সমাজের প্রতি সত্যিকারের কর্তব্য করে চলেছে। অথচ য়ুরা ওর বাবার পয়সার খাচ্ছে দাচ্ছে, জীবনে কুটোটি অবধি নাড়েনি পর্যন্ত। আর যারা খেটে খায় তাদের অপমান করে ও। আমার প্রস্তাব য়ুরাকে ব্রশা মাসির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি না চায় তাহলে স্কুল কমিটির কাছে ব্যাপারটা পেশ করা হবে। সারা স্কুলই ওর ব্যবহারের বিচার করুক।' সভায় সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে য়ুরাকে ব্রশা মাসির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

৫৬.

সাংকেতিক ভাষা

সভার শেষে মিশা গেল হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। মিশার ডেস্ক থেকে যে বইটা দিদিমণি জমা দিয়ে গেছেন সেই বইটাই উনি পড়ছিলেন। মিশাকে ডেকে বললেন, — 'বোস।'

হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সভায় কী আলোচনা হচ্ছিল?'

মিশা বিশদভাবে সব বলল। শুনে তিনি বললেন, 'সিদ্ধান্ত নেওয়াটা হল শুরুর কাজ। তোমাদের দেখতে হবে যে য়ুরা সত্যি সত্যি ক্ষমা চায় কি না। সেই সঙ্গে বোঝাতে হবে যে ওর আচরণ খুবই গর্হিত ধরনের। ... সভায় তোমার আচরণ নিয়ে আলোচনা হয়নি।'

মিশা লজ্জায় লাল হয়, বলে, — 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

— 'পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন বই পড়ার আর ক্লাসে চিঠি লেখার কথা বলছি।'

— 'আমি তো পড়ছিলাম না বইটা। ডেস্কে ছিল। লেখার কাজ তো আমি ঠিকই করেছি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিশাকে খুঁটিয়ে দেখে হেডস্যার জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা মিশা, ছোরা, তলোয়ার এসব ব্যাপারে তোমার উৎসাহ কেন?'

— 'এমনিই, ভাল লাগে তাই।'

— 'তাছাড়া তোমার বন্ধুরা এবং তুমি সাংকেতিক ভাষার ব্যাপারে খুব উৎসাহী। জিনিসটা ভালই। কিন্তু তোমাদের কী কাজে লাগবে বল তো।' — তোমাদের বাতিকটা খুব মজার। কিন্তু যা চাইছ সেরকম ফল কি পাচ্ছ? যদি ঠিকমতন ফল পেয়ে থাক তাহলে অবশ্যই চালিয়ে যাবে। না হলে আমাকে জানিও। হয়ত আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারব।'

মিশা চট করে ভেবে নিল। সেই পাতখানা কি ওনাকে দেখানো ঠিক হবে? দু মাস ধরে চেষ্টা করেও ওরা একচুলও এগোতে পারেনি। ছোরা আর ছোরার খাপে একইরকম চিহ্ন আঁকা। সমাধানটা কোথায় সেটা ওরা বুঝতেই পারছে না। তার মানে পলেভয় ভেবেছিল সূত্রটা আছে খাপের মধ্যে, আর নিকিৎস্কি ভেবেছে সূত্রটা রয়েছে ছোরাটার মধ্যে। আসলে ছোরা আর খাপ কোনওটার মধ্যেই চাবিকাঠি নেই। হেডমাস্টারকে দেখাতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। উনি না পারলে আর কেউই পারবে না। অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিশা পকেট থেকে ছোরার হাতলের সেই জড়ানো ধাতুর পাতখানা বের করে হেডস্যারের হাতে দিল। বলল, 'এটাই হল জিনিসটা। আমরা তো লেখালেখির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।' পাতখানা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে দেখে তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, সাংকেতিক ভাষার মতনই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। আগেকার দিনে রুশ ইতিহাসপঞ্জী লেখা হত একরকমের সাংকেতিক ভাষায়। এ হচ্ছে তাই। দুরকমের জিনিসটা ছিল — সহজ আর জটিল। সহজটাকে আবোলতাবোল বলা যায়। সেটা সাধারণ বেশ সংকেত একটা ভাষা। বর্ণমালার অক্ষরগুলো দুটো সারিতে ফেলা হত। উপরের অক্ষরগুলি নীচের অক্ষরগুলির বদলে ব্যবহার করা হত। আর নীচের অক্ষরগুলি বসত উপরের অক্ষরগুলির জায়গায়। আর জটিল যেটা সেটা আরও হেঁয়ালিপূর্ণ। সেখানে গোটা বর্ণমালাকেই তিন সারিতে ভাগ করা হত। প্রথম সারিটার জায়গায় বসত ফুটকি চিহ্ন। যেমন ক বলতে একটা ফুটকি, খ বলতে দুটো ফুটকি এমনি ধারা। দ্বিতীয় সারি বোঝান হত ড্যাশ চিহ্ন দিয়ে যেমন এল একটা ড্যাশ, এম দুটো ড্যাশ এমনি ধারা। তারপর তৃতীয় সারিতে বসত গোল চিহ্ন। একটা গোলচিহ্ন মানে সারির প্রথম অক্ষর, দুটো মানে দ্বিতীয় অক্ষর। এইরকম। চিহ্নগুলো স্তম্ভাকারে সাজানো হত। বুঝলে।'

— 'এ তো খুবই সোজা। এখন বুঝলাম পাতটার লেখা কীভাবে পড়তে হবে।' মিশা তখন খুশি হয়ে ওঠে।

— 'না, সোজা যদি হত তাহলে লেখাটার প্রত্যেকটি স্তম্ভে দশটি করে চিহ্ন থাকত। কিন্তু এখানে একেকটি স্তম্ভে খুব বেশি হলেও পাঁচটির বেশি

নেই। হেডস্যার আবার একটু চুপ করেন। নিজের মনেই কি চিন্তা করেন তারপর বলেন, 'এটা যদি সেই সাংকেতিক চিহ্ন হয়, তাহলে এর বাকি অর্ধেকটা অন্য কোথাও আছে।'

৫৭.

অদ্ভুত লেখা

মিশা এইবারে বুঝতে পারল যে আসল গোলমালটা কোথায়। পকেটের ভেতরে ছোরার খাপটা হাত বুলিয়ে দেখে নিল সে। এখন মিশা বুঝতে পারছে সেই বুড়ো ডাকটিকিটওয়ালা কেন সাংকেতিক লিপি উদ্ধার করতে পারেনি।

মিশার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেডস্যার আবার বললেন, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে লেখাটার বাকি অর্ধেক অন্যত্র কোথাও আছে।'

যা থাকে কপালে। মিশা ছোরার খাপটা পকেট থেকে বের করে ফেলল। তারপর সেটা খুলে হেডস্যারের সামনে রাখল।

হেডস্যার মুচকি হেসে বললেন, 'খুবই সাবধানী লোক তুমি।'

দুটো পাত এবারে একজায়গায় বসালেন উনি। মিশা এখন লক্ষ্য করল যে একটা পাতের একদিকটা বেশি বাড়ান, আরেকটার অন্যদিকটা যেন ভেতরে ঢুকে গেছে। কোনখানে লাগাতে হবে সেটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখন। কেন যে ব্যাপারটা আগে ওর নজরে পড়েনি কে জানে। দুটো পাত একজায়গায় জোড়া দিয়ে একটা কাগজ চাপা দিয়ে রাখলেন হেডস্যার। তারপর বললেন, 'এবারে দেখেছ। দশ চিহ্নওয়ালা সংকেতলিপি। এবারে তাহলে পাঠ করার চেষ্টা করা যাক।' চেয়ার থেকে উঠে বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে একটা বই নিয়ে ফিরে আগ্রহের সঙ্গে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'এই যে পেয়েছি। একটা পেনসিল আর কাগজ নিয়ে লেখ আমি যা বলছি।'

মিশা কাগজ পেনসিল টেনে নিল।

হেডস্যার বলতে শুরু করলেন, 'লেখ চ-য় আকার, ব-য় হ্রস্ব ই কার, দ-য় আকার, ও। তাহলে কী দাঁড়াল, 'চাবি দাও'। বেশ আরও লেখ ঘ, ড়-য় হ্রস্ব ই কার, ত-য় এ কার মানে, 'ঘড়িতে'।' এইভাবে পুরো লেখাটা উদ্ধার হল — 'চাবি দাও ঘড়িতে এই সাপটা দিয়ে। বারোটা বাজতেই গম্বুজটা আপনা আপনিই ঘুরে যাবে'।

হেডস্যার বললেন, 'অদ্ভুত লেখা তো!' বলে ছোরাটা খুব মনোযোগ দিয়ে পরখ করতে থাকেন।

— 'এখন কী করবে বল।'

মিশা কাঁধ ঝাঁকাল।

— 'আর যাই হোক তুমি এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি জান।'

মিশা মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। হেডস্যার হেসে বললেন, কাঁটা থাকলে গোলাপও থাকে। ছোরার খাপ যখন রয়েছে তখন ছোরাও নিশ্চয়ই একটা আছে। মিশা এবারে ছোরাটা বের করে সংকেতলিপির ধাতুর পাতটা কীভাবে ওটার ভেতর জড়িয়ে পুরে রাখা যায় সেটাও দেখাল।

— 'বেশ কায়দা তো। দেখতে তো ঠিক নাবিকদের ছোরার মতন।'

— 'নাবিকদের ছোরা তো বটেই।'

— 'তুমি ঠিক জান?'

— 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

— 'শুনে খুশি হলাম। মধ্যযুগে হাতলের মধ্যে গুপ্ত রহস্য ইত্যাদির খুব চল ছিল। যাকগে এই ব্রোঞ্জের সাপটার কথাই তো বলেছে দেখছি। শুধু ঘড়িটার খোঁজ পেতে হবে। এবারে মিশা, এই ছোরাটা সম্বন্ধে যা জানো সব খোলসা করে বল তো।'

মিশা তখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবরণ বলল। সবটা শান্তভাবে ধৈর্যধরে শোনার পর হেডস্যার বেশ কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর আঙুল বাজালেন। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলজনক। 'রানি মারিয়া' জাহাজের ঘটনাটার কথা আমার মনে আছে। খবরের কাগজে খুবই হইচই হয়েছিল সেই সময়ে। তবে ওইটুকুই। নিকিৎস্কি জানত যে খুন করে ও সহজে নিস্তার পাবে না। জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটলে বরং সবকিছু চাপা পড়ে যেতে পারে, সেটাই ওর ভরসা। জাহাজ উড়িয়ে দেওয়া হবে সেই খবরটাও ও নিশ্চয় জানত।'

মিশা খুব অবাক হল। সত্যিই তো নিকিৎস্কির সঙ্গে বিস্ফোরণের একটা সম্পর্ক অবশ্যই ছিল।

হেডস্যার জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাকগে সেসব। এখন কী করবে বলে ঠিক করেছ?'

— 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম লেখার অর্থটা উদ্ধার করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। এখন তো দেখছি আমাদের সেই হিসেবে গণ্ডগোল ছিল। যে অফিসার খুন হয়েছিলেন তার পরিচয়টা এখন জানা দরকার হয়ে পড়েছে।'

— 'ঠিক বলেছ। পলেভয় নিশ্চয়ই সেই অফিসারটার নাম বলেছে তোমাকে?'

— 'বলেছে তবে শুধু প্রথমটুকু — ভ্লাদিমির। পদবিটা উনিও জানতেন না। সত্যি বলতে কী আমি আর আমার বন্ধুরা ছোরাটার সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জোগাড় করেছি।'

— 'খোঁজখবর করেছিলে তুমি?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'বেশ তো। দিন কতক বাদে তোমাদের ডেকে পাঠাব। তোমাদের তদন্তের খবর শোনা যাবে।'

৫৮.

দেয়াল পত্রিকা

কোলিয়াকে মিশা য়ুরা সম্পর্কে যা যা বলার সব বলল। কোলিয়া পিঠ চাপড়ে বেশ তারিফই করল ওদের। বলল প্রত্যেকটি স্কুলেই একটা করে ইয়ং পাইওনিয়রদের দল তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সব ইয়ং পাইওনিয়রদের একজোট করা যায়। সেইসঙ্গে কোলিয়া ওদের একটা দেয়াল পত্রিকা বার করার উপদেশ দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের দেয়াল পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি ক্লাসঘরের কাছেই বারান্দায় টাঙানো হল। পত্রিকার নাম ওরা দিয়েছে — 'সংগ্রামী পত্র'। মিশার একটা লেখা নিয়ে কাগজটা শুরু করা হল। লেখাটির নাম — 'অবাঞ্ছিত আকর্ষণ'। মিশার গল্পটা এরকম : আমাদের সপ্তম শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্রের একটি অস্বাস্থ্যকর ঝোঁক আছে অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিকে। যেমন একজন সিনেমার অভিনেত্রী — তিনি যতগুলি ছবিতে অভিনয় করেন সবকটির শেষেই তার বিয়ে হয়ে যায় কোটিপতির সঙ্গে। এখন আমাদের দেশে যখন কোনও কোটিপতিই নেই তখন ওইরকম অভিনেত্রীর জীবনযাপনের প্রতি ঝোঁক থাকাটা অস্বাভাবিক। কিংবা কোনও অভিজাতমণ্ডলীর মানুষের প্রতি ঝোঁক থাকাটাও সুস্থতার লক্ষণ নয়। এই সমস্ত মানুষ বড় বেশি অহঙ্কারী হয়ে থাকে। তারা তাদের জীবনযাত্রায় অহঙ্কারের বশে প্রত্যেকটি লোককে দুঃখ দিয়ে থাকে। সে প্রতারণা করে, মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, তারা নিজের অহঙ্কার লুকোবার চেষ্টাও করে না। তারা বলে, মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। কোনও মাথাব্যথাও নেই। তার মানে সমাজের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা নেই। শুধু নিজেকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত তাঁরা। এইসব দেখেশুনে একটা সিদ্ধান্তে অন্তত পৌঁছন যায় যে, — 'সমাজ যার দ্বারা উপকৃত হয় না এমন মানুষ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ অন্যদের সে হেয় জ্ঞান করে।' সম্প্রতি আমাদের ক্লাসে যে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে সেটাও এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং এটা খুবই পরিষ্কার যে প্রত্যেকেই যদি ওইসব মানুষদের নকল করতে থাকে, শুধু নিজেদের কথাই ভাবতে থাকে, তাহলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের টুঁটি টিপে ধরবে আর ধ্বংস হয়ে যাবে।

মিখাইল পলিয়াকোভ

এটি ছাড়াও অনেক ছোট ছোট বক্তব্য যেমন :

আসবাবপত্রের ক্ষতি — অনেক ছাত্র ডেস্কের ওপরে ছুরি দিয়ে নকশা কাটতে ভালবাসে। হয়ত ভাবে যে ওর সামনে হয়ত লোভনীয় কোনও খাবার রয়েছে। স্কুলের আসবাবপত্রের ক্ষতি করা বন্ধ করার সময় হয়েছে। যারা এই কাজ করে তারা আশেপাশের ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়েই তোলে।

ভুরগুন

ন্যায়বিচার কোথায় থিয়েটার আর সিনেমা সম্পর্কে জানার জন্য স্কুলে একটা চক্র আছে। সে চক্রের সভাপতি শুরা, আমাদের মধ্যে সেরা অভিনেতা। চক্র তৈরি হয়েছে ছ মাস হয়ে গেল কিন্তু তার প্রথম সভাটাই বসেনি। তাছাড়া সিনেমা আর থিয়েটারের একটা ফ্রি পাশ রয়েছে শুরার। সে নিজে নিয়মিত যায় কিন্তু আর কাউকে পাশটা ব্যবহার করতে দেয় না। এর মধ্যে ন্যয়বিচারটা কোথায়?

দর্শক

টিফিনের ঘন্টায় — কিছু কিছু ছাত্র টিফিনের সময়ে ক্লাসরুমে বসে থাকার চেষ্টা করে। এইভাবে তারা ক্লাসরুমে হাওয়া চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছে। অন্যায়ভাবে অক্সিজেন নষ্ট করছে। এমনিতেই তো অক্সিজেনের সরবরাহ কম। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। যদি কারও টুকলি করার ইচ্ছে থাকে তাহলে সে বারান্দায় গিয়ে করুক।

বিচ্ছু

ঠাট্টা করে নাম দেওয়া — ক্লাসের ছেলেরা অনেক সময়ে ঠাট্টা করে একজন আরেকজনকে কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এক একটা নাম দেয়। সাবেকি এই প্রথা বন্ধ করা দরকার। কারণ এরকম নাম দিয়ে লোকের মর্যাদাহানি হয়, পশুদের স্তরে নামানো হয়।

এলদায়ভ

স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী 'সংগ্রামী পত্র' অতি উৎসাহ নিয়ে পড়ল। নাম না লিখলেও সবাই বুঝল যে য়ুরা আর লিওলিয়াকে বোঝানো হয়েছে। লেখাটা পড়বার সময় য়ুরা নাক সিঁটকেছিল। কয়েকদিন পরে দেখা গেল দেয়াল পত্রিকার পাশে আর একটা লেখা। তাতে বলা হয়েছে —

অহঙ্কারী কে?

[কবরের তলা থেকে একটি চিঠি]

মহোদয়গণ

কবরের তলা থেকে অভিজাত একজন উঠে চিঠি লিখছি। সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র মিশা আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। কবর থেকে দু সপ্তাহ ক্লাসঘরে আমার আত্মা উপস্থিত ছিল। মিশা অভিযোগ করেছে যে আমি আত্মসর্বস্ব। ধরে

নেওয়া যাক যে ওর কথাটা সত্যি। কিন্তু মিশার নিজের বেলা? রোজ ও অনেক রাত অবধি বই মুখে বসে থাকে যাতে ক্লাসে প্রথম হতে পারে। কেন? এটা দেখাবার জন্য যে ক্লাসের অন্য ছাত্রদের চাইতে সে ভাল আর বেশি বুদ্ধিমান। আর ঠিক সেইজন্যই ও স্কুলের অন্যান্য কাজও নিয়েছে। সে উপদলের নেতা, মনিটর, স্কুল কমিটির সদস্য আর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এখন প্রশ্ন হল, আমাদের মধ্যে কে বেশি অহঙ্কারী?

অভিজাত একজন

লেখাটা পড়ে ক্ষেপে গেল মিশা। এক বিন্দুও সত্য নেই কথাটায়। বই মুখে রাত জেগে থাকে না কোনওদিনই। আর যদি খেটেখুটে পড়াশুনা করে আর ভাল ছাত্র হয়েই থাকে সেটা কি অহঙ্কারের পরিচয় হয় নাকি? প্রত্যেকেই জানে পড়াশুনা ভাল করে করতে হয়। য়ুরাও খারাপ ছাত্র নয়। তফাৎ শুধু ও যখনই ভাল রেজাল্ট করে তখনই ওর বাবা ওকে উৎসাহ দেবার জন্য এটা ওটা কিনে দেন। তাছাড়া মিশা যদি সকলের ভোটে মনিটর, স্কুল কমিটির সদস্য হয়ে যায় সেটা কি ওর দোষ?

গেঙ্কা বলল, 'দেখলি তো য়ুরার কাণ্ড! আমি তোকে অনেকদিন বলেছি ওকে আচ্ছা মতন শিক্ষা দিতে যাতে কোনওদিন না ভোলে।'

স্লাভা আপত্তি করে, 'ঘুঁষি মেরে কিছু প্রমাণ করা যায় না। ''সংগ্রামী পত্রে''র আগামী সংখ্যায় এই কবরের চিঠির একখানা জবাব দিতে হবে।'

মিশা বলল, 'ও যে আমার সম্পর্কে লিখেছে তেমন কথা নয়। প্রশ্নটা হল নীতির। অহঙ্কার বলতে কী বোঝায়। য়ুরা মূল প্রশ্নটাকেই গুলিয়ে দিতে চাইছে। আমাদের কাজ হল সেটাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরা।'

ছেলেরা 'সংগ্রামী পত্র'-এর আগামী সংখ্যা নিয়ে জোরদার ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

৫৯.

ফৌজের বন্দুক মিস্ত্রি

দিন কয়েক বাদে মিশা, গেঙ্কা আর স্লাভার ডাক পড়ল হেডস্যারের ঘরে। হেডস্যারের পাশে বসে ওভারকোট আর ফৌজি টুপি পড়া একজন কাগজ পড়ছিলেন। ছেলেরা ভেতরে ঢুকতেই তিনি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ওদের তিনজনকেই। হেডস্যার বললেন, 'বোস তোমরা। তা অভিজাত একজনের কবর থেকে লেখা চিঠি কেমন লাগল?'

মিশা বলল, 'কিন্তু ওর সব কথা সত্যি নয়।'

—'কোনটা সত্যি নয়?'

—'আমি রাত জেগে বই পড়ি না। তাছাড়া অহঙ্কার বলতে ওসব বোঝায় না।'

—'কীসব বোঝায়।'

—'ও জিনিস নয়।'

—'ঠিকই বলেছ। সেটাকেই আত্মসর্বস্ব বলা যায় যখন কেউ সমাজের প্রয়োজনের ওপরে নিজের প্রয়োজন, নিজের স্বার্থকে স্থান দেয়। তাই ভাল ছাত্র হলেই তাকে অহঙ্কারী বলা যায় না। ভাল ছাত্র হয়েই সে সমাজের সেবা করছে। আর সমাজের বোঝা হল ওই অলস ছাত্ররা। এই কথাই তুমি বলতে চাইছ তো?'

—'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

—'ভাল,' তারপর একটু থেকে বললেন, 'ছোরাটা সঙ্গে এনেছ নাকি।'

ঠিক কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে মিশা হেডস্যারের দিকে দেখে উর্দি পরা লোকটির দিকে তাকায়। হেডস্যার ওর অস্বস্তি বুঝতে পেরে বললেন, 'ওনার সামনে সব কথা খুলে বলতে পার।'

মিশা ছোরাটা আর অন্য জিনিসগুলো সব বের করে দিল পকেট থেকে।

উর্দিপরা লোকটি খুব যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে সংকেতলিপির পাতাগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর ছোরাটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। হেডস্যার ওদের উৎসাহে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'বল না তোমরা, আমরা শোনার জন্য তৈরি হয়ে আছি।'

মিশা বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে একটু কেশে বলতে শুরু করল, 'আমরা জানতে পেরেছি যে এই ছোরাটা ছিল সম্রাজ্ঞী আন্না ইওআন্নভ্নার রাজত্বের সময় এক ফৌজি বন্দুক মিস্ত্রির। তার মানে আঠারো শতকের প্রথম দিকে।'

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললেন হেডস্যার। ফৌজি লোকটাও অবাক হয়ে গেছেন খুবই মনে হল।

—'কী করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তোমরা?' হেডস্যার জিজ্ঞাসা করেন।

—'বেশি বেগ পেতে হয়নি।' ছোরাটা টেনে খাপ থেকে ফলা টেনে বের করল মিশা। —'প্রথম কথা হল চিহ্নগুলো। তিনটি চিহ্ন আছে — নেকড়ে বাঘ, কাঁকড়াবিছা আর পদ্মফুল। এই দেখুন।'

হেডস্যার উৎসাহ দেন, 'হ্যাঁ, বলে যাও।'

মিশা বলতে থাকে, 'জার্মানির সলিংগেন ইস্পাতমিস্ত্রিদের মার্কা ছিল নেকড়ে বাঘ। এই ছোরার ফলাগুলোকেই তাই বলা হত 'নেকড়ে বাঘ'। ষোলো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তৈরি হত সেগুলো।'

—'ঠিক কথা। অস্ত্রশস্ত্রের এরকম মার্কা আছে বটে। খুবই বিখ্যাত মার্কা সন্দেহ নেই।' বললেন হেডস্যার।

মিশা এবার একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'জুলিয়েন দেলরেই নামে টোলেডার একজন তলোয়ার মিস্ত্রিও তার ছোরা, তলোয়ারের ফলায় নেকড়ে বাঘ কিংবা কুকুরের ছবি খোদাই করত।'

গেঙ্কা মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটে, 'মুর থেকে খ্রিস্টান হয়েছিল লোকটা।'

—'পনেরো শতাব্দীর শেষের দিকের লোক এই জুলিয়েন দেলরেই। এবারে 'কাঁকড়াবিছা' — মিলানের তলোয়ার কারিগররা এই মার্কা ব্যবহার করত। তারপর পদ্মফুল — ফ্লোরেন্সের এক তলোয়ার মিস্ত্রির চিহ্ন এটা।'

গেঙ্কা বলল, 'তার নাম পারাজিনি।'

—'হ্যাঁ, পারাজিনি। ষোলো শতাব্দীর শুরুর দিকের লোক ছিল সে। এই হল চিহ্নগুলোর অর্থ।' ওদের দিকে সগর্বে তাকিয়ে বক্তব্য শেষ করে মিশা।

হেডস্যার প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু এই ছোরাটা এদের মধ্যে কে তৈরি করেছিল?'

—'এদের কেউ নয়।' জোরগলায় উত্তর দেয় মিশা।

—'কেন? একথা মনে হল কেন তোমার?'

—'তার কারণ যতগুলি বই আমরা পড়লাম সেগুলোর প্রত্যেকটাতেই বলা আছে নাবিক ছোরার আবির্ভাব হয়েছিল ষোলো শতাব্দীর শেষের দিকে। অথচ এই মার্কাগুলো সবই ষোলো শতাব্দীর শুরুর দিকের।'

হেডস্যার আর ওই ফৌজি লোকটা পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করে একটু হাসলেন।

—'একথা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহলে মার্কাগুলোর অর্থ কী দাঁড়াল?' হেডস্যার প্রশ্ন করেন।

মিশার চটপট উত্তর —'সে আমরা বলতে পারছি না।'

উর্দিপরা লোকটা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ছেলেরা ঠিক কথাই বলেছে।' তারপর মিশার হাত থেকে ছোরাটা নিয়ে আলোর দিকে উঁচু করে ধরলেন। ফলাটার আগাগোড়া একটা নকশা আছে, লতানো গোলাপ ফুল দিয়ে ঢেউ খেলানো নকশা। মিশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই জিনিসটা কি জান?'

—'না।'

—'এটা হল দামাস্কাস ইস্পাতের ছোরা। কেবল প্রাচ্য দেশেই এগুলো তৈরি হত। এর অর্থই হল ফলাটার সঙ্গে ইউরোপীয় তলোয়ার কারিগরদের কোনও সম্পর্কই নেই। বোঝাই যাচ্ছে যে এই ছোরাটা যার হাতে তৈরি তার ইচ্ছে ছিল সবচেয়ে সেরা জাতের ইস্পাতের চাইতেও তার ইস্পাত যে ভাল সেটাই বোঝান। সম্ভবত সেই জন্যই সে তিনটি চিহ্ন এঁকেছিল। ঠিক আছে, তারপর বলে যাও।'

মিশা একটু ইতস্তত করে। ও নিজে একটু বোকা বনে গেছে। কারণ এতদিন ধরে মাথা ঘামিয়ে ওরা যেটা বের করতে পেরেছে, এই মানুষটা তা একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই ধরে ফেলতে পেরেছেন।

ভদ্রলোক মিশাকে উৎসাহ দেন, 'আরে, ইতস্তত করছ কেন? বল না, তারপর।'

মিশা বলতে থাকে, 'তারপর আমরা ঠিক করলাম রুশ দেশে কী ধরনের ছোরা আগে ব্যবহার করা হত সেটা বের করব। দেখা গেল তিন রকমের ছোরা ছিল, তিন ধরনের। প্রথমটা হল জাহাজী ছোরা, সেগুলোর থাকত চারদিকে ধার, কিন্তু আমাদের ছুরিটার ধার তিনদিকে। তাই মিলল না। দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীর ছোরা পৌনে তেইশ ইঞ্চি লম্বা, অথচ আমাদেরটা চোদ্দো ইঞ্চি, সেটাও মিলল না। আর তৃতীয় ধরনের ছোরা তৈরি হত রানি আন্নার আমলে, ফৌজি বন্দুক মিস্ত্রিরা বানাত। চোদ্দো ইঞ্চি লম্বা হত ছোরাগুলো, যেমন আমাদের ছোরাটা। সেগুলোর তিনদিকে ধার থাকত, আমাদেরটাতেও তাই আছে। আর অন্যসব চিহ্নও মিলে যাচ্ছে। আমরা তাই ধরে নিলাম যে এই ছোরাটা একসময়ে রানি আন্নার আমলের কোনও বন্দুক মিস্ত্রির সম্পত্তি ছিল।' একটানা বলে মিশা একটু থামল। তারপর সোফায় গিয়ে গেঙ্কা আর স্লাভার পাশে বসল। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল ওঁরা দুজনে কী বলেন।

হেডস্যার উর্দিপরা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ছেলেদের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমার মত কী।'

উনি উত্তর দিলেন, 'কথাটা তো ঠিকই। খুবই বুদ্ধিমানের মতন সিদ্ধান্ত। ঠিক আছে ছোরার মালিককে আমরা খুঁজে বের করব।'

টেবিল থেকে চারকোণা একটা বড় বই তুলে নিলেন হেডস্যার। মিশা পড়ল, মোটা মোটা অক্ষরে মলাটে বইটির নাম লেখা রয়েছে —'১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের নৌ পঞ্জী'। হেডস্যার বইটা দেখতে দেখতে বলতে থাকেন, 'রানি মারিয়া জাহাজে যে বিস্ফোরণ তাতে ভ্লাদিমির নামের তিনজন অফিসার মারা যান। ইভানভ — একজন জুনিয়ার অফিসার; তেরেন্তিয়েভ — দ্বিতীয় ক্যাপটেন আর নেউস্ত্রয়েভ — লেফটেন্যান্ট। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে ছোরার মালিক এদের তিনজনের মধ্যে কোনজন?' আবার কয়েক পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি বলতে থাকেন —'ইভানভ — যুবক, অমুক তমুক; নেউস্ত্রয়েভ — ভাল অফিসার ...' পড়তে পড়তে থেমে যান হেডস্যার। তারপর আবার পড়েন, ধীরে ধীরে —'রুশ নৌবহরের বিখ্যাত অফিসার ভ. ভ. তেরেন্তিয়েভের শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে'। স্মরণীয় যে তিনি প. ন. পদভলোৎস্কির শিক্ষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অসাধারণ দক্ষতার ফলে তিনিও তার পূর্বপুরুষ অস্ত্র বিশেষজ্ঞ প. ই. তেরেন্তিয়েভ-এর মতন নৌবহরের অস্ত্র সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করার সবরকমের সুযোগ পেয়েছিলেন।'

উর্দিপরা লোকটি বললেন, 'এবারে মনে হচ্ছে কিছু ক্লু পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনার কাছে সামরিক এনসাইক্লোপেডিয়া আছে?'

—'হ্যাঁ, শোন গেঙ্কা তুমি লাইব্রেরিতে গিয়ে সামরিক এনসাইক্লোপেডিয়া 'ত' খণ্ডটি নিয়ে এসো তো সোফিয়ার কাছ থেকে, আমার নাম করে।'

বইটা আনা হলে হেডস্যার আবার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় এসে থামলেন। তারপর পড়তে থাকেন, —'তেরেন্তিয়েভ পলিকার্প ইভানভিচ —১৭০১-১৭৮৪। আন্না ও এলিজাভেতার আমলের বিখ্যাত বন্দুক মিস্ত্রী। ফিল্ড মার্সাল মিনিখের অধীনে কাজ করতেন। অচাকভ স্তাভুচানি ও খতিনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনিই প্রথম ডুবুরি সরঞ্জামের নকশা তৈরি করেন। সমুদ্রের তলা থেকে একটা জাহাজ উদ্ধার করার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা তার সময়ে আজগুবি বলে মনে করা হয়েছিল।'

উর্দিপরা লোকটা বেশ খুশিভরা গলায় বললেন, —'দেখলে তো ছেলেরা, তোমাদের বন্দুক মিস্ত্রী কত কাজে লাগল। আর একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে সেটা হল আরেকজন তেরেন্তিয়েভ ছিলেন যিনি প্রায় আশি বছর পরে আর একটা জাহাজ উদ্ধারের পরিকল্পনা করেছিলেন।'

হেডস্যার বলেন, 'আমারও আর একটা কথা মনে পড়ল। নৌ আকাদেমির অধ্যাপক পদভলোৎস্কি, যার নাম একটু আগেই পাওয়া গেল, তিনি হলেন আমাদেরই এক ছাত্রীর দাদামশাই।'

ছেলেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়, তার মানে লিওলিয়া। উর্দিপরা লোকটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমরা তো ভাই যথেষ্ট খেটেছ। আপাতত না হয় ছোরাটা আমার কাছেই থাক। ঘাবড়িও না, আমাদের কাজ শেষ হলেই তোমাকে ওটা ফেরৎ দিয়ে দেব আমরা। আর কিছু কি বলবে?'

মিশা বলল, 'না, আমরা শুধু ছোরাটার রহস্য উদ্ধার করতে চাই।'

—'ঠিক আছে। তোমাদের আমি সাহায্য করব। শুধু মনে রেখ, তোমাদের এই ব্যাপারে অনুসন্ধান যেন লাইব্রেরি ঘরের বাইরে না যায়। অন্যসব বিষয় নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোমাদের যা করার ছিল করেছ। এবারে আমরা নিশ্চয় হাত মেলাতে পারি কি বল? আমার নাম সভিরিদভ।' মিশা ওঁনার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে লক্ষ্য করে যে ওর হাতগুলি পলেভয়ের মতনই বিশাল, চওড়া, প্রকাণ্ড।

৬০.

ড্রইং ক্লাসে

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গেঙ্কা ফেটে পড়ে, 'এই এলেন একজন। আমরা ছোরাটা পেলাম, খাটলাম খুটলাম, খোঁজ খবর করলাম, লাইব্রেরিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা সব খুঁজে বের করলাম, বলতে গেলে জান লড়িয়ে দিলাম। এখন যখন শুধু হাত বাড়িয়ে গুপ্তধনটা তুলে নেওয়ার কাজটা বাকি, তখন উনি এসে নিয়ে গেলেন ছোরাটা। চমৎকার!'

স্নাভা বলল, ‘ঠিকই করেছে মিশা। সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারত।’

গেঙ্কা তবু গাঁইগুঁই করে, ‘আরে এতদিন তো কিছু ভণ্ডুল করিনি আমরা।’

মিশা বলল, ‘ভদ্রলোককে বাধা দেওয়া উচিৎ হবে না ঠিকই। কিন্তু আমরাই বা থেমে থাকি কেন। আমরাও তো তেরেন্তিয়েভ সম্পর্কে খোঁজখবর করতে পারি। তাতে তো কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।’

ওরা ক্লাসঘরে ফিরে এল। তখন ড্রইংয়ের ক্লাস চলছে। এই ক্লাসটা খুব মজার। যেখানে খুশি বস, যখন তখন চলাফেরা করতে পার। চুপ করে বসে থাকতে পার। মিশা একটা আসন নিয়ে বসল লিওলিয়ার পাশে। বসে জিজ্ঞাসা করল, ‘একটা কথা জিজ্ঞাসা করব লিওলিয়া?’

মডেলের সঙ্গে নিজের আঁকাটা মেলাতে মেলাতে লিওলিয়া জিজ্ঞাসা করে, —‘কী।’

—‘আচ্ছা, নৌ আকাদেমির অধ্যাপক অ্যাডমিরাল পদভলোৎস্কি কি তোমার দাদামশাই?’

—‘হ্যাঁ, কেন?’ খুব অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে লিওলিয়া।

—‘না মানে। ওই নৌ আকাদেমিতে পড়ত আমার এক আত্মীয়। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তার কোনও খোঁজ খবর যদি পাওয়া যেত, সেই জন্যই আর কী।’

—‘কিন্তু দাদামশাই তো মারা গেছেন অনেক কাল আগে।’

—‘তা জানি, তবে তার কোনও নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ বেঁচে আছেন কিনা।’

—‘হ্যাঁ, দিদিমা আর সোনিয়া মাসি বেঁচে আছেন।’

—‘ওরা কেউ তাঁর ছাত্রদের খবর রাখতেন কি না জান?’

—‘মনে হয় না। ক্লাসে পড়ানোর সময় দিদ্দিমাকে নিশ্চয়ই তাঁর দরকার হত না।’

পেছন থেকে য়ুরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে, ‘কী গোপন কথা হচ্ছে তোমাদের?’

লিওলিয়া লাল হয়ে ওঠে, বলে, ‘না, মিশা দাদামশাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিল।’

মুখ বেঁকিয়ে সরে যায় য়ুরা।

মিশা উঠে এল স্নাভার কাছে। ফিসফিস করে বলল, ‘দাদামশাই বেঁচে নেই, তবে দিদিমা আর এক মাসি বেঁচে আছেন।’

—‘তুই লিওলিয়াকে বল না, ওদের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেবে।’

—‘দুর, মেয়েদের দিয়ে যদি কিছু হয়। আর ওই য়ুরাটাই আসতে ভ্যান ভ্যান করে সব কথা বলে দিল লিওলিয়া ওকে।’

৬১.

দিদিমা আর সোনিয়া মাসি

মিশা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত লিওলিয়ার কাছ থেকে ওর দিদিমা আর মাসির ঠিকানা জোগাড় করতে পারল। আর দেরি না করে পরের দিন সন্ধ্যাবেলাতে তিনজন রওয়ানা দিল সেই ঠিকানার উদ্দেশ্যে। বেশ মজাই হল। রাস্তায় যতগুলো পেছল জায়গা পড়ল সবকটাতেই স্লিপ কেটে কেটে চলল। দূরে দূরে এক একটা বাতি। সেই সব বাতির ম্লান আলোয় তুষারের একটা নিথর আস্তরণ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। সরকারি খাদ্য বিভাগের সাদা নীল ডোরাওয়ালা বাড়িটার ওপরে একটা বিজ্ঞাপন টাঙানো রয়েছে। বিজ্ঞাপনের চারধারে সাজানো বিজলি বাতিগুলো পিটপিট করে জ্বলছে নিবছে, অক্ষরগুলোও তাই জ্বলজ্বল করছে —'আপনার রুচি অনুযায়ী আমরা মিষ্টান্ন করে থাকি'।

ইদানিং গেঙ্কার অভ্যাস হয়েছে স্কেটিং করা। পায়ের স্কেট জুতোয় একজোড়া স্কেট দড়ি বেঁধে তাতে কাঠি গুঁজে আঁট করে রাখে। পুরনো ওভার কোটের বোতাম ওর সব সময়েই খোলা। টুপির কান দুটো দু কাঁধের ওপর ঝুলে রয়েছে। গেঙ্কার সবতাতেই রাগ। যেতে যেতে ক্রমাগত গজগজ করেই চলেছে, এটার কোনও মানে হয়! শুধু বড় রাস্তায় বালি ছড়াত আগে, এখন তো ছোট ছোট গলিগুলোতেও বালি ছড়াচ্ছে। একটা লোক যদি একটু স্কেটিং করে তাতে কার কী ক্ষতি বলত। স্কেটিং করতে হলে শুধু রিন্‌কে করতে হবে, কী আবদার। একজোড়া নরওয়েজিয়ান স্কেট নেই এই যা আমার দুঃখ, থাকলে য়ুরার দেমাক ভেঙে দিতাম আমি।'

চলতে চলতে, খোঁজ খবর নিতে নিতে ওরা একটা কাঠের ছোট বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল। মিশা বলল, 'সকলের একসঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে না রে। তোরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঘুরে আসছি।'

অন্ধকার নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল মিশা। একটা দেশলাই জ্বালল। সিঁড়ি ভর্তি ঠাসা জিনিসপত্র। তার মধ্য দিয়ে একটা দরজা দেখা গেল। আস্তে টোকা দিল মিশা সেই দরজায়। অন্ধকারের মধ্যে পেছন থেকে কে যেন বলল, 'দরজায় লাথি মার। ওখানে যারা থাকে তারা কানে শুনতে পায় না।' লোকটার কথা মত দুমদাম লাথি মারল মিশা দরজায়। এবারে কাজ হল। ভেতর থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, —'কে ওখানে?'

—'পদভলোৎস্কিদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি', চিৎকার করে বলল মিশা।

—'কে তুমি?'

—'আমি লিওলিয়ার কাছ থেকে আসছি।'

—'ঠিক আছে, সবুর কর, চাবিটা খুঁজে আনি।'

ভেতরে পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। অধীর অপেক্ষা। মিনিট পাঁচেক পরে আবার কেউ যেন দরজায় এল। অনেকক্ষণ ধরে তালায় চাবি লাগানোর চেষ্টা। অবশেষে একটা সময়ে দরজাটা খুলল। ভদ্রমহিলার পেছন পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকল মিশা। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, ভদ্রমহিলাকেও নয়। শুধু পায়ের শব্দ শুনে অনুসরণ করে চলল মিশা। ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছেন, —'দেখ বাপু পড়ে না যাও, সাবধানে এস।'

মহিলাটি দরজা খুলে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। একটা আবছা আলো, ছোট একটা টেবিলে তাস ছড়ানো রয়েছে। দিদিমা বসে আছেন একটা চেয়ারে। মিশা বুঝল ওকে যিনি ঘরে নিয়ে এলেন তিনি সোনিয়া মাসি।

মিশা নজর তীক্ষ্ণ করে ঘরের চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সব মিলিয়ে ঘরটাকে মনে হবে যেন একটা আসবাবের দোকান, এলোমেলো ছড়িয়ে আছে খাট, আলমারি, টুল, টেবিল, আরামকেদারা, ট্রাঙ্ক, কী নেই! ঘরের এক কোণে উঁকি মারছে গ্র্যান্ড পিয়ানোর একটা ধার। লোহার চুল্লি থেকে একটা নল বেরিয়ে সোজা চলে গেছে জানলার দিকে ঘরের ভেতর দিয়ে। ছাদের সঙ্গে সেটাকে তারে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মেঝেতে আলুর খোসা ছাড়ানো। আর এক কোণে মুড়ো ঝাঁটা পড়ে আছে একটা, বহুদিনের ঝাঁট দিয়ে রাখা জমানো জঞ্জালের স্তূপের ওপর। দরজার কাছটাতে জলের কল। তার নীচে কানায় কানায় ভর্তি একটা বালতি।

তাসের দিকে ফিরে বসে দিদিমা বললেন, —'এস হে খোকা।' দিদিমার বহু পুরনো গাউন মেঝেতে লুটোচ্ছে। বললেন, 'এস, ঘরদোর বড্ড অগোছাল, নোংরা হয়ে আছে কিছু মনে কর না। বাছা, জায়গার বড্ড অভাব। সবাই মিলে একটা ঘরেই বসেছি। জানই তো জ্বালানীর খরচ এখন কত বেশি।'

সোনিয়া মাসি বললেন, 'তুমি জ্বালানীর গল্প শুরু করে দিলে। ছেলেটাকে বসতে বলবে তো!'

—'তুই থাম সোনিয়া, চাবিটা ঠিক জায়গায় রেখেছিস তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

—'আলমারিতে, তুমি আবার সেটাতে হাত দিতে যেও না।'

বুড়ি এবারে মিশাকে বসতে বললেন, 'বোস বাবা, একটু সাবধানে। নিকুচি করেছে ওই চেয়ারগুলোর। মিস্ত্রীটা পয়সা নিল কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করল না। আজকাল সবাই জোচ্চোর হয়ে গেছে। কালকের কথাই ধর না। ড্রেসিং টেবিল কিনবে বলে একজন এল। দাম বললাম এক লাখ, উত্তরে বলল পনেরো রুবল। তারপর আবার হাসতে হাসতে বলল, ওসব লাখটাখের দিন চলে গেছে দিদিমা।' আমি বললাম, 'কী বললে, জান তুমি যখন দশ হাজারী নোট চালু হল

তখন আমি তো এক বছর বিশ্বাসই করতে পারিনি। সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিলাম খাঁটি রুবলের জন্য। আর এখন, মাপ করবেন মশাই, এক লাখ বলেছি, এক লাখই চাই।'

সোনিয়া মাসি ঠায় দাঁড়িয়ে। বললেন, 'মা তোমার গল্প কে শুনতে চাইছে! ও কেন এসেছে বরং জিজ্ঞাসা কর।'

দিদিমা অধৈর্য হয়ে পড়েন। বলেন, 'আঃ, তুই থাম তো সোনিয়া, তুমি আব্রোসিমভদের ওখান থেকে আসছ তো?'

—'না, আমি ...।'

—'তাহলে পভ্‌জ্‌দোরভদের কাছ থেকে ...'

—'না, আমি ...।'

—'তাহলে নিশ্চই জাখ্‌লোপভ্‌দের ওখান থেকে ...'

—'না, আমি এসেছি আপনার নাতনি লিওলিয়ার কাছ থেকে। আপনি কি ভ্লাদিমিরকে চিনতেন, ভ্লাদিমির তেরেন্তিয়েভ, — 'নৌ আকাদেমির অ্যাডমিরাল পদভলোৎস্কির ছাত্র,' একনিশ্বাসে বলে ফেলে মিশা।

৬২.

চিঠিপত্তর

বুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কথা বলছ?'

আবার পরিষ্কার করে কথাগুলো বলে মিশা।

—'না, মনে হয় না, আমি তাকে কখনও দেখেছি।' বলেন দিদিমা। সোনিয়া মাসি বলেন, 'কেন মা, তোমার তো মনে থাকার কথা। নিশ্চয়ই মনে পড়বে। আরে আমাদের সেই বেচারা ভ্লাদেমিরের কথা; ক্সেনিয়ার স্বামী।'

—'ওঃ হো,' বলে হাততালি দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত তুলতেই তাসগুলো সব টেবিলে ঝটকা খেয়ে পড়ে গেল। মিশা সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে ওগুলো তুলে দিতে লাগল। ততক্ষণে দিদিমা বলতে শুরু করেছেন, 'ওঃ, তাই বল ভ্লাদেমির, ক্সেনিয়া। সে এক করুণ ব্যাপার, বুঝলে। হ্যাঁ, চিনি, কিন্তু সে তো খুন হয়ে গিয়েছিল।'

—'আমি জানি দিদিমা। কিন্তু তার কোনও আত্মীয় স্বজনের কথা বলতে পারেন।?'

—'হ্যাঁ, ভ্লাদেমিরকে আমি চিনতাম। ওর বউ ক্সেনিয়া, সে অনেক দিন আগের কথা।'

—'ওর স্ত্রীর নাম আর পদবীটা কী বললেন?'

—'ক্সেনিয়া, সিগিজসুন্দভনা, ভারী সুন্দরী, পটের বিবি যাকে বলে।'

—'আপনি কি তার ভাইকেও চিনতেন?'

—'নিশ্চয়, ভালেরি নিকিংস্কি, চমৎকার অফিসার ছিল। যুদ্ধে সেও মারা গেছে।'

—'ওরা এখন, মানে ওদের পরিবারের লোকজন কোথায় আছেন আপনি জানেন নাকি!'

—'না, আমি জানি না ভাই। ওদের পরিবারটাই ছিল অদ্ভুত। গুপ্তধন আর প্রাচীন সব জিনিসপত্র আরও কী কী ভয়ানক সব আলোচনা করত সব সময়।'

—'ওদের ঠিকানাটা কি পাওয়া যাবে দিদিমা আপনার কাছে?'

—'সেও ঠিক বলতে পারছি না। পিটারসবুর্গে ওরা থাকত, কিন্তু ঠিকানা ভুলে গেছি।'

কথার মাঝখানে হঠাৎ সোনিয়া মাসি বললেন, 'ঠিকানাটা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। বাবার কাছে যেসব চিঠি লিখত তাতে ঠিকানা আছে। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্য থেকে সেটা বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।'

মিশা মরিয়া হয়ে কাকুতি মিনতি করেন, 'দেখুন না একটু চেষ্টা করে। আমার ওটা ভীষণ দরকার। আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিশা বলে, 'আপনাকে আমি সাহায্য করব। শুধু বলুন আমাকে কী করতে হবে।'

দিদিমার বোধহয় মিশার কথা শুনে করুণা হয় বলেন, 'দে না মা সোনিয়া, একটু খুঁজে। যদি কাজে লাগে বেচারার।' বলে আবার তাসে মন দিলেন তিনি। একটু ইতস্তত করে সোনিয়া মাসি মিশাকে দেখিয়ে দিলেন কী করতে হবে। মিশা আলমারি সরাল, দেরাজ ঘাঁটল, পিয়ানোর ওপরে উঠল, বাক্স টেনে বের করল। তারপর অবশেষে বেরোল একটা ঝুড়ি। মেহনত হয়েছে সাংঘাতিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলও পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে মিশার।

ঝুড়িটা থেকে খুঁজে পেতে সোনিয়া মাসি একটা কাগজের প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেটটার ওপরে লেখা — চিঠি, পাঠিয়েছে 'ভ. ভ. তেরেন্তিয়েভ'। ঝুড়িটা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে মিশা টুপিটা মাথায় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, —'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

তাস থেকে মাথা না তুলেই দিদিমা জবাব দেন, —'যখন খুশি এসো ভাই তুমি কেমন।'

পকেটে চিঠির প্যাকেটটা চেপে ধরে মিশা ছুট লাগাল বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। বেশ অনেকক্ষণ ওরা হাপিত্যেশ করে বসে আছে ওরই প্রতীক্ষায়। তারপর একসঙ্গে মিলিত হয়ে সবাই বাড়ির পথে এগোল দ্রুতপায়ে।

ষষ্ঠ পর্ব

পুশকিনের কুটির

৬৩.

স্লাভা

চিঠিগুলো সব এক ধরনের খামে। ওপরে পরিষ্কার করে ঠিকানা লেখা — পিওতর নিকলায়েভিচ পদভলোৎস্কি মান্যবরেষু, রুজেইনি. লেন, মস্কো — প্রেরক : ভ. ভ. তেরেন্তিয়েভ, স. স. ভাসিলিয়েভার নিবাস, ময়কা, সেন্ট পিটার্সবুর্গ।

চিঠিগুলোর বক্তব্যও মোটামুটি একই ধরনের। সন্ত দিবসের অভিনন্দন, নববর্ষের অভিনন্দন, বড়দিনের শুভেচ্ছা। এর মধ্যে একটা পোস্টকার্ডই একটু অন্য রকমের, তারিখ ১২ ডিসেম্বর ১৯১৫। পোস্টকার্ডে লেখা : 'প্রিয় পিওতর

নিকলায়ভিচ। রেলওয়ে স্টেশন থেকে লিখছি। আর আধঘন্টার মধ্যেই ট্রেন ছাড়বে। তাই নিজে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে আসতে পারলাম না। পুশকিনোতে আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। অথচ এদিকে ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিটে যোগ দিতেই হবে। কপালে যা আছে ঘটুক — আপনার বিশ্বস্ত ভ. তেরেন্তিয়েভ'।

গেঙ্কা ফতোয়া জারি করে, 'আমাদের পেত্রোগাদে যেতেই হবে।'

মিশা বলল, 'পুশকিনোর কথাও তো লেখা আছে।'

গেঙ্কা তবু দমে না। বলে, —'আরে যখন আসল ঠিকানাটাই হাতে পাচ্ছি তখন শুধু শুধু মাথাই বা ঘামাতে যাব কেন। আমাদের যেতেই হবে।'

স্লাভা বলল, 'ঠিকানাটা তো আট বছরের পুরনো। হয়তো দেখা যাবে ওই ঠিকানায় এখন ওদের কেউ থাকেই না।'

মিশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। বলে, 'তাহলে আগে ঠিকানা বিভাগকেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া যাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ওরা একটা চিঠি লিখে ফেলল। কিন্তু স্ট্যাম্প নেই। ঠিক হল আগামী কাল সকালে ওরা চিঠিটা পোস্ট করে দেবে। স্লাভাদের বাড়িতে ওরা বসেছিল। স্লাভার মা থিয়েটারে গেছেন। বাবাও কারখানা থেকে ফেরেননি। গেঙ্কা চিঠিটার দিকে তাকায় আর মুচকি মুচকি হাসে। বলে, 'এখন শেষ তুরুপের তাস আমাদের হাতে। এখন বলতে গেলে গুপ্তধন আমাদের হাতের মধ্যে এসেই গেছে।'

স্লাভা হাসে, বলে, 'তুই গেঙ্কা, এখনও গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখছিস।'

—'দেখব না কেন রে। আমি সব বুঝতে পেরেছি। সেই সময়ে সবাই ভয়ঙ্কর ধরনের ভয়ে টাকা পয়সা সব লুকিয়ে রাখত।'

মিশা উসকে দেয় গেঙ্কাকে, 'আর কী কী বুঝেছিস, বল তো।'

একটুও না দমে গেঙ্কা বলে, 'হ্যাঁ, আর জানতে পেরেছি যে গুপ্তধন যে পায় তার প্রাপ্য সম্পত্তির সিকি ভাগ। তার মানে আমাদের ভাগ এখনই বুঝে নিতে হবে, নয়তো আদায় করতে বছর কেটে যাবে।' বেশ ব্যবসাদারি চালে কথাগুলো বলে গেঙ্কা।

গেঙ্কার কথা শুনে বন্ধুরা হেসে ওঠে।

স্লাভা বলে, 'আমি অবশ্য বাবা, গুপ্তধন টনে বিশ্বাস করি না। তবে ধর যদি সত্যিই তেমন কোনও সন্ধান পাই আমরা, সম্পত্তির একটা অংশ আমাদের প্রাপ্য হবে। তখন সেটা দিয়ে আমরা কী করব?

—'কী, কী বললি, সেটা দিয়ে আমরা কী করব? আরে সেটা তো আমি কবেই ঠিক করে রেখেছি। একটা অনাথ শিশুসদন বানানোর জন্য খরচ করব টাকাটা। একটা গোটা অনাথ শিশুসদন বুঝলি। সব খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের খবর ছাপবে।' গেঙ্কা চিৎকার করে বলতে থাকে।

মিশা বলে, 'শুধু খবরের কাগজ কেন। দরজার ঠিক ওপরেই লেখা থাকবে — গেন্নাদি পেত্রভ শিশুসদন।'

স্লাভা ভাবতে ভাবতে বলল, 'যদি সত্যিই গুপ্তধন পাই তাহলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্বাস্থ্য নিবাস বানানোর জন্য টাকা দেব। কৃষ্ণসাগরের ধারে হবে সেই সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাস।'

—'আজ্ঞে না, ধন্যবাদ।' গেন্কা আপত্তি জানায়, 'তুই তোর অংশ নিয়ে যা খুশি করিস। আমি আমার মতন খরচ করব! স্বাস্থ্যাবাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সব মেয়েলি ব্যাপার। বরং উচিৎ মস্কোর ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড স্টেডিয়াম বানানো। ঘেরা মাঠ থাকবে, ফুটবলের ময়দান, টেনিস কোর্ট থাকবে আর থাকবে স্কেটিং-এর জায়গা। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোনও টিকিট লাগবে না।'

মিশা ঠাট্টা করে বলে, 'সব ভাগ বাটোয়ারা করে ফেললি। কিছু ভুলে যাস নি তো?'

হেসে স্লাভা বলে, 'দেখ মিশা, সবটাই তামাশা করে বলছি। কিন্তু কথার কথা, ধর যদি সত্যি সত্যিই গুপ্তধন পেয়ে যাস তাহলে সেটা দিয়ে তুই কী করবি বল তো?'

মিশা জবাব দিল, 'তা তো জানি না, আগে তো কখনও ভাবিনি। তবে আমার বিশ্বাস হয় না কোনও গুপ্তধন আছে সেখানে।'

গেন্কা বলে, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস-হয়। দেখবি স্টেডিয়ামটা আমরা তৈরি করবই। তবে স্বাস্থ্যাবাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র — ওসব স্লাভার কল্পনা। হয়তো তুইও একটা গান বাজনার স্কুল খোলার কথাও ভেবেছিস, তাই না?'

স্লাভা ক্ষুণ্ণ হল একটু। বলল, 'কেন তাতে দোষ কি হয়েছে শুনি? তুই কি মনে করিস গান বাজনার স্কুল করার চাইতে স্টেডিয়াম করাটা বেশি জরুরি?'

—'হুঃ, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করিস! কোথায় স্টেডিয়াম আর কোথায় গান বাজনার স্কুল। দেখ স্লাভা, তোর কিন্তু ভবিষ্যতের ব্যাপারে আরও ভালভাবে চিন্তা করা উচিৎ।'

—'কেন?'

—'কেন তুই জানিস না? তুই তো সঙ্গীতজ্ঞ হবি ভেবেছিস। তাই না?'

—'হ্যাঁ তা ভাবতেই বা দোষটা কিসের?'

—'দেখতে পাচ্ছিস না? কমসমোলদের কর্তব্য কী শুনলি। কোলিয়া কী বলল! বলল যে কমসমোলদের কাজ কমিউনিজম গড়ে তোলা। ঠিক কি না বল?'

—'হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস। কিন্তু তার সঙ্গে গানবাজনার কী সম্পর্ক।'

—'তুই একটা আস্ত গাধা। সবাই সমাজ গড়ে তোলার কাজ করবে। আর তুই বসে বসে পিয়ানোর চাবি টিপবি তা চলবে না।'

—'তুই যে কী গড়বি সে তো দেখতেই পাচ্ছি। চমৎকার মিস্ত্রি হবি তুই।' ভীষণ রেগে যায় স্লাভা।

স্ফূর্তির সঙ্গে গেঙ্কা বলে, 'নিশ্চয়ই। সাত-সালা স্কুল শেষ করে আমি একটা কারখানা স্কুলে ঢুকব। ধাতু মিস্ত্রি হব। একেবারে খাঁটি মজুর। শিক্ষানবিশের আর দরকার হবে না। এমনিতেই কমসমোলে নিয়ে যাবে। মিশার সঙ্গে অনেকদিন আগেই আমার এসব নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে তাই না রে মিশা।'

মিশা ইতস্তত করে। ইয়ং পাইওনিয়রদের সভায় কোলিয়ার বক্তৃতা তার মনে দাগ কেটেছিল। বক্তৃতার একটা কথা নিয়ে খুব ভেবেছে। কথাটা হল : এখন যাদের বয়স পনেরো তারাই ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজ দেখতে পাবে। তারাই নিজের হাতে গড়ে তুলবে এই সমাজ। তাই তাদের জানা উচিত যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হল এই সমাজ গড়ে তোলা।' লেনিনের বক্তৃতা থেকে কথাগুলো পড়ে শুনিয়েছিল কোলিয়া। কিন্তু ওকে গভীরভাবে ভাবতে হয়েছে কথাগুলো নিয়ে। পলেভয় ঠিক এই কথাই ওকে একদিন বলেছিল — যদি সব মানুষের জন্য বাঁচো, সে হবে প্রকাণ্ড জাহাজে পাল খাটিয়ে পাড়ি দেবার মত।' শুধু নিজের জন্য নয়। সকলের জন্য বাঁচাই হল কমিউনিজম গড়ে তোলার প্রকৃত অর্থ। কিন্তু তাহলে স্লাভার কী হবে! স্লাভা কি শুধু নিজের জন্যই গান রচনা করে কাটাবে? সাধারণ মানুষের কি গান বাজনার কোনও প্রয়োজন নেই? তাহলে 'আন্তর্জাতিক' গানটা কেন। স্লাভাব দিকে তাকাল মিশা। বলল,'ঘাবড়াস না স্লাভা। কমসমোলে তোকে ওরা নিশ্চয় নেবে।'

৬৪.

স্লাভার বাবা

হলঘরের দরজায় কাঁচ করে শব্দ হল। ছেলেরা শুনতে পেল হলঘরে কে যেন কোট আর গালোশ খুলছে। স্লাভা বলল,'ওই বাবা এলেন।'

এমনিতেই স্লাভার বাবার মুখচোখ লাল। ঠাণ্ডায় এখন একেবারে সিঁদুরে রঙ হয়ে গেছে। আর মুখে সবসময়ই সেই মিষ্টি হাসিটুকু লেগেই রয়েছে। ওদের দেখেই স্বাগত জানালেন। বললেন,'ইয়ং পাইওনিয়ররা যে, নমস্কার!' হাত মেলালেন সকলের সঙ্গে। আর স্লাভার সঙ্গে করমর্দনের সময় বললেন, সকাল থেকেই সারাদিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি একেবারে। বুঝলে না।' বাড়ির কাজের মেয়ে দাশাও বাবার পেছন পেছন চলে এসেছিল। সে টেবিল সাজাতে লাগল। স্লাভার বাবা একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ রগড়ে মুছে তোয়ালেটা একটা চেয়ারের পিছনে রেখে চেয়ারে এসে বসলেন। স্লাভা সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালেটা শোবার ঘরে রেখে ফিরে এল খাবার ঘরে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর পাইওনিয়ররা, কী নিয়ে আলাপ হচ্ছিল তোমাদের?' বলেই টেবিলের উপরে রাখা খামটা দেখে হাতে নিলেন। পড়লেন — ঠিকানা বিভাগ,. পেত্রোগাদ। কার খোঁজ করছ হে তোমরা?'

স্লাভা তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিয়ে পকেটে রাখল। বাবা রুটি চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ও বাবা, গোপনীয় ব্যাপার দেখছি। সে যাকগে। কী নিয়ে আলোচনা চলছে তোমাদের?'

স্লাভা বলল, 'নানান ধরনের পেশা নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের — এই কে কী হবে, তাই নিয়ে।'

—'হুম। তা কে কী হতে যাচ্ছ বল তো।'

—'ঠিক বলা যাচ্ছে না, এই কথা হচ্ছিল মাত্র।'

—'সে যাই হোক। শেষ অব্দি কে কী ঠিক করলে।'

—'আমি হব সঙ্গীতজ্ঞ, আর ওরা, সে ওরা নিজেরাই বলুক। তবে গেঙ্কা বলে সঙ্গীতজ্ঞরা নাকি কমসমোলের সভ্য হতে পারে না।' স্লাভা বলে।

—'না, তা মোটেই বলিনি' — গেঙ্কা প্রতিবাদ করে।

—'নিশ্চয় বলেছিস, মিশাও শুনেছে।'

—'তাহলে আমার কথাই বুঝিসনি তোরা। আমি বলেছি গান বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু পেশা থাকা চাই, যাতে কাজ হয়।'

স্লাভার বাবা তারিফ করেন গেঙ্কাকে, বলেন, 'ঠিক বলেছ গেঙ্কা। সাবাশ ছেলে! ঠিক এই কথাটা নিয়েই স্লাভার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। পেশা একটা চাই। জীবনে নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। অবসর সময়ে বুলবুলের মতন গলা সাধতে পার।'

স্লাভা গোঁ ধরে থাকে —'না, আমি শুধু সঙ্গীতজ্ঞই হব।'

—'তা হও না কেন। কে বারণ করছে। বারোদিন অতবড় সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজেও কিন্তু ছিলেন একজন রসায়নবিদ। রসায়নবিদের কাজ কেমন মনে হয়?'

—'সে তো ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কথা, বাবা।'

—'নিশ্চয়। রসায়নবিদ না হলেও তোমার চলবে। অন্য যে কোনও পেশা নিতে পার। যাতে সত্যিকারের কাজ হয়।'

স্লাভা তর্ক তোলে —'সঙ্গীত, অভিনয়, ছবি আঁকা, সাধারণভাবে যে কোনও আর্টই কি পেশা নয় বাবা?'

—'হ্যাঁ, পেশা তো বটেই। তবে ওসব হল আকাশবিহার।'

স্লাভা কিন্তু তর্ক ছাড়ে না। বলে, 'কেন আকাশবিহার বলছ? রাশিয়ার খ্যাতির মূলে যারা রয়েছেন তাদের অনেকেরই পেশা ছিল আর্ট। মায়াকোভ্স্কির

মতন কবি, গ্রিনকো-র মতন সঙ্গীত শিল্পী, রোপিনের মতন চিত্র শিল্পী এবং তলস্তয়ের মতন লেখক।'

বাবা উত্তর দিলেন, 'তুমি তো বন্ধু সব বড় বড় লোকদের নাম আউড়ে যাচ্ছ। সবারই তো আর প্রতিভা থাকে না। যাকগে, তুমি মিশা, তুমি কী ভাবছ এই ব্যাপারে বলত?'

মিশা বলল, 'আমি স্লাভার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। ও যদি সঙ্গীতজ্ঞ হতে চায় তাহলে ওর সঙ্গীতজ্ঞ হওয়াই উচিত। সঙ্গীতচর্চা করা উচিত। আপনি বলছেন পেশাদার কাজ কিছু করা দরকার। সেটা করতে হলে একটা ইনস্টিটিউটে যেতে হবে। ধরুন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে গেল। কিন্তু সেখানে ওর মন বসবে না। সেই পাশ করে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব ছেড়ে আবার গান বাজনা নিয়ে বসে যাবে। তার মানে সময় নষ্ট। সরকারের টাকার অপব্যয়। শুধু তাই নয় ও হয়ত এমন একটা চেয়ার দখল করে বসে থাকবে। কাজ করবে না। যে চেযারে অন্য একজন হয়ত খুবই উৎসাহের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে কাজ কবত। আমাদের দেশে এত বেশি ইনস্টিটিউট নেই যে লোক একটা পেশা নেবে তাবপর সেটা ছেড়ে আর একটা ধরবে।'

স্লাভাব বাবা বললেন, 'না হে, তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমি আবার পুবনো কালের লোক কিনা। আমি জিনিসটাকে এইরকম দৃষ্টিতে দেখি — আমার যখন বয়স অল্প তখন আমিও থিয়েটারে অভিনয় করতাম। ভালই অভিনেতা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীও একজন অভিনেত্রী। তরুণ বয়সে একটু অস্থির ভাব থাকেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা একটু আলাদা। একটা সময়ে আমারও চোদ্দো বছর বয়স ছিল। ছেলেবেলার জগৎ ছিল, নিজের খেয়ালখুশি, নিজের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, বই, স্বপ্ন নিয়ে বিভোর থাকতাম। অন্যদিকে আশেপাশের জীবন তার নিজের ধারায় বয়ে যেত। জীবনটা ছিল একটা ঘন বনের মতন। আকর্ষণীয় অথচ একইসঙ্গে ভীতিজনকও। একেবারে একা পড়ে গেলে কীরকমটি হয় ভেবে দেখ। আত্মীয় নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, বাড়িঘর নেই — একেবারে একা। আর মনে আছে, মা আমাকে নিয়ে কেবলই দুশ্চিন্তা করতেন। তিনি ভাবতেন যখন আমি একা পড়ে যাব তখন কীভাবে নিজের রাস্তা করে নেব। কাজটা কঠিন।' একটু থামলেন তিনি। তারপর সবল দুই হাত শূন্যে দুলিয়ে বললেন, 'রাস্তা বানিয়ে নেব। আর সেজন্য আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল। আর ও,' মিশাকে দেখিয়ে বললেন, —'ও কিনা এখনই সরকারি টাকার হিসেব কষছে। বলছে সরকার কেন অযথা টাকা খরচ করবে। আমার যখন এইরকম কম বয়স তখন ভাবতাম —'এই কাজটা তো ভাল, বেশ দুপয়সা আয় করা যায়।' আর মিশা কি না বলছে 'স্লাভা ইনস্টিটিউটে গিয়ে শুধু শুধু একটা জায়গা দখল করে রেখ না। আর কেউ হয়ত তোমার জায়গায়

পড়তে পারত। এই আর কেউটা কে, ওর বন্ধু কেউ, আত্মীয় কেউ, না ধারে কাছের কেউ না। তাকে ও কখনও দেখেনি, চেনেনি, জানার দরকারও নেই। সরকার আর একজন ইঞ্জিনিয়ার পাবে এটাই ওর আসল প্রশ্ন। এটা নিয়েই ওর বিশেষ চিন্তা।'

স্লাভা বাবার টানা কথায় হেসে ফেলে, বলে, 'তোমার কি মনে হয় সেটা ঠিক নয়?'

—'আমি বলছি না সেটা ভুল।' বলে পায়চারী করতে থাকেন স্লাভার বাবা। তারপর গেঙ্কার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে তো, কেমন চমৎকারভাবে আমাদের হারিয়ে দিল।'

—'আমাদের বলছেন কেন, বলুন আপনাকে। আপনিই তো হারলেন আমি না।' গেঙ্কা উত্তর দেয়।

—'সে কী হে, এই তো এতক্ষণ তুমি আমার কথাই সমর্থন করছিলে।' অবাক হন স্লাভার বাবা।

—'সে তো কতকাল আগের ব্যাপার।' গেঙ্কার কথা শুনে অবাক হয়ে স্লাভার বাবা বলেন, —'আমার একজন মাত্র বন্ধু ছিল, হায সেও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। তা বেশ, এবার বলত তুমি নিজে কী হতে চাও?'

গেঙ্কার চটপট উত্তর, 'কেন, আমি তো ঠিক করেছি নৌবাহিনীতে যোগ দেব।'

স্লাভা হেসে ফেলে, —'ও তো মিনিটে মিনিটে মত বদলায়। একঘন্টা আগেও বলেছিল কারখানা স্কুলে ঢুকবে, আর এখন বলছে নৌবাহিনীতে যাবে।'

গেঙ্কা দমে না, বলে, 'আগে কারখানা স্কুলে, পরে নৌবাহিনীতে।'

—'বেশ, বেশ। তা তুমি কী করবে ঠিক করেছ মিশা।'

—'আমি জানি না। এখনও ঠিক করিনি।'

গেঙ্কা চেঁচিয়ে বলতে থাকল, 'ও তো কারখানা স্কুলে যেতে চায় আমি জানি। সেখান থেকে যাবে কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

মিশা ওকে থামায়। বলে, 'তুই থামত গেঙ্কা।'

স্লাভার বাবা বলল, 'তা বেশ, তোমার নজর উঁচু দিকেই। তবে আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্তত স্কুলের পড়াটা শেষ করবে।'

মিশা অস্বস্তি বোধ করে। বলে, 'ঠিক জানিনা, মায়ের বড় কষ্ট হয় কিনা।'

স্লাভা ওকে বাধা দিয়ে বলে, 'ওকে ইস্কুল থেকে ছেড়ে দিচ্ছে কে। ও ক্লাসের ফার্স্ট বয়।'

মিশা বলে, 'সন্ধ্যার ক্লাসেও পড়তে পারি। অনেক কমসমোল সদস্য দিনে কাজ করে। রাতে পড়ে। দেখি কী করা যায়।' বলে ঘড়ির দিকে তাকাল সে। না পৌনে বারোটা বেজে গেছে। এবারে বাড়ি ফিরতে হয়। স্লাভার বাবা বিদায়

জানানোর সময়ে হাসতে হাসতেই বললেন, 'একটু আধটু কথা কাটাকাটির জন্য আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে না আশাকরি। তোমরা যাই কর না কেন তাতেই আমার সত্যিকারের শুভকামনা রইল।'

৬৫.

চিঠি চাপাটি

সপ্তাহখানেক পরে ঠিকানা বিভাগ থেকে ওরা উত্তর পেল। ওরা লিখেছে — 'আপনাদের অনুরোধের উত্তরে জানাচ্ছি যে, কারোর সম্বন্ধে খোঁজ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্মসাল ও জন্মস্থানের নাম জানাতে হয়।' চিঠিটা পেয়ে ওরা ক্ষেপে গেল।

গেঙ্কা বলে, 'বোঝ ঠেলা, এবার আমরা খুঁজে বেড়াই মারিয়া গাভ্রিলভনা কবে জন্মেছিলেন, কোথায় জন্মেছিলেন। দূর ছাই, আমাদের পেত্রোগ্রাদে যাওয়াই ভাল।'

মিশা বলল, 'সে কাজের জন্য অনেক সময় আছে। তবে এই জবাবটা বিভাগীয় গাফিলতি আর গড়িমসি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওখানকার কমসমোলের সভাপতির কাছে আমরা অভিযোগ জানাব। এরপর ওরা তিনজনে মিলে একটা চিঠির মুসাবিদা করে ফেলল।

'প্রিয় সভাপতি

আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। যুদ্ধের আগে ১৯১৪ সালে ভ্লাদিমির তেরেন্তিয়েভ তার স্ত্রী ক্সিনিয়া সিগিজমুন্দভনা আর তার মা মারিয়া গাভ্রিলভনার সঙ্গে পেত্রোগ্রাদের ময়কা স্ট্রিটে স. স. ভাসিলিয়েভার বাড়িতে থাকতেন। আপনি কি একটু জানাবেন ওরা ওই বাড়িতেই এখনও আছেন কি না। অবশ্য সবাই নয়। কারণ ভ্লাদিমিরভিচ একটি যুদ্ধজাহাজ বিস্ফোরণের ফলে মারা যান। কিন্তু সম্ভবত তাঁর মা এবং বোন বেঁচে আছেন। আমরা ইতিমধ্যেই খোঁজ করেছিলাম ঠিকানা বিভাগে কিন্তু আপনার বিভাগ ওদের জন্মস্থান আর জন্মসাল জানতে চেয়েছেন। এটা গড়িমসি ছাড়া আর কিছুই নয়। কমসমোলের সভাপতি হিসেবে আপনার উচিত এইরকম ঢিলেঢালা ব্যাপার লাল আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া। ইতি,

ইয়ং পাইওনিয়রদের অভিনন্দনসহ,

পলিয়াকোভ, পেত্রোভ, এলদারোভ

চিঠিটা বাক্সে ফেলে দেওয়ার পর ওরা অপেক্ষা করে রইল। এদিকে স্কুলের অর্ধেক বছরটাই প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের পড়াশুনা ভালই হয়েছে। গেঙ্কা শুধু জার্মান ভাষাটা রপ্ত করতে পারেনি।

ইদানিং ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে পড়াশুনোর দিকে। তাছাড়া ইয়ং পাইওনিয়রদের কাজও অনেকটা বেড়ে গেছে। সন্ধ্যার সময়টা তো ফাঁকাই থাকে না। নতুন যে শিশুসদন ওদের আওতায় এসেছে সেখানে কাজ করতে হয়। ইয়ং পাইওনিয়র ভবনের কারখানাঘরে ক্লাস্ আছে। ওদের উপদলের সভা আছে। স্কুল কমিটির সভা আছে। তাছাড়া ছেলেরা এখন কমসমোলের প্রকাশ্য সভায় যেতে কখনও ভোলে না। সন্ধ্যার দিকে যে যার পছন্দ অনুযায়ী চক্রেও যোগ দেয়। প্রত্যেক রোববার সকালে ইয়ং পাইওনিয়রদের সভা বসে। আর মিশার উপদলকে জুয়েভো জেলার, জার্মানির খেমনিৎস শহরের পাইওনিয়ার আর লাল নৌবহরের নাবিকদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতে হয়। এসব ছাড়াও সপ্তাহে দুতিনবার করে স্কেটিং করাও আছে।

স্কেটিং-এর ময়দানে ওরা আসে সন্ধ্যার সময়ে। তাড়াতাড়ি করে লোকজনের ভিড়ের মধ্যেই পোশাক বদলে, পায়ে স্কেটস্ বাঁধে, সঙ্গের জিনিসপত্র রেখে দেয় পোশাকের ঘরে। বয়স্করা অন্য একটা ঘরে কাপড়জামা বদলায়। ছেলেরা ফিসফিস করে এ ওকে আঙুল দিয়ে দেখায়, 'ওই দেখ ফুশিন, মেনলিকভ ... ইপ্পনিতভ ...।' আর্ক আলোর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। বরফের ওপর তুষার রেখা ঝলমল করে ওঠে। স্কেটাররা গোল হয়ে ঘুরতেই থাকে। ওদের এই উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ কেমন যেন বেয়ারা ধরনের দেখায়। ওরা দল বেঁধে ঘোরে বটে, তবু হয় একটু তফাৎ রেখে নয় জোড়ায় জোড়ায় এ ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। যারা একেবারে নতুন তারা সাবধানে চলে, পা ওপরে তুলে অনেকসময় গোত্তা দেয়, বিদঘুটে ভাবে এগিয়ে পেছিয়ে যায়। য়ুরা ছাড়া সকলেই আনকোরা নতুন ছেলেদের মধ্যে। য়ুরার রয়েছে একজোড়া নরওয়েজিয়ান স্কেটিং সেট। কালো গেঞ্জি পরে য়ুরা স্কেট দৌড়ের রাস্তায় ছোটে। শরীরটা বেশ সামনে ঝুঁকিয়ে হাতদুটো পেছনে রেখে। ওর মুখ আর দেহের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটে ওঠে অন্য সব ছেলেদের প্রতি অসীম অবজ্ঞা। মিশা আর স্লাভা অবশ্য ওর দিকে নজরই দেয় না। কিন্তু গেস্কার মাথা গরম হয়ে যায়। একদিন দৌড়ের রাস্তায় ঢুকে গেস্কা ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করে। গেস্কা খুবই ভাল স্কেটার, স্কুলের সেরা সবচেয়ে, কিন্তু য়ুরার স্কেটজোড়ার সঙ্গে ওরটার তুলনাই হয় না। ফলে প্রায় অর্ধেকটা রাস্তা পেছনে পড়ে গেল সে। খুব হাস্যাস্পদ হয়ে গেল। ওদিকে য়ুরার তো দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। গেস্কা মনমরা হয়ে স্কেটিং ময়দানে যাওয়াই বন্ধ করে দিল। রাস্তাতেও আর স্কেটিং করে না। খুব মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে একদিন ও জন্মদিনে সবাইকে অবাক করে দিয়ে নেমন্তন্ন করে বসল। সামনের শনিবারে ওর জন্মদিন।

—'সবাইকে নিজের নিজের খাবার আনতে হবে না কি রে?'

—'না, খাবার আমার, তোরা কিন্তু উপহার অবশ্যই আনবি।'

—'বেশ, আমরা আসব। দেখব তুই কেমন অতিথি আপ্যায়ন করিস।'

৬৬.

গেঙ্কার জন্মদিন

শনিবার সন্ধ্যায় ছেলেরা এল গেঙ্কার বাড়িতে। টেবিলের ওপরে থরে থরে খাবার সাজানো দেখে ওরা তো ঘাবড়েই গেল প্রথমে। একদিকে রয়েছে ফুটন্ত সামোভার, ওপরে রঙিন কেতলি চাপানো। টেবিলের মাঝখানে খাবারভর্তি প্লেট। চর্বির চিলতে, দইমগু, মাংসের কোপ্তা আর মিষ্টি। ছ'জনের জন্য পরিবেশন করা হয়েছে। টেবিলের পাশে ঘুরঘুর করছেন গেঙ্কার পিসিমা।

মিশা বলল, 'এই গেঙ্কা, এত সব কী করেছিস রে। তোর ভাল হোক বাপু।'

গেঙ্কা উদাসীনভাবে বলল, 'বিশেষ আর কী বল। বসবি না তোরা?' নাটকীয় ভঙ্গিতে সবাইকে টেবিলে আমন্ত্রণ জানাল ও।

পিসি বলল, —'এখুনি বসতে বলছিস কেন? অন্যদের জন্য অপেক্ষা করবি না।'

ছেলেরা সমস্বরে প্রশ্ন করে, 'কারা আসবে রে।'

গেঙ্কা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল, —'করোভিন, আর কেউ না। সত্যি বলছি আর কেউ না।'

ছ নম্বর প্লেটটা দেখিয়ে মিশা বলল, 'এটা তাহলে কার জন্য রে?'

—'ওটা, ও, ওটা এমনি রাখা হয়েছে।'

—'এতসব জোগাড় যন্ত্র করলি, টাকা কোথায় পেলি রে গেঙ্কা?'

—'সে আমার এক গোপন রহস্য আছে।' বলেই পিসিকে বারণ করতে যাবে। কিন্তু তার আগেই পিসি গরগর করে সব ফাঁস করে দিলেন।

—'ওর বাবা পাঠিয়েছে। আমি বললাম গেঙ্কা, এত খাবার তো একমাস চলবে। তো ও কানেই নিল না। সব টেবিলে আনো। শেষ করে ফেল। এই হল ওর কথা। স্বভাবটা অবিকল বাপের মতন।' বকুনির সুরে কথা বললেও, গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন স্নেহ আর তারিফের সুরও ফুটে ওঠে।

মিশা বলল, 'উনি তো মিষ্টিও পাঠিয়েছেন দেখছি।'

পিসি বললেন, 'না, ওটা গেঙ্কা নিজেই কিনেছে। স্কেটদুটো বেচে দিয়েছে তো।'

গেঙ্কা চিৎকার করে ওঠে, 'পিসিমা, তোমাকে পইপই করে বললাম, কাউকে কিছু বলে দিও না।'

পিসি হাত পা নেড়ে বলে, 'কেন, বলব না কেন। ভাল কাজই তো করেছিস। ফেল্টজুতো দুটো এখন একটু বেশিদিন টিকবে।'

মিশা বলল, 'আমি যদি জানতাম বড়াই দেখানোর জন্য তুই স্কেট বেচে দিয়েছিস, তাহলে আমি আসতামই না রে গেঙ্কা।'

গেঙ্কা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'দূর সেসব কিছু না। স্কেট ছাড়াই চালিয়ে নেব। আমার জোড়াটা খুবই বিচ্ছিরি ছিল। যখন কাজে ঢুকব, তখন একজোড়া নরওয়েজিয়ান স্কেট কিনে নেব, বুঝলি। তাছাড়া তুইও তো তোর স্ট্যাম্পের খাতাটা বেচে দিয়েছিস। কেন বেচলি?'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে মিশা বলল, 'বেচতে হল।'

—'আমি জানি কেন।' গেঙ্কা সবজান্তার মতন বলে, 'চামড়ার জ্যাকেট কিনবি বলে পয়সা জমাচ্ছিস। যাতে খাঁটি কমসমোল সভ্যের মতন দেখায়।'

মিশা এড়িয়ে যায়, বলে, 'হতে পারে। স্লাভাও ওর দাবার বোড়েগুলোও বেচে দিয়েছে।'

অবাক হয়ে গেঙ্কা বলে, 'সে কী রে। হাতির দাঁতেরগুলো নয় তো। কেন বেচলি রে?'

স্লাভা এড়িয়ে গেল। বলল, 'বেচতে হল যে।'

এমন সময়ে তিনবার ঘন্টা বাজল দরজায়। পিসি এল, 'আরও অতিথি এল।' বলে দরজা খুলতে গেলেন তিনি। করোভিন ঢুকল, পরনে শ্রম আবাসের স্কুল ইউনিফর্ম আর টুপি। ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে, একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরিয়ে ফেলল।

মিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী খবর সব।'

—'খুব ভাল। কাল চতুর্থ মানের পরীক্ষা পাশ করেছি।'

—'তোর মাইনে এখন কত?'

—'প্রায় নব্বই রুবল।' বলে পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করল। সেটা দেখতে দেখতে বলল, 'ঘড়িওয়ালার কাছে যাওয়ার সময়ই পাচ্ছি না। পরিষ্কার করা দরকার।'

—'দেখি, দেখি', বলে ঘড়িটা টেনে নিয়ে কানে লাগিয়ে দেখল গেঙ্কা। 'আরে চলছে তো ঠিকই।'

—'হ্যাঁ, চলে ঠিকই, পনেরোটা জুয়েল। আমাদের ওখানে কমসমোল দল তৈরি হচ্ছে। আমি এর মধ্যেই দরখাস্ত করে দিয়েছি।'

মাসে নব্বই রুবল মাইনে। ঘড়ি, এতসব ছেলেরা হজম করতে পারছিল, কিন্তু করোভিনের এই কথাটা শুনে একেবারে বসে পড়ল। ওরা এখনও পাইওনিয়রই রয়েছে, স্বপ্ন দেখছে কবে কমসমোলে যোগ দেবে, আর এদিকে করোভিন দরখাস্ত দিয়েই দিয়েছে।

মিশা আর থাকতে না পেরে বলে দিল, 'আমরাও কমসমোলে যাচ্ছি। সরাসরি পাইওনিয়র দল থেকেই।' বলে স্লাভা আর গেঙ্কার দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাল। ওরা দুজন চুপ করে রইল নির্বিকারভাবে যেন মিশা ঠিকই বলছে।

করোভিন বলল, 'আমাদের স্কুলে নতুন ছাত্র কে এসেছে জানিস?'

—'কে রে?'

—'বরকা।'

—'সত্যি নাকি!'

—'হ্যাঁ, রে, সেই ছোরার খাপটাব জন্য ওর বাবা তো ওকে মেরেই ফেলেছিল প্রায়। ও পালিয়ে এসে এখন আমাদের ওখানেই উঠেছে।'

—'ও, তা কেমন আছে ও।'

—'মন্দ না। স্বভাবের উন্নতি হচ্ছে।'

দরজায় আবার ঘন্টা বাজল। দরজা খুললেন পিসি। ঘরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বোকার মতন গেঙ্কা। দরজা খুলতেই ঢুকল জিনা।... ... ও, ব্যাপারটা তাহলে এই। মিশা আর স্লাভা অর্থপূর্ণ চোখে এ ওর দিকে তাকাল। গেঙ্কা নড়ল না, শুধু হাতটা বাড়িয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তোরা বসবি না।' খিলখিল করে হেসে উঠল জিনা। সবাই হেসে উঠল। ফলে গেঙ্কার হতভম্ব ভাবটা কাটল। নাটকীয় ভঙ্গিতে ও বলল, 'প্রিয় অতিথিবৃন্দ, আপনাদের অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। এবার আমি আপনাদের উপহার গ্রহণ করব। দয়া করে ঠেলাঠেলি করবেন না। সার বেঁধে দাঁড়ান।'

দম না ফুরোন পর্যন্ত হাসতেই থাকে জিনা। এত মজাদার মেয়ে জিনা। ও উপহার দিল একটা সংয়ের পুতুল, সেটার মাথাব চুল অনেকটা গেঙ্কার মতন।

গেঙ্কা বলল, 'চমৎকাব। মেয়েদের কাজে কোনও খামতি হয় না। জানি না ছেলেবা আমাদের আমাকে কী উপহার দিয়ে খুশি করবে।'

মিশার যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'ও, হ্যাঁ, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম আর কী।' স্কুলের ব্যাগ খুলে ও একটা প্যাকেট বের করল। মুখখানা ওব এত গম্ভীর যে সবাই চুপ করে তাকিয়ে রইল ওর হাতের দিকে। ধীরে ধীরে প্যাকেটটা খুলে ফেলল সে বন্ধুরা যে নীরবে অপেক্ষা করছে সে দিকে খেয়ালই নেই। শেষ মোড়কটা খোলার আগে বোঝা গেল যে জিনিসটি লম্বা মতন কিছু। মিশা এদিক ওদিক তাকায়। উপহারটি দিতে বুঝি লজ্জা পাচ্ছে এরকম ভাব করে। উত্তেজনায় গেঙ্কা চোখ বড় বড় করে ঝুঁকে পড়ে। এক ঝটকায় তারপর মিশা খুলে ফেলে শেষ মোড়কটি। বেরিয়ে আসে নরওয়েজিয়ান স্কেটের একটা পাটি। তার ইস্পাতের ফলা চকচক করে ওঠে। গেঙ্কা সাবধানে স্কেটটা হাতে নেয় যেন অমূল্য কোনও সম্পদ হাতে নিচ্ছে। একটা কথাও বলতে পারে না। ঘর নিস্তব্ধ। গেঙ্কা স্কেটটার এখানে হাত বোলায়, ওখানে হাত বোলায়। তারপর বলে, 'কী দারুণ জিনিস রে, মিশা। আর এক পাটি কই।'

মিশা হতাশা ভঙ্গি করে। বলে, 'এই একটাই শুধু আছে রে, জোড়া খুঁজে পেলাম না।'

হতাশায় গেঙ্কার মুখটা লম্বাটে হয়ে যায়।

মিশা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ঘাবড়াসনি, আপাতত একখানা দিয়েই চালিয়ে নিতে পারবি।'

স্কেটিং রিংকে গেঙ্কা একপাটি স্কেট পড়ে দৌড়চ্ছে কল্পনা করতেও হাসি পায়। কিন্তু গেঙ্কার মুখের ভাবখানা এমন করুণ হয়ে উঠল যে এমন কী জিনা পর্যন্ত হাসতে পারল না। একটা টুলের ওপরে স্কেটটা রেখে গেঙ্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'তোরা এবারে টেবিলে এসে বোস সকাই।'

স্লাভা বলল, 'দাঁড়া একমিনিট। তোর জন্য আমিও একটা উপহার এনেছি।' গেঙ্কা শুনল বটে কিন্তু তেমন উৎসাহ পেয়েছে বলে মনে হল না। স্লাভা ওর স্কুলব্যাগ অনেকক্ষণ আতিপাতি করে খুঁজে একটা প্যাকেট বের করে খুলে ধরল সকলের সামনে। স্কেটের দ্বিতীয় পাটিটি। সকলে হই হই করে উঠল। গেঙ্কা বলল, —'আবার বোকা বানালি তোরা।' তারপর চুপ করে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল এক্ষুণি বুঝি কেঁদে ফেলবে। তারপর বলল, 'স্ট্যাম্পের খাতা, দাবার বোর্ড — চামড়ার জ্যাকেট ..'

মিশা বাধা দিয়ে বলল, 'ব্যস, থাম তো, ওসব ভুলে যা, চল খেতে বসি।'

৬৭.

পুশকিনো

শেষ পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ থেকে চিঠির উত্তরটা এল। লিখেছে : 'ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের চিঠি পেয়েছি। এখানে অনেক তেরেন্তিয়েভ আছে, তবে তোমরা যাদের খুঁজছ তারা নেই। আগের যিনি বাড়িওয়ালা তাঁর কাছে আমি গিয়েছিলাম। তিনি বললেন যে হ্যাঁ, যুদ্ধের আগে তেরেন্তিয়েভ আর তার স্ত্রী তার বাড়িতেই থাকতেন। ওদের মা থাকতেন মস্কোর কাছাকাছি কোথাও। এটুকুই জানতে পেরেছি। আর গড়িমসির ব্যাপারে মেজাজ খারাপ করার কোনও কারণ নেই। পেত্রোগ্রাদে তেরেন্তিয়েভ আছেন হাজার জন। সঠিক বিবরণ না জানালে খবর দেওয়া তো সম্ভব নয়। — কমসমোল অভিনন্দনসহ — কুপ্রিয়ানভা'।

মিশা বলল 'দেখলি তো কীভাবে বিজ্ঞান আর যন্ত্রের কৌশল কাজে লাগাতে হয়।'

গেঙ্কা জিজ্ঞাসা করে, 'যন্ত্রের কৌশল কোথায় পেলি তুই।

—'দেখতে পাচ্ছিস না। ডাকটিকিটের কাজটাই একটা যন্ত্রের কৌশল। বুদ্ধিমান যারা তারা এভাবেই চলে। যাদের মাথায় কিছু নেই তারা সব জায়গায় কেবল ছুটে বেড়ায়।'

খোঁচা হজম করল গেঙ্কা। তারপর পাল্টা খোঁচা দিল, 'ওই গড়িমসির জবাবটা পেয়ে দমেছিস নাকি একটু মিশা।'

—'আজ্ঞে না। যাকগে কাজের কথা শোন। রোববার আমরা পুশকিনো যাচ্ছি। সঙ্গে আমরা আমাদের স্কিগুলো নেব।'

—'স্কিগুলো কেন।'

—'লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য।'

পরের রবিবার মিশারা ট্রেনে চেপে পুশকিনোতে গিয়ে হাজির হল। প্রত্যেকের সঙ্গে একজোড়া স্কি আর ছড়ি। লড়ঝড়ে রেল স্টেশন। উঁচু কাঠের প্লাটফর্মের পাশে পাশে দোকানঘর, ছাদে পুরু বরফ জমেছে। সেগুলোর পেছনে অনেক চওড়া রাস্তা নানানদিকে চলে গেছে। পাশ দিয়ে কালো কালো বেড়া ঘেরা এক এক চিলতে জমির মাঝখানে কাঠের তৈরি বাড়ি, সঙ্গে কাচের বারান্দা। ছোট এক একটা রাস্তা উঠে গেছে প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে। গভীর তুষার পায়ের চাপে চাপে শক্ত জমাট হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এই তল্লাটে বুঝি কেউ বাস করে না। শুধু চিমনির ধোঁয়া দেখে বোঝা যায় যে না লোকজন আছে এখানে।

মিশা বলল, 'তুই আমার সঙ্গে আয় স্লাভা। রাস্তার একটা দিক থেকে শুরু করছি। গেঙ্কা তুই ধর উলটো দিকটা। আসল কাজ হল প্রত্যেকটা বাড়ির নামের ফলকটার ওপর নজর রাখা।'

স্লাভা আপত্তি করে বলে, 'দূর, সেটা করতে বছর ঘুরে যাবে বুঝলি। তার চেয়ে স্থানীয় সোভিয়েতে খোঁজ নিলেই তো হয়।'

মিশা বারণ করে, 'না, সেটা করা যাবে না। জানাজানি হলেই ঝঞ্ঝাট, সব জানাজানি হয়ে যাবে।'

গেঙ্কা তর্ক করে, 'আমরা কারো পরোয়া করি, শুনি। খুঁজে পেলে বুড়ি তো খুশিই হবে।'

মিশা বলে 'এখনও চোখেই দেখিস না অথচ তর্ক করছিস। চল, চল।'

সারাদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করেও ওরা কিছু হদিশ করতে পারল না। হতাশ হয়ে স্টেশনে ফিরে এল। স্লাভা বলল, 'এভাবে খুঁজলে কোনও পাত্তাই পাওয়া যাবে না। অর্ধেক বাড়িতে নামের ফলকই নেই। এখানকার সোভিয়েতকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

মিশা চটে গিয়ে বলল, 'বললাম তো সেটা করা যাবে না। সামনের রোববার এসে আবার খোঁজা যাবে।'

স্কি খুলে নিল ওরা। তারপর টিকিটঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ওদের ডাকল, 'এই যে ভাইয়েরা সব।'

ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে ইগর্ আর ইয়েলেনা দাঁড়িয়ে আছে।

খুব মিষ্টি করে হাসছিল ইয়েলেনা। ছোট ফারের টুপির ফাঁক দিয়ে সোনালি চুল বেরিয়ে এসে কোটের কলারে পড়েছে। ইগর যেমনটি পরিপাটি থাকে তেমনটিই রয়েছে। গম্ভীর। পরস্পর করমর্দন করার পর ইগর বলল, 'অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ নেই আমাদের।'

ইয়েলেনা জিজ্ঞাসা করল, 'স্কি করতে এসেছিলে বুঝি। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসনি কেন?'

মিশা বলল, 'তোমরা যে এখানে থাকো তাই তো জানতাম না।'

—'হ্যাঁ, এখানেই থাকি, কাছেই আমাদের কুঁড়েঘর। আসবে নাকি।'

—'এখন তো দেরি হয়ে গেছে। সামনের রোববার আসব।'

গেন্কা বলল, 'ঘাবড়িও না, আমরা ঠিকই আসব। এখানে আমাদের কাজ আছে।'

—'কী কাজ?'

গেন্কার দিকে সরোষে তাকিয়ে মিশা বলল, 'না, এমন কিছু নয়।'

ইয়েলেনা তবু শুনতে চায়, —'বল না ছাই।'

হঠাৎ গেন্কা বলল, 'আমার পিসিমার খোঁজ করছি আমরা।'

অবাক হয়ে ইয়েলেনা বলে, 'তোমার পিসি তো মস্কোতেই থাকেন।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু আরেকজন পিসিমা। লোকের কি দুটো পিসি থাকতে নেই?'

—'তার খোঁজ পাওনি বলছ।'

—'না, ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।'

—'নামটা মনে আছে, না কি সেটাও ভুলে গেছ।'

—'নাম তেরেন্তিয়েভা, সবাই ডাকে মারিয়া গাভ্রিলভনা বলে।' আচমকা বলে মিশা, —'তাকে কি তুমি চেনো?'

—'তেরেন্তিয়েভা, মারিয়া গাভ্রিলভনা। চিনি বইকি। আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন। চল নিয়ে যাচ্ছি।'

৬৮.

নিকিৎস্কি আবার

রাস্তায় যেতে যেতে মিশা বলল, 'গেন্কার পিসিকে আবার বোল না যে তাকে খোঁজা হচ্ছে। মনে থাকবে তো।'

—'কেন বল তো।'

—'সে এক লম্বা ইতিহাস। উনি জানেন গেন্কা মারা গেছে। তাই তাকে খবরটার জন্য আগে থাকতে তৈরি করে দিতে হবে। যদি বিনামেঘে বজ্রপাতের মতন হাজির হই তাহলে খুশির চোটে মরেই

যাবেন হয়ত। ওর স্বাস্থ্যও ভাল নয়। দেখতেই তো পাচ্ছো তার ভাইপোটি কি বস্তু।'

ইয়েলেনা বলে, 'আসলে ওনার সঙ্গে আমাদের জানাশোনা নেই বললেই চলে। ওরা তো কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাতই করেন না।'

মিশা বলল,- 'মোটের ওপর এই কথা কাউকেই বোল না। তোমার বাবাকেও না।'

—'বাবা মারা গেছেন।'

মিশা বিব্রত বোধ করে, 'শুনে খুবই খারাপ লাগছে আমার। জানতামই না সেই খবর। কিন্তু তাহলে তোমাদের চলছে কীভাবে এখন।'

—'নিজেরাই রোজগার করি। ইগর আর আমি সার্কাসে কাজ করি।' ওরা বুশদের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছয়।

পাশের একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখায় ইয়েলেনা, বলে, —'ওই, ওটাই ওনার বাড়ি। তুমি যেটা খুঁজছ।'

উঁচু বেড়ার ওপাশে ওরা শুধু দেখতে পেল ছাদটুকু। কিনারায় বরফের আস্তর পড়েছে ফুটো ফুটো বরফির মতন হয়ে।

মিশা জিজ্ঞাসা করে, 'এই রাস্তাটার নাম কী বল তো।'

ইগর উত্তর দেয়, 'ইয়ামস্কায়া স্লবদা। আমাদের বাড়ির নম্বর আঠারো, ওদেরটা কুড়ি।'

মিশা ধমকে ওঠে গেঙ্কাকে, 'ভারী নজর করে খুঁজছিলি তো।'

চোখ নামিয়ে গেঙ্কা বলে, 'কেমন করে নজর এড়িয়ে গেল কে জানে।'

স্লাভা বলে, 'রাস্তার ওদিকটাতে তো স্কিয়ের কোনও দাগই নেই।'

সেদিকে তাকিয়ে গেঙ্কা বলে, 'হতেই পারে না, কোথায় যে গেল দাগটা, নিশ্চয় মুছে গেছে। তাই হবে। দেখছিস তো কত গাড়িঘোড়া চলে গেছে।'

ইয়েলেনা মিশাকে সাধাসাধি করে, 'একবারটি ভেতরে এসো না। তিনদিন অবশ্য বাড়িতে ছিলাম না। কিন্তু এক সেকেন্ডে উনুন ধরিয়ে গরম করে দেব ঘর।'

অগত্যা ওরা ভেতরে যায়। ঘরটা ছোট, স্যাতস্যাতে। জানলাগুলোর ওপরে পুরু বরফের আস্তরণ জমেছে। দেয়াল ঘড়ির একটানা টিকটিক আওয়াজ। বন্ধুরা সবাই ভেতরে ঢুকতেই পাটাতনের তক্তা ক্যাচক্যাচ করে উঠল। মেঝেটা পরিষ্কার করে ধোয়া। তার ওপর সরু গালিচা পাতা। একটা বড় প্যারাফিন বাতি টেবিলে ওপরে ঝুঁকে রয়েছে। টেবিল নকশিকাটা অয়েল ক্লথে ঢাকা। দেয়ালে বড় বড় ফ্রেমে আঁটা ছবি। একজন পুরুষ একজন নারীর আঁকা প্রতিকৃতি। পুরুষটির প্রকাণ্ড গোঁফ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। পরিষ্কার কামানো থুতনিটা ঘাড় দিয়ে কাচা শক্ত কলারের ওপরে এসে পড়েছে, কলারের

কোনদুটো তোলা। মিশার মনে হল রেভস্কে তার দাদুর ছবিটার মতনই অবিকল।

ইয়েলেনা একটা পুরনো কোট গায়ে চাপিয়ে ফেল্ট জুতো পরল, মাথায় বাঁধল রুমাল। ওকে দেখাচ্ছে একেবারে গাঁগঞ্জের মেয়ের মতন। বড় বড় নীল চোখ আর টিকোল নাক। ইগরকে ডেকে ইয়েলেনা বলে, 'চল. উনুনের জন্য চেলাকাঠ নিয়ে আসি।'

শুনে ছেলেরা হাঁ হাঁ করে ওঠে। বলে, 'আমরা আনছি। কোথায় আছে বলে দাও।'

খিড়কির উঠোনে দল বেঁধে ঢুকল সবাই। ইয়েলেনা চালাঘর খুলে দিল। মিশা আর গেঙ্কা কাঠ চেরাই করতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। স্লাভা আর ইগর সেই চেলা কাঠ ঘরে বয়ে নিয়ে আসতে লাগল। ওরা যখন কাজে ব্যস্ত, ইয়েলেনা সেই ফাঁকে বালতি নিয়ে জল আনতে গেল।

গেঙ্কা বেশ মন দিয়েই কাঠ চেরাই করছিল। ওর বক্তব্য —'সব কাঠ চেলা করে রেখে যাব, কেন বারবার লকড়ির জন্য তকলিফ করা।' কিন্তু একটা কাঠের গুঁড়িকে কিছুতেই সে বাগ মানাতে পারছে না।

মিশা বলল, 'বাদ দে না ওটা। আর একটা ধর না।'

—'না। যেমন এই গুঁড়িটার, আমারও তেমনি গোঁ।'

দেখতে দেখতে ঘবের দুটো উনুনেই গনগনে আঁচ উঠল। ছোট্ট রান্নাঘরের উনুন ঘিরে বসল সবাই। ইয়েলেনা আর স্লাভা চেয়ারে, বাকিরা মেঝের ওপর।

হাতের বোনার কাজটা শুরু করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইয়েলেনা, বলে, 'এই একই ভাবে তো দিন কাটাচ্ছি। শুধু ছুটির দিনে আসি যখন আমাদের খেলা থাকে না।'

ইগব গম্ভীর গলায় বলে, 'আমাদের মস্কোতেই যেতে হবে।'

ইয়েলেনা আপত্তি করে, 'এখান থেকে চলে যেতে মন চায় না। মা বাবা থাকতেন এই বাড়িতেই।'

জলের ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ কবে আগুনের শিখা উঠল, মেঝেতে উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল।

ইয়েলেনা বলল. 'এই সপ্তাহটা পুরো এখানে থাকব। আমাদের কাছে আসবে কিন্তু।'

মিশা বলল, 'জানি না হয়ে উঠবে কি না। এই সপ্তাহে আমাদের বড় বেশি ব্যস্ত থাকতে হবে। কাল পাইওনিয়র দলের মিটিং আছে, কমসমোলে আমাদের নেওয়া হবে কিনা সেই ব্যাপারে। যদি ওরা আমাদের সুপারিশ করতে মনস্থ করে তাহলে আবার কমসমোল দলের ব্যুরোতে যেতে হবে, তারপর কমসমোল দলের সভায়, তারপর কমসমোল জেলা কমিটিতে।'

ইয়েলেনা খুব অবাক হয়ে বলে, 'তোমরা এখনই কমসমোলের সভ্য হতে যাচ্ছ নাকি!'

—'হ্যাঁ।' তারপর একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, —'আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে চিলেকোঠা আছে।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু কেন বল তো।'

—'একবার দেখার ইচ্ছে ছিল।'

—'এসো, আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দিই।'

ঠাণ্ডা বারান্দার মধ্যে বেরিয়ে এল মিশা আর ইয়েলেনা। চিলেকোঠার খাড়া সিঁড়িটা বেয়ে উঠতে লাগল। ইয়েলেনা ওর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মিশা, তোমার হাতটা দাও, নাহলে হঠাৎ পড়ে যাবে।'

চিলেকোঠায় পৌঁছে ওরা ছাদের ঘুলঘুলির কাছে এগিয়ে গেল। ওদের সামনে গোটা মহল্লাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে ভাগ ভাগ করা। পেছনে ঘন কালো জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে রেললাইন।

মিশার পাশে দাঁড়িয়ে ইয়েলেনা। চাঁদের আলোয় ওর মুখটা ঝলমল করছে। শুধু সরু ভুরুজোড়া আর চোখের বাঁকা পাতাগুলোকে দেখাচ্ছে যেন আরও কালো। মিশার হাত জোরে ধরে আছে ও। দুজনেই চুপচাপ।

তেরেন্তিয়েভদের খিড়কির উঠোনের দিকে তাকাল মিশা। বিরাট উঠোন। কোথাও কোনও জনমনুষ্য নেই। বেড়ার কাছে কতগুলো কাঠের গুঁড়ি আর চালাঘর। কোথায় যেন রেলইঞ্জিনের হুইসিল বেজে উঠেই থেমে গেল। মিশা একদৃষ্টে উঠোনটার দিকে তাকিয়ে আছে এমন সময় হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে গেল। কাঁধের ওপরে খাটো ফারের কুর্তা জড়িয়ে একটা লম্বা ঢ্যাঙা লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। মিশার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকল। তারপর সিগারেটের টুকরোটা বরফের ভেতরে গুঁজে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। গায়ের জোরে মিশা চেপে ধরল ইয়েলেনার হাত।

লোকটা নিকিৎস্কি।

৬৯.

বাবার কথা

সেদিন মস্কোতে ফিরতে ওদের অনেকটাই রাত হল। মিশা যখন বাড়িতে ফিরল তখন মাঝরাত। মা আজও জেগে আছেন, টেবিলে বসে বই পড়ছেন। মিশা ঢুকতেই মা ওর দিকে তাকিয়ে নীরব তিরস্কারে বিদ্ধ করলেন। মিশা তাড়াতাড়ি বলল, 'জানো মা, পুশকিনোতে দুএকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাই একটু দেরি হয়ে গেল। রাতের খাওয়া ওখানেই খেয়ে এসেছি। তুমি ভেবো না।'

মায়ের কাঁধের ওপরে ঝুঁকে মিশা বলে, 'কী বই পড়ছ মা, ও 'আনা কারেনিনা'। মিশার গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার আভাস পেল মা।

—'কেন রে, বইটা তোর পছন্দ নয় নাকি।'

—'তেমন নয়, তার চাইতে 'যুদ্ধ ও শান্তি' বেশি ভাল লাগে আমার।' বিছানায় বসে জামা জুতো ছাড়তে থাকে মিশা।

—'কেন রে?'

—'কেন জিজ্ঞাসা করছ।' এক মুহূর্ত ভাবল মিশা। তারপর বলল, —''যুদ্ধ ও শান্তি'র চরিত্ররা সবাই গভীর প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু এই বইটিতে তুমি বুঝেই উঠতে পারবে না কে কি ধরনের চরিত্রের। স্তিভা লোকটি তো কুঁড়ে, চল্লিশ বছর বয়স অথচ খোকামি করেই সময় কাটায়।'

মা প্রতিবাদ করে, 'সব নায়ক তো আর অত গায়ে ফু দিয়ে বেড়ায় না। যেমন ধর লেভিন।'

—'হ্যাঁ, লেভিন অবশ্য ওদের তুলনায় একটু বেশি গম্ভীর। কিন্তু সেও তো আবার নিজের খামারটি ছাড়া আর কিছুরই ধার ধারে না।'

মা ধীরে ধীরে, প্রত্যেকটি কথা বেছে বেছে বলতে থাকেন, 'তোর বোঝা উচিত যে এই লোকগুলোর মধ্যেই তাদের নিজেদের যুগের, নিজেদের সমাজের খাঁটি চরিত্র ফুটে উঠেছে।'

—'সে সবই আমি বুঝি।' মিশা ততক্ষণে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়েছে। 'ওসব হল খানদানি ব্যাপার। 'যুদ্ধ ও শান্তি'-র মধ্যেও ওই উঁচুতলার সমাজই দেখানো হয়েছে। কিন্তু তফাতটা দেখো। সেখানে লোকগুলোর জীবনে লক্ষ্য আছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ আছে। কিন্তু তোমার ওই বইটিতে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না ওরা কেন বেঁচে আছে। যেমন ধর ভ্রোনস্কি আর স্তিভা। আচ্ছা মা, তুমিই বল না, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কিছু লক্ষ্য থাকা উচিত কিনা।'

মা উত্তর দেন, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। আর আমার তো মনে হয় 'আনা কারেনিনা'-র প্রত্যেকটি চরিত্রেরই জীবনের লক্ষ্য আছে। তাদের লক্ষ্যগুলো হয়ত নিছক ব্যক্তিগত, সত্যি কথা, যেমন ধর — ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য। কিংবা যাকে একজন ভালবাসে তারই সঙ্গে জীবন কাটাতে চায়। লক্ষ্যগুলো ছোটখাটো হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য তো বটেই।'

মিশা কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে তোলে। বলে,

—'একে তুমি লক্ষ্য বল মা। সেভাবে বিচার করলে তো প্রত্যেকটি মানুষেরই কোনও না কোনও রকমের লক্ষ্য-থাকেই কিছু না কিছু। একটা মাতালেরও লক্ষ্য থাকে রোজ মদ খেয়ে মাতলামি করা। একজন বুর্জোয়ার লক্ষ্য হল টাকা জমানো। কিন্তু সে ধরনের লক্ষ্যের কথা আমি বলছি না।'

—'কী ধরনের লক্ষ্যের কথা বলছিস।'

—'কী করে বোঝাই বল তো তোমাকে। মানে একজনের লক্ষ্য হওয়া উচিত খুব উঁচু। বুঝলে না, মহৎ।'

—'কিন্তু কী বোঝাতে চাইছিস সেটা তো বলছিস না।'

—'আচ্ছা, ধর। সেদিন যেমন স্লাভার বাবার সঙ্গে কথা হল। উনি নিজেই একটা কথা বলছিলেন। আগের দিনে উনি শুধু টাকা রোজগার করার জন্যই কাজ করতেন। তখন তার মনে কোনও উঁচু লক্ষ্য তেমন ছিল না। আর এখন যদি উনি সারাদিন মেহনত করে কারখানাটা আবার চালু করতে চান আর তার ফলে আমাদের দেশের পণ্য বেড়ে যায়, তাহলে সেটাকে বলতে হবে এক মহান লক্ষ্য। হয়তো আমার উদাহরণটা তেমন জুৎসই হল না। কিন্তু জিনিসটা আমি এইরকম ভাবেই বুঝি।'

মা একটু ভেবে বললেন, 'কিন্তু মিশা, ওনাকে কীভাবে দোষ দেব বলতো। এটা তো তুই ভালই বুঝতে পারছিস যে সেরকম মহৎ কোনও লক্ষ্য ওনার পক্ষে আগে ঠিক করা সম্ভব ছিল না। তখন উনি কাজ করতেন একজন ব্যবসায়ীর কাছে, মালিকের জন্য। তাই নিজের মাইনেটা ছাড়া আর কিছুতেই তার সেইসময় আগ্রহ ছিল না।'

মিশা অবশ্য মেনে নিল না কথাটা। বলল, 'না, ওর পক্ষে সেটা করা উচিত হয়নি। বাবা তো মালিক, পুঁজিপতিদের কাজ করেন নি কখনও।'

—'কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, মিশা। তোমার বাবাকেও ওদের জন্য কাজ করতে হত।'

—'কিন্তু সেটা তো সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। উনি কাজ করতেন রোজগারের আশায়। কিন্তু সেটাই তার জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। উনি ছিলেন বিপ্লবী। বিপ্লবের জন্যই জীবন দিয়েছেন। তার মানে বাবার জীবনের লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে মহৎ।'

দুজনেই চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মিশা বলল, 'জানো মা, বাবার চরিত্র আমি বেশ কল্পনা করতে পারি। আমার মনে হয় উনি কক্ষণও কোনওকিছুকেই ভয় করতেন না।'

—'হ্যাঁ, সেকথা ঠিকই। দারুণ সাহসী মানুষ ছিলেন তিনি।'

মিশা থামে না, বলেই চলে —'তাছাড়া আমার তো মনে হয় উনি নিজের কথা, নিজের সুখসুবিধার কথা কখনও তেমন করে ভাবতেন না। সবকিছুর ওপরে স্থান দিতেন পার্টির স্বার্থকে।'

মা কোনও জবাব দিলেন না। মিশা জানে বাবার কথা মনে পড়লেই মায়ের মন খুব খারাপ হয়ে যায়, তাই ও আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করল না।

মা বই বন্ধ করে আলো নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু মিশা

অনেকক্ষণ চোখ খুলে জেগে রইল। ঘরের ভেতরে চাঁদের আলো ভিড় করে আসছে, তাই সে দেখে, দেখতেই থাকে।

মায়ের সঙ্গে কথাবার্তার পরে ওর মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। এই প্রথম বোধহয় জীবনের লক্ষ্য নিয়ে এত আলোচনার পর ওর পরিষ্কার মনে হচ্ছে যে শৈশব ওর পার হয়ে গেছে, জীবনের পাকা সড়কে ও এখন যাত্রা শুরু করল।

ভবিষ্যতের কথা ভাবে মিশা। বিপ্লবের মহান আদর্শের জন্য ওর বাবা আর বাবার মতন আরও যেসব মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের মত করেই বাঁচতে চায় ও, অন্য কোনওভাবেই নয় ...।

৭০.

গেঙ্কার গাফিলতি

পুশকিনো থেকে ফিরে এসে পরের দিন সকালেই মিশা সুভিরিদভকে জানিয়ে দিল যে সে নিকিৎস্কিকে দেখেছে। সুভিরিদভ ওদের সবুর করতে বললেন। স্পষ্ট হুকুম দিলেন যে ওরা যেন কিছুতেই আর পুশকিনোতে না যায়।

এরই মধ্যে অন্য একটি ব্যাপারে মেতে উঠল মিশা। দলের পরিষদ ঠিক করেছে যে পাইওনিয়রদের কয়েকজনকে কমসমোলে সামিল করার সুপারিশ করবে। সেই কজনের মধ্যে আছে মিশা, গেঙ্কা, স্লাভা, শুরা আর জিনা। নিজেদের কমসমোল সভাতে ওরা এর মধ্যেই দাখিল হয়ে গেছে। এখন ওদের তৈরি হতে হবে জেলা কমসমোল কমিটির প্রবেশিকা কমিশনের সামনে দাঁড়ানোর জন্য।

মিশা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খুব শিগগিরই যে ও কমসমোলের সদস্য হতে চলেছে সেকথা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না ওর। ওর এতদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে সেটাও কি সম্ভব। কমসমোল সদস্যরা এখন জেলা কমিটির বারান্দায় আর কামরায় এসে ভিড় জমায়। ও একটা চাপা ঈর্ষা নিয়ে দেখে ওদের। কী স্ফূর্তি আর আত্মবিশ্বাস ছেলেগুলোর। প্রবেশিকা কমিশনের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল জানতে পারলে ভাল হত। খুব সম্ভব ওরাও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছিল। সেসব এখন ওদের কাছে অতীতের কথা। আর মিশা এখন পোস্টার সাঁটা বড় একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে নিজের পালা কখন আসবে সেই অপেক্ষায় ক্ষণ গুণছে। এই দরজাটার ওপাশেই কমিশনের কাজ চলছে, মিশার ভাগ্যও শিগগিরই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

প্রথমেই ডাক পড়ে গেঙ্কার। কামরা থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওকে ছেঁকে ধরে। —'কী হল রে।'

কলার উলটে গেঙ্কা উত্তর দেয়, 'সব ঠিক আছে। সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।' ওকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে আর ও যেসব উত্তর দিয়েছে সবই বলল

গেঙ্কা। একটা প্রশ্ন ছিল —'স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষানবিশির সময় কতদিনের।'

গেঙ্কা বলল, 'আমি বলেছি ছমাস।'

মিশা বলল, —'সে কি রে, ওটা তো হবে একবছর। তোর উত্তরটা ভুল হল।'

গেঙ্কা তবু বলল, 'না, ছ মাস। আমি তাই বললাম আর সভাপতিও বললেন ঠিক আছে।'

মিশা ধাঁধায় পড়ে গেল। বলল, 'তা কেমন করে হবে, আমি নিজে খুঁটিয়ে পড়েছি নিয়মকানুনগুলো।'

মিশার পালা এল। বড় ঘরটায় ঢুকল ও। টেবিলগুলোর একটাতে কমিশনের পরামর্শ চলছে। একদিকে বসে আছে কোলিয়া। মিশা জড়োসড়ো হয়ে বসে, উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

রুশ কামিজ আর চামড়ার জ্যাকেট পরা কটা চুলওয়ালা একটি তরুণ হল সভাপতি। মিশার দরখাস্তটা সে চটপট পড়ে নিতে নিতে প্রত্যেকটি কথার শেষে স্বগতোক্তি করে চলেছে।

কোলিয়া হেসে বলল, 'এ আমাদেরই একজন সক্রিয় সভ্য। উপদলের নেতা, স্কুল পরিষদের সভ্য।'

সভাপতি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'নিজের লোকের গুণ আর গাইবেন না। আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে নিচ্ছি।'

প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিল মিশা। শেষ প্রশ্নটা হল, স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষানবিশির সময়কাল। মিশা জানত এক বছর। কিন্তু গেঙ্কা যে ...

ইতস্তত করে মিশা উত্তর দিল, 'ছ মাস।'

—'ভুল', সভাপতি বলল, —'এক বছর। তুমি এবারে যেতে পার।'

কমিশনের ঘরে সকলের ডাক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তড়িঘড়ি করে ছুটল সুভিরিদভেব সঙ্গে দেখা করতে। উনি বলেছিলেন দশটার সময় ওর ওখানে যাওয়ার জন্য। রাস্তায় মিশা আর স্লাভা গেঙ্কাকে একহাত নিল। স্লাভাও যথারীতি গেঙ্কার অনুসরণ করে ভুল উত্তর দিয়েছিল।

মিশা আক্ষেপ করে বলল, 'আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। আমরা ছাড়া আর সবাইকেই ওরা নেবে। গোটা স্কুলে খুব বদনাম হয়ে গেল আমাদের।'

স্লাভা মুখ বেঁকিয়ে হাসে, 'স্কেটিং-এর মাঠে তো ওর জুড়ি নেই। সারাদিন সেখানেই কাটায়। খবরের কাগজগুলোও উলটে দেখার প্রয়োজন মনে করে না ও।'

যা ঘটেছে তাতে ভয়ংকর দমে গেছে গেঙ্কা। কোনও উত্তর দিল না। ট্রামগাড়ির পুরু বরফ ঢাকা জানলার ওপর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু ওর নীরবতায় কোনও কাজ হল না। বন্ধুরা সমানে বকাবকি করেই চলেছে। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হল, ওরা সরাসরি ওকে কিছু না বলে একজন

তৃতীয় পক্ষকে দাঁড় করিয়ে কথা বলছে, আর সেই তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নাম করছে ওর।

মিশা খোঁচা দিয়ে বলল, 'সবই ঠিক আছে রে স্লাভা। ব্যস, আমাদের দমাবে এমন সাধ্যি কার। কারুর তোয়াক্কা করি নাকি। আমরা সব করতে পারি।'

স্লাভা সেই সঙ্গে জুড়ে দেয়, 'আরে, আমরা কড়ে আঙুল নাচিয়েই জিতে যাব রে।'

মিশা তাতেও খুশি না হয়ে বলে, 'উনি আবার সব সময় গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখেন। গুপ্তধন আর গুপ্তধন। চেহারাটা দেখ একবার গুপ্তধনসন্ধানীর।'

স্লাভার একটু দয়া হয় বোধহয়। বলে, 'ও যে কোটিপতি হতে চায়।'

একটা বড় বাড়ির সামনে এলে ওরা দাঁড়াল। নীচের তলায় অনুসন্ধান অফিসে কমরেড সুভিরিদভের সঙ্গে দেখা করতে চায় বলে অনুমতিপত্র নিয়ে ২০৩ নম্বর কামরায় যাওয়ার নির্দেশ পেল। ছেলেরা কামরায় ঢুকতেই গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেন,

—'দেরি করলে কেন?'

—'কমসমোল জেলা কমিটিতে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। প্রাথমিক কমিশন ছিল কি না তাই।' মিশা জবাব দেয়।

সুভিরিদভ ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, —'তাই নাকি। তাহলে আমার অভিনন্দন নাও।' নিরাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওরা।

—'কী ব্যাপার। কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি।'

—'আমরা ফেল হয়ে গেছি।'

—'ফেল, কেমন করে।' আরও অবাক হয়ে সুভিরিদভ প্রশ্ন করেন।

—'শিক্ষানবিশির প্রশ্নটিতে।'

—'দোষ আমারই', গেঙ্কা মুখ গোমড়া করে বলে।

—'অন্যসব প্রশ্নের ঠিকঠিক জবাব দিয়েছ তো?'

—'হ্যাঁ, সে বোধহয় দিয়েছি।'

সুভিরিদভ হেসে ফেলেন, বলেন, 'আরে মুখ ফেরাও তোমরা। একটা ভুল উত্তরের জন্য ওরা নিশ্চয় তোমাদের বাতিল করে দেবে না। যারা কমসমোলের সভ্য হতে চায়, সভ্য হওয়ার যোগ্যতা যাদের আছে, তারা নিশ্চয়ই সভ্য হবে। আমার কথা শোন, ঘাবড়িও না একটুও। এবারে এসো কাজের কথায়। মন দিয়ে শোন। নিকিৎস্কি বলছে তার নাম নিকিৎস্কি নয়। তাছাড়া কয়েকজন সাক্ষীরও নাম নিয়েছে, ফিলিন আছে তার মধ্যে। ছোরার খাপটা হারাবার পর অবশ্য ওরা সবাই মিলে ঝগড়া করেছে। ফিলিন দোষ দিচ্ছে স্ট্যাম্পওয়ালাকে, স্ট্যাম্পওয়ালা দোষ দিচ্ছে ফিলিনের। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সেই বাক্সগুলো ঠিক সময়মতন ওরা সরিয়ে নিয়ে গেছে তলকুঠুরি থেকে। নিশ্চয়ই কেউ ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।'

বন্ধুরা মুখ লাল করে চুপ করে বসে থাকে।

সুভিরিদভ বলতে থাকেন, —'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কেউ ওদের সাবধান করে দিয়েছিল ঠিক সময়মত। যাকগে এর মধ্যে নিকিৎস্কির সামনে যাতে সরাসরি হাজির হতে পার তোমরা সেই ব্যবস্থা করেছি। তোমরা যা জানো সব বলবে। সমস্ত প্রশ্নের সত্যি সত্যি জবাব দেবে। কিছু বানিয়ে বলবে না। এবারে পাশের ঘরে যাও। ওখানে অপেক্ষা করবে। যখন দরকার হবে ডেকে পাঠাব। আমি যখন জিজ্ঞাসা করব তেরেন্তিয়েভকে নিকিৎস্কি কেন খুন করেছিল তখন এই ছোরাটা বের করে দেখাবে।'

৭১.

নিকিৎস্কির মুখোমুখি

প্রথমে ডাক পড়ল স্লাভার, তারপর গেঙ্কার, সকলের শেষে মিশার। মিশা যখন ঘরের ভেতরে এল, সুভিরিদভ ছাড়াও তখন আর একটি লোক সেখানে ছিল। মধ্যবয়সী একজন। জাহাজী উর্দি পরনে, মুখে পাইপ নিয়ে টেবিলের ধারে বসে আছে। দেওয়ালের কাছে গম্ভীর হয়ে হাঁটুর ওপরে টুপি রেখে বসে আছে গেঙ্কা আর স্লাভা। দরজার পাশে রাইফেল হাতে একজন সান্ত্রী। নিকিৎস্কি কামরার মাঝখানে সুভিরিদভের সামনাসামনি একটা চেয়ারে বসে আছে। পরনে অফিসারের জ্যাকেট, নীল ঘোড়সওয়ারি ব্রিচেস, উঁচু বুট। পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে আছে। একেবারে নির্বিকার ভঙ্গি। কালো চুল বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো পেছনের দিকে। ঘরের ভেতরে ঝলমলে রোদের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে।

মিশা ঘরে ঢুকতেই নিকিৎস্কি চট্ করে মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখে। কিন্তু এটা তো রেভস্ক নয়, সেই রেলগাড়ির কুঠিও নয়। মিশার মনে পড়ে গেল পলেভয়ের রক্তাক্ত মুখ, ভাঙা রেল লাইন, সবুজ মাঠের মধ্যে ঘোড়াগুলোর আর্তনাদ। মিশা চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

নিকিৎস্কিকে দেখিয়ে সুভিরিদভ প্রশ্ন করেন, —'এই লোকটিকে চেনো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কে এ?'

—'ভালেরি সিগিজমুন্দভিচ নিকিৎস্কি।' দৃঢ় গলায় বলল মিশা।

নিকিৎস্কি এতটুকু হেলল না।

সুভিরিদভ জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন করে ওকে চিনলে খুলে বল।'

মিশা রেভস্ক আক্রমণ, ফৌজি ট্রেনের ওপরে হামলা, আর ফিলিনের গুদামঘরের কথা বলল।

সুভিরিদভ নিকিৎস্কিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য।'

নিকিৎস্কি শান্তভাবে উত্তর দিল, 'সে তো আগেই আমি বলেছি, এই বাচ্চা খোকাটার কল্পনার চাইতে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমি আপনার হাতে দিয়েছি।'

'আপনি এখনও বলতে চান যে আপনার নাম নিকোলস্কি।'

—'অবশ্যই।'

—'আর বলছেন যে আপনি মারিয়া গাব্রিলভনার বাড়িতে থাকতেন এই সূত্রে যে আপনি তার ছেলে ভ্লাদিমির তেরেন্তিয়েভের অধীনে কাজ করতেন।'

—'হ্যাঁ, উনিও এ কথা সমর্থন করবেন।'

—'আপনি এখনও বলতে চান যে ভ্লাদিমির 'রানি মারিয়া' জাহাজডুবির আগে বিস্ফোরণের ফলে মারা যান।'

—'হ্যাঁ, সকলেই তা জানে। আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম। একটা লঞ্চ আমাকে উদ্ধার করেছিল।'

—'তাহলে, আপনি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন।'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ। এবার মিশা তুমি বল তো তেরেন্তিয়েভকে কে গুলি করেছিল, তুমি জানো।'

—'ইনিই গুলি করেছিলেন।' নিকিৎস্কিকে দেখিয়ে দৃঢ়ভাবে মিশা বলে। পলেভয় আমাকে বলেছে। পলেভয় নিজের চোখে সেটা দেখেছিল।'

—'এ সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য শ্রীনিকিৎস্কি।'

নিকিৎস্কি ক্ষীণভাবে হাসল। বলল, 'এর চেয়ে আজগুবি কথা আমি কখনও শুনিনি। এত কিছুর পরেও কি তাহলে তার মায়ের বাড়িতে এসে থাকতাম। এসব উদ্ভট জিনিস বিশ্বাস অবিশ্বাস করা আপনার নিজের ব্যাপার।'

—'মিশা, তুমি কোনও প্রমাণ দিতে পার।'

মিশা পকেট থেকে ছোরাটা বের করে সুভিরিদভের সামনে রাখল। নিকিৎস্কি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছোরাটার দিকে। ছোরাটার খাপ থেকে ফলাটা টেনে বের করে সুভিরিদভ হাতলটা ঘোরালেন। ধাতুর মোড়ানো পাতটা বেরিয়ে এল। আস্তে আস্তে আবার ছোরাখানা বন্ধ করে রাখলেন উনি। নিকিৎস্কি তার হাতের প্রত্যেকটি ভঙ্গি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে।

—'আচ্ছা শ্রীনিকিৎস্কি, এই জিনিসটা কখনও দেখেছেন আপনি।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে নিকিৎস্কি উত্তর দেয়, 'না, আগে কখনও দেখিনি।'

—'একগুঁয়েমি করে আপনার কোনও লাভ হবে না। হ্যাঁ, তাহলে সাক্ষী হিসেবে মারিয়া তেরেন্তিয়েভকে আনা যাক কি বলেন।' বলে টেবিলের কয়েকটা কাগজের তলায় ছুরিটা রেখে দিয়ে ইশারা করলেন।

দীর্ঘকায়া এক বৃদ্ধা মহিলা ভেতরে এলেন। গায়ে কালো কোট, মাথায় পাকা চুলের কয়েক গোছা বেরিয়ে এসেছে কালো শালের ভেতর থেকে।

সুভিরিদভ একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'অনুগ্রহ করে বসুন ওই চেয়ারে।'

মহিলাটি বসে চোখ বুঁজলেন। বোঝা গেল খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

সুভিরিদভ প্রশ্ন করেন, —'আচ্ছা শ্রীমতী তেরেন্তিয়েভা, এই ভদ্রলোকটির নাম দয়া করে বলবেন কি।'

চোখ না তুলেই শান্তভাবে মহিলা জবাব দিলেন, —'নিকোলস্কি।'

—'কোথায়, কখন, কীভাবে আপনাদের পরিচয় হয়েছে।'

—'যুদ্ধের সময় ও আমার ছেলের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছিল।'

—'আপনার ছেলের নাম।'

—'ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরভিচ।'

—'তিনি কোথায়?'

—'মারা গেছেন।'

—'কবে?'

—'১৯১৬ সালের সাত অক্টোবর যখন 'রানি মারিয়া' জাহাজে বিস্ফোরণ হয়।'

—'উনি যে বিস্ফোরণে মারা গেছেন সে সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ?'

—'নিশ্চয়। আমাকে সরকারি নোটিশ পাঠান হয়েছিল।' বলে খুব অবাক হয়ে সুভিরিদভের দিকে তাকান তিনি।'

—'তার জিনিসপত্র আপনার কাছে পাঠানো হয়েছিল?'

—'না, কেমন করেই বা পাঠাবে। কেউ তো বাঁচাতে পারেনি কিছু।'

—'তার মানে আপনার ছেলের সব জিনিসপত্র খোয়া গেছে।'

—'সেরকমই তো মনে হয়।'

—'আপনি একটু টেবিলের কাছে আসবেন?'

তেরেন্তিয়েভা ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। কাছে আসতেই কাগজের তলা থেকে ছোরাটা বের করে দেখালেন সুভিরিদভ। প্রশ্ন করেন, 'এই ছোরাটি চিনতে পারেন কিনা একটু দেখবেন।'

ছোরাটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন মহিলাটি। তারপর অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা তো আমাদেরই। হ্যাঁ, ভ্লাদিমিরের ছোরা।'

—'আপনার ছেলের সব জিনিসপত্র হারাল, অথচ একটা ছোরাই শুধু থেকে গেল, আপনার অবাক লাগছে না ভাবতে।'

মহিলাটি জবাব না দিয়ে থরথর করে কেঁপে টেবিলটা আঁকড়ে ধরলেন জোরে।

সুভিরিদভ কর্কশ গলায় বললেন, 'তাহলে আপনার কিছু বলার নেই তো। শেষবারের মতন জিজ্ঞাসা করছি এই লোকটি কে।'

তেরেন্তিয়েভা ক্লান্ত গলায় উত্তর দিলেন, —'নিকোলস্কি।'

সুভিরিদভ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তাহলে শুনুন। এই লোকটি হচ্ছে আপনার ছেলের হত্যাকারী।' বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তেরেন্তিয়েভা। ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন, 'কী, কী বললেন।'

ওনার দিকে না তাকিয়ে সুভিরিদভ বলে চললেন, —'১৯১৬ সালের সাতই অক্টোবর লেফটেনান্ট নিকিৎস্কি দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন ভ্লাদিমিরভিচ তেরেন্তিয়েভকে গুলি করে হত্যা করে, এই ছোরাটা হাতাবার জন্য।'' ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নিকিৎস্কির দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকেন তেরেন্তিয়েভা। তারপর ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতেই সুভিরিদভ আর জাহাজি উর্দি পরা লোকটি শক্তহাতে ওনাকে ধরে ফেললেন।

৭২.

তেরেন্তিয়েভ পরিবার

একটা বড় গাড়িতে চড়ে সবাই যাচ্ছে এখন। গাড়িতে রয়েছেন সুভিরিদভ, সেই জাহাজি নাবিক, মিশারা তিনজন, আর তেরেন্তিয়েভা। গাড়ি ছুটে চলেছে মস্কোব রাস্তা ধরে। রাস্তার পাশেই বাড়িঘর সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে পেছনে। কিছুক্ষণ চলার পরেই মস্কো শহর শেষ হয়ে গেল। শুরু হল শহরতলি। ঘন পাইনের বন। ধূসর গলা বরফে ঢাকা ক্ষেতি জমি আর গ্রাম।

মারিয়া গাভ্রিলভনা সামলে উঠেছেন। উনি বলতে থাকেন, 'ছোরাটা একসময়ে ছিল পলিকার্প তেরেন্তিয়েভের সম্পত্তি। দেড়শো বছর আগে এক বিখ্যাত বন্দুক মিস্ত্রি ছিলেন তিনি। পুবদেশে অভিযান করার সময়ে নাকি ছোরাটা তিনি পান। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ পেত্রোভ্‌নার আমলে পলিকার্প তার জমিদারিতে গিয়ে বসবাস করার সময়ে একটা গোপন লুকোনোর জায়গা তৈরি করেন। সেই সময় দিনকাল খুবই খারাপ ছিল। তাই লুকিয়ে রাখা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। নানানধরনের যন্ত্রের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। কয়েকটি জিনিস এখনও রয়ে গেছে: গোপন টিপকল লাগানো একটা বাক্স, নানা জল যন্ত্র, এমনকী নিজের ডিজাইনে বানানো একটা ঘড়িও। তার সবচেয়ে বড় সখ ছিল গভীর সমুদ্রে ডুবুরির কাজ করা। কিন্তু ডুবুরির কাজ করা আর ডুবে যাওয়া জাহাজ সমুদ্রের তলা থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেসব নকশা তৈরি করেছিলেন সেগুলো সেই সময়ের প্রেক্ষিতে খুবই উদ্ভট বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাহলেও ডুবুরির কাজ আর জাহাজ উদ্ধারের কাজ আমাদের পরিবারের একটা পুরনো ঐতিহ্য। পলিকার্পের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে তার ছেলে ও নাতি

এবং পরে আমার ছেলে ভ্লাদিমির। এদের মধ্যে অনেকেই অনেক দূর দূর দেশে অভিযান চালিয়েছিল। ভ্লাদিমিরের দাদামশাই কয়েক বছর সিংহলেও ছিলেন একটা জাহাজ উদ্ধারের কাজের জন্য। আর ভ্লাদিমিরের বাবা 'প্রিন্স' জাহাজ সম্পর্কেও অনেক খোঁজ খবর জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু এসব কাজই ছিল রহস্যপূর্ণ। তাই আমাদের পরিবারের রহস্যও একটা ঐতিহ্য হয়ে আছে।

—'বেশ মজার ব্যাপার তো!' সুভিরিদভ মন্তব্য করেন।

—'গুপ্ত স্থানটার একটা ব্যাপার ছিল। সেটা হল পরিবারের যিনি কর্তা শুধু তার কাছে সেই গুপ্ত স্থানের হদিশ থাকত। সেই গোপন রহস্যের চাবিকাঠিটাই এই ছোরাটার মধ্যে লুকিয়ে রাখা আছে। তেরেন্তিয়েভ পরিবারের শেষ বংশধর ছিল ভ্লাদিমির। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে ওর বাবা ওকে ছোরাটা দেয়। ক্সেনিয়া চেয়েছিল ভ্লাদিমির ছোরাটা ওর কাছেই রেখে দিক, আর গুপ্তঘাটিটাও তাকে দেখিয়ে দিক। সে ঝগড়ায় অংশ নিয়েছিল ক্সেনিয়ার ভাই ভালেরি নিকিৎস্কি। ওদের বোধহয় ধারণা হয়েছিল যে গুপ্ত জায়গাতে দামি দামি হিরে জহরত আছে। ওদের ধারণাটা ভুল ছিল। তা যদি হত, তাহলে ভ্লাদিমির যুদ্ধে যাওয়ার আগে ছোরাটা আমার কাছেই রেখে যেত।

গত বছর কী হল। ভালেরি আমার কাছে এসে বলল যে ভ্লাদিমির ওর কোলে মাথা রেখেই মারা গেছে। আর মারা যাওয়ার আগে হাত ধরে অনুরোধ করেছে যে মায়ের কাছে এক গুপ্তঘাটিতে কতগুলো দলিল আছে। যেগুলো তার পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেগুলো যেন আমি নিয়ে নষ্ট করে ফেলি।' ভালেরি আমাকে বুঝিয়েছিল যে ওই একটা কারণেই ও রাশিয়াতে থেকে গেছে আর লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।'

গাড়ি পুশকিনোতে পৌঁছে গেল। পুরনো ইটের বাড়ি। সামনে বড় বড় থাম। অনেকগুলো গুদামঘর রয়েছে চত্বরে, অযত্নে সেগুলোর কয়েকটা ধ্বসেও গেছে। তবে আসল বাড়িটা ঠিক আছে। বাড়িটার ডানদিকে মসৃণ বরফ আর বরফে ঢাকা জানলা, দেখলে বোঝা যায় যে শুধু বাঁ দিকটাতেই মানুষ বাস করে। ওরা খাবার ঘরে ঢুকল। ঘরের মাঝখানে গোল পর্দাওয়ালা একটা লম্বা টেবিল পাতা। টেবিলে ঢাকা কাপড়ের একটা কোণা ওলটানো, অয়েল ক্লথের ওপরে তিনটি ময়দার ঢিবি। নিশ্চয়ই কেউ মাখছিল ওগুলো। মারিয়া গাভ্রিলভনা বললেন, 'বাড়িতে অনেকগুলো ঘড়ি আছে আমাদের। ঠিক কোনটার কথা যে বলা হয়েছে তা তো জানি না।'

সুভিরিদভ বললেন, 'আপনি যে ঘড়িটার কথা আমার ওখানে বলছিলেন সম্ভবত সেটাই।'

—'ওটা তো লাইব্রেরি ঘরে আছে।'

সেখানে একটা কাঠের কুলুঙ্গিতে কাঠের কেসের ভেতরে একটা মস্ত ঘড়ি রয়েছে। দম দেবার চাবির ফুটোর কাছে একটা চেরা জায়গা আছে। প্রায় চোখেই

পড়ে না। ঘড়ির মুখটা খুলে ফেললেন সুভিরিদভ, পেণ্ডুলামটা কাৎ হয়ে দুলে খড় খড় শব্দ করে উঠল। ঘড়ির কাঁটা দুটোকে ১২টা বাজার এক মিনিট আগে দাঁড় করিয়ে দিলেন সুভিরিদভ। তারপর চেরা জায়গার মধ্যে ছোরার সেই ব্রোঞ্জের সাপটা ঢুকিয়ে সাবধানে ডানপাশে মোচড় দিয়ে ঘড়িতে চাবি দিলেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে থাকে। গেঙ্কা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ।

মিনিটের কাঁটাটা কেঁপে উঠেই সরে গেল। ঘড়ির মুখে একটা ছোট্ট দরজা খুলে গেল। লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা নকল কোকিল, কুউউ, কুউউ করে ডেকে উঠল। ঘড়ির ভেতরটা ঘড়ঘড় করে উঠল। কোকিলটা সামনে ঠেলে বেরিয়ে আসতেই ঘড়ির ওপরের ছাদটা এগিয়ে এল আর ঘড়ির কেসের ওপরের অংশটা খুলে গেল। সেখানে দুটো দেয়াল আছে। লুকোনোর জায়গাটায় সবচেয়ে বড় কেরামতি হল — ঘড়ির কেসটাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একটা নিরেট কাঠ দিয়েই তৈরি। শুধু যখন সাপটা দিয়ে চাবি দেওয়া হবে তখনই লুকোবার জায়গাটা বেরিয়ে পড়বে। সেটার ভেতরে কাগজপত্রে ঢাকা একটা চারকোণা বাক্স। বাক্সটার ভেতরে নীল নকসা কাগজ আছে অনেকগুলো। পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া কাগজে জড়ানো পুথি। আর আছে একটা চামড়ায় বাঁধানো প্রকাণ্ড বড় খাতা। ওরা দুজন অর্থাৎ সুভিরিদভ আর জাহাজি লোকটা সব কাগজপত্রগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ছেলেরাও ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকল। জাহাজি ভদ্রলোক বললেন, —'সমুদ্র আর মহাসাগর অনুসারে সাজানো রয়েছে কাগজগুলো। একটা খাতার মাথায় লেখা রয়েছে দেখ — গ্রমভেনর, ইংরেজ জাহাজ, ১৮৭২ সালে সিংহলের কাছে ডুবে যায়। জাহাজে ছিল সোনা, দামি পাথর; তারপর — 'বেটনি' দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ ...' তাকে বাধা দিয়ে সুভিরিদভ বলল, — 'সমুদ্রগুলো দেখ তো।'

নাবিক ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ, তাই দেখছি। এই দেখ — 'কৃষ্ণসাগর', এই যে জাহাজের নাম — 'ত্রাপেজুন্দ, ক্রিমিয়ায় দৌলতগিরেই-এর সম্পত্তি। ১৮৫৪ সালের ১৪ নভেম্বর ঝড়ের সময় চোরা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে বালাক্লাভা উপসাগরে ডুবে যায় যে জাহাজটা তার নাম 'প্রিন্স'। বাবা, এতো দেখছি বিশাল তালিকা। দারুণ মূল্যবান দলিল। জাহাজডুবির সঠিক জায়গাগুলির হুবহু বিবরণ দেওয়া রয়েছে, সাক্ষ্য প্রমাণও রয়েছে। সব খবরই তো দেওয়া আছে দেখছি. কিছুই বাদ নেই ...।'

সুভিরিদভ বললেন, —'হ্যাঁ, সত্যিই অমূল্য জিনিস। আমাদের জাহাজ উদ্ধার বিভাগের খুব কাজে লাগবে।'

৭৩.

কমসমোলের নতুন সভ্য

এবারে আবার গাড়ি ফিরল মস্কোর দিকে। পেছনের সিটে আরাম করে গা এলিয়ে বসেছে মিশারা তিনজন। সুভিরিদভ আর জাহাজি ভদ্রলোক পুশকিনোতেই থেকে গেছেন। ছেলেদের মস্কোতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। কারণ ছেলেদের স্কুলের লালফৌজের সভাতে উপস্থিত থাকতে হবে।

গেঙ্কা ভারিক্কি চালে বলল, 'গাড়ি চড়তে খুব ভালবাসি আমি।'

মিশা ফোড়ন কাটে, 'তা বটে, অভ্যেস যাবে কোথায়।'

গেঙ্কা বলল, 'বুড়োটা মহা বিচ্ছিরি লোক ছিল রে।'

—'কোন বুড়ো?'

—'কেন পলিকার্প তেরেন্তিয়েভ।'

—'কেন?'

—'এমন হাড়কিপটে যে লুকোন জায়গাতে পয়সা কড়ি কিছু রেখে যায়নি।'

—'ওঃ, তাই বল।'

স্লাভা বলল, 'মিশা চিঠিটার কী করলি বলতো।' সুভিরিদভ ওকে খুব রহস্যের ভাব করে একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটার খামে পরিষ্কার হাতের লেখায় ঠিকানা লেখা — মিশা আর গেঙ্কা, ব্যক্তিগত। স্লাভাকে ঠাট্টা করে গেঙ্কা বলে, 'দেখলি তো, তোর নামটাও লেখেনি।' মিশা খোঁচা দেয় ওকে, 'আগেই বাঁদরের মতন লাফাসনি। চিঠিটা পড়ে দেখা যাক।'

চিঠিটা খুলে মিশা জোরে জোরে পড়তে থাকে।

—'ভাই মিশা, গেঙ্কা। কে লিখছে আন্দাজ করতে পার? আমি পলেভয়। তারপর কেমন চলছে নিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচ। ভাল তো। তোমাদের সব কথা কমরেড সুভিরিদভ আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। বাহাদুর ছেলে তোমরা। আমি তো ভাবতেই পারিনি শেষ পর্যন্ত নিকিৎস্কিকে তোমরা ঘায়েল করতে পারবে। আমার স্মারক হিসেবে ছোরাটা তোমাদের কাছে রাখতে পার। শুনেছি তোমাদের তৃতীয় একজন বন্ধু আছে। তাই তোমাদের তিনজনকেই ছোরাটা দিলাম। তোমরা যখন বড় হয়ে একসঙ্গে তিনবন্ধুতে মিলবে, তখন ছোরাটা দেখে কৈশোরের কথা মনে পড়বে। আমি নৌ বাহিনীর চাকরিতে যোগ দিয়েছি। তবে নতুন একটা কাজে হাত দিয়েছি — সেটা হল ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের কাজ। আমার এই ছোট চিঠিটা এখানেই শেষ করছি। বড় হয়ে তোমরা মহান বিপ্লবের প্রতিকারের সন্তান হবে কামনা করি। অভিনন্দনসহ 'পলেভয়'।

গাড়ি শহরের ভেতরে এসে পড়েছে। মিশা বলল, 'মিটিংয়ে যেতে আমাদের দেরি হয়ে যাবে রে।'

স্লাভা বলে, 'তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল। অন্যরা কমসমোলের কার্ড পাবে। আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখব সেটা খুব আনন্দের হবে না।'

মিশা বলল 'আরে, সেইজন্যেই তো আরও বেশি যাওয়া দরকার। নাহলে সবাই ঠাট্টা করবে' - স্কুলের সামনে ওরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। দৌড়ে স্কুলের ভেতরে ঢুকে পড়ল - ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। সিঁড়িটা নির্জন, নিস্তব্ধ। শুধু পোশাক ঘরের কাছে বসে ব্রসা মাসি তার বোনা নিয়ে বসে রয়েছে।

ব্রসা মাসি বলল, 'এখন কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। ঠিক সময়ে আসতে শেখা উচিৎ প্রত্যেকের।'

মিশা কাকুতি মিনতি করে, বলে, —'মাসি, আজকের দিনে ছেড়ে দাও মাসি। আর কোন দিন দেরি হবে না।'

—'ঠিক আছে, আজকের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।'

ছেলেরা ওপরে উঠে পা টিপে টিপে ভিড় ঠাসা হলঘরটায় ঢুকল। ঠিক দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা। হলের এপাশে লাল কাপড়ে ঢাকা টেবিলটা দেখতে পেল, টেবিলের ওপাশে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যরা বসে। চওড়া জানলা গুলোর ওপর, দেওয়াল জুড়ে সব স্লোগান লেখা। কোলিয়া তার বক্তৃতা শেষ করে নোট বইটা বন্ধ করে বলল, 'বন্ধুগণ, এই অনুষ্ঠানের মর্যাদা অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে কারণ জেলা কমিটির কমসমোল পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ আমাদের দলের সেরা পাইওনিয়রদের প্রথম গ্রুপকে কমসমোল সদস্যপদে গ্রহণ করা হল।'

শোনা মাত্র ওদের তিনজনের মুখ লাল হয়ে উঠল। মেঝেরে দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল গেঙ্কা আর স্লাভা। মিশা কিন্তু সোজা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সূর্যের দিকে, ওর চোখ জ্বালা করে উঠল। তবু ওর মনে হল সারা দিগন্ত জুড়ে জ্বলছে হাজার হাজার ক্ষুদে ক্ষুদে সূর্য। কোলিয়া শুরু করল, 'এবার নামগুলো পড়ছি —মারগারিভা ভরোনিনা, জিনা ক্রুগলভা, শুরা অগুরেভ, স্লাভা এলদারভ, মিশা পলিয়াকভ, গেন্নাদি পেত্রভ...'

কী বলল? ওরা ঠিক শুনল তো। তিনবন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। সবাই 'আন্তর্জাতিক' গান ধরল।

জানলার ওপাশে উজ্জ্বল থালাটা এবারে যেন আরও ঝলমলে আরও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। সূর্যের কিরণ আরও জায়গা জুড়ে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ল সারা দিগন্ত রেখা জুড়ে। ছড়িয়ে পড়ল বাড়ি ঘর, ছাদ, ঘন্টাঘর আর ক্রেমলিনের মিনার চূড়ার ওপরে। মিশা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওই উজ্জ্বল থালাটার দিকে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ফৌজি ট্রেনের সেই দৃশ্য, লালফৌজের সৈনিকরা, ধূসর ফৌজি ওভারকোট পরা পলেভয় আর সেই পেশীবহুল দেহ মজুরের ছবি — একটা মস্ত হাতুড়ির ঘায়ে যে দুনিয়াজোড়া শিকল ভেঙে ফেলছে।